দুটি উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

www.allbdbooks.com

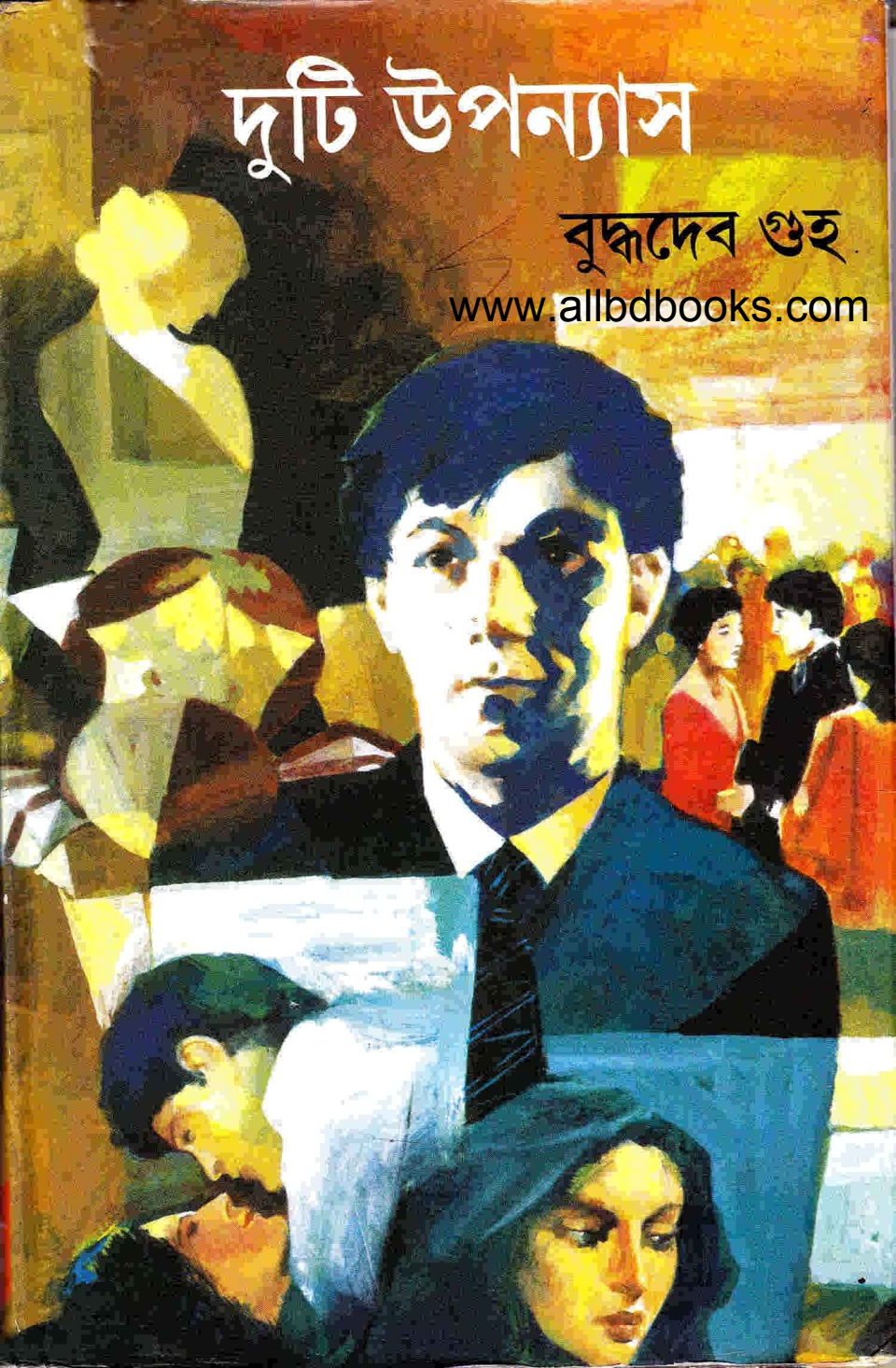

www.allbdbooks.com

তটিনী ও আকাতরু

পাবলিক লাইব্রেরী
তারিখ-১১-১৭
খুলনা

ইটা কি জানোয়ার? বাপ রে! বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতো ব্যাপার দ্যাখতাছি।

আকা বলল।

খাঁচার কাছে বনবিভাগের যে ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, এই হচ্ছে ক্লাউডেড লেপার্ড। এদের লেজ শরীরের থেকেও লম্বা হয়।

তাই?

অবনী বলল।

তটিনী কিছু না বলে, সানগ্লাসটা খুলে, ডান দিকের ডাঁটিটা নিচের পাটির দাঁতের কামড়ে ধরে সেদিকে চেয়ে রইল।

সে খাঁচার পাশে অন্য খাঁচায় একটি মাদী শম্বর। ছোট। দু-তিনটি চিতল হরিণ। একটা বেশ বড় চিতাবাঘ। এদের কেউ বাচ্চাবেলায় ধরা পড়েছে, কেউ বড় হবার পরে। ক্লাউডেড লেপার্ডটা নাকি এক বুড়িকে আহত করেছিল।

বনবিভাগের সেই ভদ্রলোক বললেন।

তারপর বললেন, লেজ সবচেয়ে বেশি লম্বা হয় অবশ্য স্নো-লেপার্ড-এর।

কোথায় পাওয়া যায় স্নো-লেপার্ড?

তটিনী জিজ্ঞেস করল।

বরফ-ঘেরা পর্বতে। নামেই তো আবাসের ঠিকানা।

অবনী বলল।

অবনী মিত্তির আলিপুরদুয়ারের নন্দাদেবী ফাউন্ডেশানের সদস্য। পর্বতারোহী। পাহাড়ে চড়ে। বন, বন্যপ্রাণী, ফুল, পাখি, প্রজাপতি ভালবাসে, তার উপর সংস্কৃতি এবং নাটক এবং সঙ্গীতমনস্ক। তাই এই বিনিপয়সার গাইডের কাজ করছিল ওদের। পেশাতে স্কুলমাস্টার। পেশাটা শখ। এমনিতে বাড়ির অবস্থা বেশ সচ্ছল।

- এসেছে ওরা ভাড়া গাড়িতেই। অবনীর সঙ্গে ওর বন্ধু আকাতরুও জুটে গেছে। তটিনী রায় ও মৃদুল দাশ এখানে তিনদিন রেস্ট নিয়ে ধুবড়িতে যাবে। সেখানেও বায়না আছে পরপর চারদিন। যাত্রার নাম 'হলুদ গোলাপ'। একটি কুড়িয়ে পাওয়া কানীন বালিকাকে নিয়ে উত্তাল মেলোড্রামা।

যাত্রাতে আজকাল অনেকেই পয়সা। কিন্তু মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয়। পয়সাই জীবনের সব নয়। তটিনী একথা জানে।

ওরা জলপাইগুড়ি জেলার বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের রাজাভাতখাওয়ার ওয়াইল্ড লাইফ ইনফরমেশান সেন্টার থেকে বাংলোতে ফেরার সময়ে পথের উপরে যে 'Rescue Centre' করেছেন বক্সা টাইগার প্রজেক্টের কর্তৃপক্ষ, তারই সামনে দাঁড়িয়েছিল।

এপ্রিলের শেষ। পারুল গাছে ফুল এসেছে সিঁদুরে লাল। অশোক গাছেও। এদিকে মাদার গাছ নেই। নিম্ন আসামের গোয়ালপাড়া বা ধুবড়ির দিকে এই সময়ে মাদারের স্নিগ্ধ লালে চোখে ঘোর লাগে। গরম পড়ে গেছে। তবে গতরাতে খুব একচোট ঝড়-বৃষ্টি হয়ে যাওয়াতে আজ আবহাওয়াটা বেশ মনোরমই।

ইনফরমেশন সেন্টারে ঢুকেছিল ওরা মেইন গেট দিয়ে। ড্রাইভার নগেনকে বলেছিল, গাড়ি নিয়ে বাংলোতে ফিরে যেতে বড় রাস্তা দিয়েই। আকার সঙ্গে ওরা এই Rescue Centreটি দেখে বনবিভাগের নানা কর্মচারীদের বাড়ি-ঘরের মাঝের মাটির পথ বেয়ে, পোস্ট অফিস হয়ে, স্টেশনের কিছু দূর দিয়ে লাইন পেরিয়ে একটি বড় বাঁশঝাড় ডান দিকে রেখে বাংলোতে পৌঁছে খাওয়া-দাওয়া করে আজই চলে যাবে জয়ন্তী। জয়ন্তীর বন-বাংলোতেই থাকবে।

আলিপুরদুয়ারে পর পর চার রাত, 'হলুদ গোলাপ' যাত্রাপালা করে তটিনী রীতিমতন ক্লান্ত। কাল রাতেই প্রথম ঘুমিয়েছে ভাল করে। আজ সকাল থেকেই বেশ তাজা লাগছে ওর নিজেকে।

তটিনী একটা খড়কে-ডুরে তাঁতের শাড়ি পরেছে। খয়েরী জমির উপরে কালো ডোরা। কালো পাড়। দীর্ঘ বেণীতে দু-তিনটি রুপোর কাঁটা। তাতে চুটকি লাগানো। গলাতে অ্যানোডাইজড স্টিল-এর একটি পুরোনো দিনের ডিজাইনের বিছে-হার। বাঁ হাতে রুপোর হালকা মকরবালা। ডান হাতে টাইমেক্স-এর কালো ব্রান্ডের কালো ডায়ালের ঘড়ি। ডায়ালে রেডিয়াম আছে। কাল রাতে যখন আলো নিভিয়ে ওরা সকলে রাজাভাতখাওয়ার বাংলোর বারান্দাতে বসেছিল, তখনই চোখে পড়েছিল আকার। তটিনীর দু পায়ের রুপোর পায়জোর। দু পায়ের মধ্যমাতে রুপোর চুটকি। তার গায়ের রঙটি ফিঙের মতন কালো কিন্তু মেক-আপ নিলে খুবই ফর্সা। যখন যাত্রা করে না তখন মেক-আপ নেয় না তটিনী। কিন্তু কাটা কাটা নাক চিবুক। ছোট্ট কপাল। দীর্ঘল দুটি কালো চোখ। কাজল পরেছে গাঢ় করে। মনে হচ্ছে চোখ তো নয়, যেন এক জোড়া ফিঙে। পলকে পলকে স্পন্দিত হচ্ছে। আলো প্রতিসরিত হচ্ছে উজ্জ্বল কালো দুটি চোখের মণি থেকে।

ওর মুখে এবং চোখের দৃষ্টিতে ভারি এক শান্তশ্রী আছে, বৃষ্টির পরের মুথা-ঘাসে ভরা গাঢ় সবুজ মাঠের মতন।

তটিনীর শরীরের কাছে এলেই ওর গা থেকে দারুণ এক গন্ধ পায় আকা। গায়ে কি সেন্ট মাখে সে, কে জানে! কখনও তার বুকের আঁচল হঠাৎ খসে গেলে অথবা ইচ্ছে করেই সে কখনও খসিয়ে দিলে, যেমন একটু আগেই দিয়েছিল, ফলসা-রঙা সুডৌল পান-পায়রার মতন স্তনসন্ধি, যেন পৃথিবীর সব আলো-আঁধারী রহস্যের খনি হয়ে ওঠে। সেদিকে চোখ পড়তেই পারুল আর অশোকের লালে লাল-হওয়া বৈশাখের নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়েও আকার মাথা ঘুরতে থাকে বনবন করে। বমি-বমি পায়।

কালকে এখানে আসার পর থেকে নয়, তার চারদিন আগে থেকেই, মানে, যেদিন থেকে যাত্রাদলটি এসেছিল আলিপুরদুয়ারে, আকার খাওয়া-দাওয়া সবই গেছে।

কি-বছরই ম্যালেরিয়া হয়, বার দুই ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়াও হয়েছিল। জনডিস, কালাজ্বর, কী হয়নি ওর! কিন্তু এমন অসুখে সে জীবনে পড়েনি আগে। বুকের মধ্যে ভারি একটা কষ্ট। আবার, ভারি একটা আনন্দও। মাঝে মাঝেই হু হু করে উঠছে আকার বুকের মধ্যেটা। খিদে-তৃষ্ণা চলে গেছে পুরোপুরি। তার উপরে তটিনী যখন ওর মুখটি তুলে, তার চোখের মধ্যে নিজের

দু চোখ টায়ে টায়ে রেখে তাকায়, এমনই করে, যাতে চাউনি একটুও উপচে পড়ে না যায়, তখন আকার মনে হয়, ও আর বাঁচবেই না। রোদটা হঠাৎই ঠাণ্ডা মেরে যায়। জগৎ-সংসার সব মিথ্যা বলে মনে হয়। কিছুই ভাল লাগে না আকার।

কে জানে! এই অসুখের নাম কি?

পায়ে পায়ে ওরা যখন রেললাইনের কাছে পৌঁছে গেছে, হঠাৎ চোখে পড়ল ডান দিকে পোস্ট অফিস। পোস্ট অফিস দেখেই বোধহয় তটিনীর খাম কেনার কথা মনে পড়ল।

বলল, একটা চিঠি লিখতে হবে।

চলুন, ভিতরে যাই সকলে। নাকি, আকাই গিয়ে নিয়ে আসবে?

না না। চলুন সকলে মিলেই যাই। কাজ কি এখানে আমাদের!

তা নেই। কিন্তু ওদিকে মৃদুলবাবু, আপনার হিরো তো বাংলোর দোতলার বারান্দাতে একা বসে কাপের পর কাপ চা খেয়ে খেয়ে আর শিডনি শিলডন পড়ে পড়ে হেদিয়ে গেলেন। দেরি হলে ভারি রাগ করবেন।

অবনী বলল।

রাগ করলে তো আমারই উপরে করবেন।

তটিনী বলল।

তটিনী হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, মোটে তো সাড়ে এগারোটা আশ্চর্য! মনে হচ্ছে কতক্ষণ হলো যেন বেরিয়েছি। দেড়টা দুটোর আগে কোনোদিন খাই দুপুরে? আর রাতে তো কথাই নেই। যাত্রা যেদিন থাকে সেদিন তো মেক-আপ তুলে খেতে করতে সেই একটা-ডেড়টাই হয়।

আপনার হিরোও কি ঐ সময়েই খান রোজ? বেড়াতে বেরিয়ে?

মৃদুল আমার হিরো নন, 'হলুদ গোলাপ' যাত্রার নায়িকা শুক্লার প্রেমিক, বসন্ত। আমার নাম তো তটিনী। মঞ্চ থেকে নেমে আসার পর মৃদুলবাবু শুক্লার কেউই নন। তটিনীর তো ননই! জীবনে আমার কোনো নায়ক নেই। তাছাড়া উনি বেড়াতে বেড়িয়ে কখন খান তাও আমার জানা নেই কারণ আমি আর উনি একসঙ্গে কোথাওই যাইনি বেড়াতে এর আগে। 'হলুদ গোলাপ'-এর আগে আর কোনো পালাও করিনি ওঁর সঙ্গে।

হাউ স্যাড।

অবনী বলল।

খুলনা

কেন? স্যাড কেন?

পোস্ট অফিসে ঢুকতে ঢুকতে তটিনী বলল।

না। আপনার মতন মহিলারও জীবনে কোনো নায়ক নেই এই কথাটা।

তটিনী অবনীর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, দর্শকদের বা উদ্যোক্তাদের কিন্তু উচিত নট-নটীদের মঞ্চের ভূমিকাতেই নিজেদের ঔৎসুক্য সীমিত রাখার। ব্যক্তিগত জীবনটাতে উঁকিঝুঁকি না মারাই ভাল নয় কি?

অবনী বলল, বিলক্ষণ। কিন্তু সংসারে যা ঘটে তার কতটুকুই বা ভাল বলুন? যাঁরা পাদপ্রদীপের আলোতে থাকেন তাঁদের ফুলের মালা আর প্রণামের সঙ্গে এই সব অত্যাচার একটু-আধটু সহ্য তো করে নিতেই হয়।

তারপর বলল, আপনার মতন মেয়েরও যদি নায়ক না থাকে, তবে থাকবে কার?

নেই মানে, আছে নিশ্চয়ই। এই পৃথিবীরই কোনো কোণে। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার।

তটিনী বলল।

আকার বুকটা ভেঙে গেল।

আকাকেই পরমুহূর্তে তটিনী বলল, কী বলেন আকাবাবু?

তারপরই বলল, আপনার মতো স্মার্ট সুন্দর ইয়াং পুরুষের নাম আকা কে রাখল বলুন তো?

আমার বড়মায়ে রাখছিল।

সরল, ভালমানুষ হায়ার সেকেন্ডারী পাশ DIE HARD বাঙাল আকা বলল।

বড়মা মানে?

বড়মা বোঝালেন না? বড়মা মানে, আপনারা যারে কন জ্যাঠাইমা, তাই।

ও।

খাম আছে?

পোস্ট অফিসের ভিতরে ঢুকে অবনী জিজ্ঞেস করল।

এক ভদ্রলোক, একাই কাউন্টারের পেছনে কাঠের ছোট টেবলের সামনে ততোধিক ছোট একটি চেয়ারে বসে একগাদা কাগজের স্ট্যাম্প প্যাডের কালিতে জোরে ঠাপ্পা মেরে তারপরে আরও জোরে স্ট্যাম্প করছিলেন, সেই কাগজগুলিকে।

ওদের দেখেই ভদ্রলোক উঠে এলেন।

বললেন, নমস্কার।

অত্যন্ত উত্তেজিত এবং কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত গলাতে বললেন, আপনি তটিনী দেবী নন?

হঃ। এতক্ষণ লাগে নাকি চিনোনে?

অকা বলল ওঁকে, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে।

তা নয়, মঞ্চে তো সাজপোশাক আলাদা থাকে, মেক-আপ টেক-আপ থাকে। তাই।

আপনি 'হলুদ গোলাপ' যাত্রা দেখলেন কোথায়? আলিপুরদুয়ারে?

ভদ্রলোক লম্বা, একটু গোলগাল চেহারা, মুখে তিন-চারদিন না-কামানো খোঁচা-খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি, একটি নীল-রঙা হাফ-শার্ট, খালি প্যান্টের উপরে পরা, একটি উইলসন বলপেন গোঁজা শার্টের বাঁ দিকের বুক-পকেটে। পোস্টাপিসের দেওয়ালে রামকৃষ্ণদেবের একটি ছবি এবং ঠিক তার উল্টোদিকেই মুর্শিদাবাদের মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানির একটি ক্যালেন্ডার।

মাস্টারবাবু তটিনীকে বললেন, আজ্ঞে না ম্যাডাম। আমি দেখেছি আপনাকে হ্যামিলটনগঞ্জে। যখন আপনাদের 'মনমোহন অপেরা' গেছিল গতবছরে তখন। আমার ফেমিলি তো সেইখানেই থাকে। ছুটিতে সেখানে গেছিলাম গতবছরের আগের বছরে পুজোর সময়ে।

একবছর আগে দেখেও মনে রেখেছেন আমাকে! কী পালা যে নিয়ে গেছিলাম আমরা সেবারে হ্যামিলটনগঞ্জে তা তো আমার নিজেরই মনে নেই!

'ভানুমতী'।

তাই তো। তা আমাকে মনে রেখেছেন, আশ্চর্য!

আকা বলল, আপনারে একবার দ্যাখলে কি কারো পক্ষেই ভোলা সম্ভব?

মাস্টারবাবু বললেন, তা ঠিক।

আকা বলল, আপনের নাম কি মাস্টারমশয়?

আমার নাম শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু। অরিজিনালি আমি আপনাদের কলকাতার বালিগঞ্জেরই মানুষ মশাই। আমার ছেলেবেলা কেটেছে সেখানেই।

তারপর, পাছে রাজাভাতখাওয়া পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার যে কলকাতার বালিগঞ্জেরই বাসিন্দা একথা কলকাতার কেউ অবিশ্বাস করেন তাই যেন বললেন, রায়বাহাদুর নগেন বোস-এর নাম শুনেছেন কি?

অবনী না শুনেও বলল, হ্যাঁ।

তিনিই হচ্ছেন গিয়ে আমার সাক্ষাৎ ন'ঠাকুরর্দা। দাদুর জ্যাঠতুতো ভাই যদিও।

অবনী বলল, ও, তাই বুঝি!

একটু চা খাবেন না?

দেবেনবাবু শুধোলেন।

চা?

তটিনী অবাক হয়ে গেল।

স্ট্যাম্প আছে, এক টাকার? অথবা খাম?

নাঃ।

খুবই লজ্জিত হয়ে বললেন উনি।

স্টক ফুরিয়ে গেছে, তবে আসার কথা আছে দিন সাতেকের মধ্যে। পোস্টকার্ড আর ইনল্যান্ড নিতে পারেন।

খাম বা স্ট্যাম্প নাই-বা থাকল, চা তো আছে।

অবনী বলল।

শুনেই মাস্টারমশাই হাঁক দিলেন, এই মাস্তু! চা আন রে। চা আন তাড়াতাড়ি। ওঁদের সকলকে দে। আমাদের আজ কী সৌভাগ্য! স্ট্যাম্প না থাকলে তো কী হলো। তটিনী দেবী এবং এতসব গণ্যমান্য মানুষ এসেছেন আমার পোস্ট অফিসে।

অবনী বলল, এটা তো আপনার বাড়ি নয়, অফিস। আপনি কেন আতিথেয়তা করবেন?

কেন করব না তাই বলুন! আপনাদের মতন মানুষদের পায়ের ধুলো কি রোজ রোজ পড়বে এই জঙ্গুলে রাজভাতখাওয়ার ছোট্ট পোস্ট অফিসে।

জায়গাটার নাম রাজভাতখাওয়া হলো কেন বলুন তো?

তটিনী বলল।

শুনেছি, বহুদিন আগে কুচবিহারের রাজা ভুটানের রাজাকে এখানে ভাত খাইয়েছিলেন।

মাস্টারমশাই বললেন।

কেন? জামাই তিনি? না শ্বশুর?

তটিনী বলল।

আকা বলল, আউজ্ঞা তা নয়। যুদ্ধ লাগছিলত দুই রাজার মইধ্যে। যুদ্ধে যখন সন্ধি হইল গিয়া তখনে হেই দুই রাজা একলগ্যে বইস্যা ইখানে ভাত

খাইছিলেন। তাই ই জাগার নাম রাজাভাতখাওয়া।

তারপরই তটিনীকে বলল, আপনে দ্যাখেন নাই যে ইনফরমেশান সেন্টারের দেওয়ালে একখান ফাস ক্লাস রঙিন ছবি আঁকাইছেন কলকাতার থনে আর্টিস্ট আইন্যা, বিস্ট সাহেব?

বিস্ট সাহেব কে?

তটিনী আবার প্রশ্ন করল।

বিস্ট সাহেব হইলেন গিয়া বক্সা-টাইগার প্রজেক্টের ডিরেক্টর। তাঁর রাইজ্যেই ঘুরতাছেন আপনেরা আর তাঁরই নাম জানেন না! অবনীদাটা থার্ড ক্লাস। কইবা ত ওনাদেরকে।

এমন সময়ে বাইরে থেকে পায়জামার উপরে খাকি শার্ট-পরা এক মাঝারী উচ্চতার ভদ্রলোক একটি ভাঁজ-করা খাম-এর মধ্যে কিছু কাগজপত্র বগলে নিয়ে ঢুকলেন। মুখে পান। জর্দার গন্ধ বেরুচ্ছে।

দেবেনবাবু বললেন, এই যে রেবতী, ঠিক সময়েই এসেছ। ইনিই হলেন সেই তটিনী দেবী। 'ভানুমতী' পালার কথা বলেছিলাম না তোমাকে? গতবছরের আগের বছর পুজোর সময়ে হ্যামিলটনগঞ্জে গেছিলেন ওঁরাই। আর এ বছর এই সময়ে আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন।

ওঁকে চিনুম না দাদা! আপনার মুখে ত হেই নামই কৃষ্ণনাম আছিল বহুদিন।

নবাগন্তুক বললেন।

অবনী কারেক্ট করে বলল, রাধানাম বলুন। জেন্ডার ভুল করছেন কেন?

সকলেই সেই কথাতে হেসে উঠলেন এবং উঠল।

এই সময়টা কি যাত্রার পক্ষে উপযুক্ত? প্রায় রোজই তো ঝড়-বৃষ্টি হয়।

দেবেনবাবু বললেন।

আকা বলল, ইনি হইতেছেন সাক্ষাৎ জগদম্বা। ম্যাঘ, বিদ্যুৎ সবই সর্বক্ষণ ওঁর শাসনেই থাহে। এমনিই কইতাছি না। চারদিন মানে, চার রাইত পরপর হইল যাত্রা, তাও সার্কিট-হাউসের সামনের মাঠে। কুনোরকম উপদ্রবই ত হয় নাই। না ঝড়, না বাতাস, না জল!

ও, আলাপ করিয়ে দিতে ভুলে গেছিলাম। ইনি হলেন রেবতীভূষণ ভৌমিক। পোস্টম্যান।

পোস্টমাস্টারমশাই দেবেনবাবু বললেন, নবাগন্তুককে দেখিয়ে।

রেবতীবাবু দু হাত তুলে নমস্কার করলেন।

করেই আকার দিকে চেয়ে বললেন, আপনারে য্যান চিনা-চিনা লাগে! আপনের বাড়িও কি সলসলাবাড়িতে?

না। আমার বাড়ি হইল গিয়া আলিপুরদুয়ারে। আর এই অঞ্চলে আসন-যাওন তো লাইগ্যাই আছে। তাছাড়া, আমরা পেরতি বচ্ছরই জয়ন্তী ছাড়াইয়া ভুটান পাহাড়ে মাউন্টেইনারিং-এর ক্যাম্প করি না! ছুটো-ছুটো ছাওয়াল-মাইয়াদেরও তো লইয়া আসি আলিপুরদুয়ার থিক্যা। দ্যাখছেন নিশ্চয়ই!

পোস্টম্যান রেবতীবাবু এবারে একটু ভেবে বললেন, বুঝছি, বুঝছি! আপনে আলিপুরদুয়ারের তপনবাবুর লগে আসেন ত!

হ। ঠিকোই ধরছেন।

পোস্টমাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, কোন তপনবাবু?

আরে, আলিপুরদুয়ারের অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকুটার।

অ। বুঝেছি। টাক মাথা তো।

আউজ্ঞা। এক্কেরে টাক না, কিছু চুল এহনও আছে। তবে পিছনে।

অবনী জিজ্ঞেস করল, আপনার বাড়ি কোথায় রেবতীবাবু?

মানে, দ্যাশ কই ছিল, তাই জিগান ত?

হ। বাড়ি মানেই ত দ্যাশ! ঐ হইল আর কী!

দ্যাশ তো আছিল মাইমানসিংহ। এহনে থাহি সলসলাবাড়িতে। উদ্বাস্তু। বোঝেনই তো!

হ। হ। বুঝছি। আমরাও ত তাই-ই। মানে উদ্বাস্তুর পোলা আর কী! না-বোঝনের আছেটা কী?

মাস্টারমশায়ের বাড়ি তো বললেন হ্যামিলটনগঞ্জ। আলিপুরদুয়ার থেকে যেতে পথে কী একটা জায়গা পড়ে না, কি যেন নাম?

তটিনী বলল।

পড়ে তো! আটিয়াবাড়ি। গারোপাড়া ভাতখাওয়া টি এস্টেট হয়ে কালচিনি হয়ে ডিমা নদী পেরিয়ে যেতে হয়।

মাস্টারমশাই যেন বলতে বলতে স্মৃতিমেদুর হয়ে উঠলেন।

মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল তটিনীর। বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আটিয়াবাড়ি। মনে আছে, আমরা বাস দাঁড় করিয়ে চা আর সিঙাড়া খেয়েছিলাম সেখানে।

তটিনী বলল, স্মৃতিচারণ করে।

আপনি আগে কোথায় ছিলেন মাস্টারমশাই?

এখানে আসার আগে?

হ্যাঁ।

অবনী জিজ্ঞেস করল।

আজ্ঞে, আগে ছিলাম পানাতে।

পানা? সেটা কোথায়?

তটিনী জিজ্ঞেস করল।

একেবারে ভুটানের বর্ডারে। ভুটান দেখা যায় সেখান থেকে। বাসরা আর পানা এই দুই নদীই বেরিয়েছে ভুটান থেকে। ওঃ। নাইনটি-টুতে সে কী বন্যা! বন্যায়....

ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে অবনী বলল, চা তো খাওয়া হলো, আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব ভাল লাগল। এবারে আমরা এগোই। কী বলেন মাস্টারমশাই? রোদ চড়া হয়ে যাবে।

তটিনী বলল, হ্যাঁ।

মাস্টারমশাই হাঁক দিলেন, মাস্তু। ছাতাটা নিয়ে মেমসাহেবের মাথার উপরে ধরে পৌঁছে দিয়ে আয় বাংলো অবধি।

তটিনী বলল, আপনি কি পাগল হলেন? কিচ্ছু লাগবে না। চলি তাহলে। আচ্ছা, খুব ভাল লাগল। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাদের।

তারপরই বলল, এই মাস্তুকে আমি দশটা টাকা বকশিশ দিতে পারি কি চা খাওয়াবার জন্যে?

দশ টাকা! সে কি! অত টাকা দেবেন কেন?

আমার কাছে দশ টাকার দাম নেই, তাছাড়া চেঞ্জও নেই। কিন্তু আপনি অনুমতি দিলেই দিতে পারি। অনুমতি দিলে খুবই খুশি হই।

দিন। যখন বলছেন।

মাস্টারমশাই দেবেন্দ্রনাথ বসু বললেন।

পোস্টম্যান রেবতীবাবু বললেন, আজ সকালে কার মুখ দেইখ্যা উঠছিলি রে ছুঁড়ি?

মাস্তু নামক মেয়েটি নির্বিকার নিরুত্তাপ মুখ মাটির দিকে নামিয়ে চুপ করে রইল।

আমরা এবার যাই।

অবনী বলল।

ইনল্যান্ড, খাম কিছুই নিলেন না তো চিঠি লিখবেন কি করে?

মাস্টারমশাই বললেন।

তটিনী ঘুরে দাঁড়িয়ে, একটি পুরুষ-হনন হাসি হেসে বলল, চৈত্র দিনের ঝরা-পাতায়।

অবনী বলল, ব্রাভো! ব্রাভো! এই নইলে আপনি নায়িকা। আপনি বর্ন-হিরোইন। সাধে কি গেটোদা বলেন যে তটিনীর কারোরই ডিরেকশানের দরকার নেই। ও হচ্ছে ন্যাচারাল অ্যাক্ট্রেস।

দু হাত তুলে ওঁদের নমস্কার করে তটিনী বাইরে বেরোল। পেছনে পেছনে অন্যরা।

অবনী বলল, যাঁরা চিঠি বিলি করেন, মানে, এই পোস্টম্যানেরা কত বড় কাজ করেন, তাই না? এঁরা তো আমাদেরই মতন মানুষ। এঁদেরও আমাদেরই মতন সুখ-দুঃখ থাকে, সংসার থাকে, ছেলে-মেয়ে থাকে, এঁরা নিছকই আমাদের দুঃখ বা আনন্দের ডেলিভারী-মেশিন নন। তাই না? জীবনে আজ এই প্রথম প্রত্যেক পোস্টম্যানের মধ্যে যে আমাদেরই মতন একজন মানুষও থাকেন, তাঁকেই আবিষ্কার করলাম।

তটিনী বলল, হুঁ।

আকা বলল, ক্যান? আমার জন্যে নয়? আজ না-হয় আমি স্যা চাকরি ছাইড়্যা দিছি, একদিন ত চিঠি বিলিও করছি, ঘরে ঘরে ঘুইর‍্যা।

করেছেন। না?

তটিনী বলল।

করি আর নাই? কত মানুষের কত খবর লইয়া লাড়াচারা করছি! হাঃ। স্যা আছিল একদিন।

তটিনীর আসলে মনে পড়ে গেছিল ওর নিজের ছেলেবেলার কথা। ওর বাবা মেদিনীপুরের এক অখ্যাত সাব-ডিভিশানের এক অখ্যাত দুর্গম গ্রামের একটি পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার কাম-পোস্টম্যান ছিলেন। সে তার বাবার বিনি-মাইনের ঝিই ছিল মাত্র। অতি মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের বিনিময়ে সে তার মাতাল বাবার সব প্রয়োজন মেটাত। রান্নাবান্না করত, সেবা-শুশ্রূষা। একেবারে শিশুকালে মা-হারানো তার বাবার সঙ্গে কোনোরকম আত্মিক যোগ ছিল না। অনেক মেয়েরই থাকে না। ওর বয়স যখন ঐ দশ-এগারো বছরের মাস্তুরই মতন ছিল,সেই সময়েই গ্রামের মহাজন শ্রীমন্ত জানা মেদিনীপুর শহরে ভাল কাজ

দেবে, সুখে রাখবে, এই লোভ দেখিয়ে মাতাল বাবাকে মোটা টাকা দিয়ে মা-মরা তটিনীকে তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে গেছিল। তারপরের সেই সব গ্লানি আর ক্লেদ-ভরা দিনগুলির কথা মনে পড়ে যাওয়াতেই ওর মন ভারী হয়ে এল।

মাস্তু দাঁড়িয়েছিল দরজার একপাশে মাস্টারমশাই আর পোস্টম্যানবাবুর থেকে তফাতে, অপরাধীর মতন। তটিনী পেছন ফিরে চেয়ে একবার দেখল মাস্তুকে পূর্ণ দৃষ্টিতে।

তারপর হাত তুলল। বা-ই-ই করার মতন করে। কিন্তু মুখে কিছু না বলে মনে মনে বলল, আসি। যেন, বিদায় নিল। ওই মাস্তুর কাছ থেকে যেমন, ওর ছেলেবেলার নিজের কাছ থেকেও তেমনই।

হঠাৎই ঘুরে দাঁড়ানো তটিনীর মরালীর মতন গ্রীবা দেখে আকা আবারও কষ্ট পেল। চৈতি হাওয়াতে আন্দোলিত কয়েকটি এলোমেলো অলকচূর্ণ সেই তন্বী সুঠাম গ্রীবার সৌন্দর্য হঠাৎই আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

পোস্ট অফিসের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে পেছন ফিরে অবনী দেখল, দরজাতে দাঁড়িয়ে থাকা দেবেনবাবুর খাকি ফুল-প্যান্টের তিনটি বোতামই খোলা। হয়তো ওরা যাবার ঠিক আগেই বাথরুম থেকে এসেছিলেন। ভুল হয়ে গেছিল লাগাতে। ভুলোমনের পুরুষমাত্রকেই এমন নানা এমবারসমেন্টের মধ্যে পড়তে হয়। একজন পুরুষ হিসেবে দেবেনবাবুর সমব্যথী হলো অবনী।

ভাবছিল, পুরুষও যদি পুরুষকে ফেলে দেয়, বিনা দোষে, তবে সে বেচারারা এই পুরুষ-নিগ্রহর যুগে যায় কোথায়?

আকাও ভাবছিল, মস্ত ভুল হয়েছিল তার তটিনীর সঙ্গে এবারে এই বক্সার জঙ্গলে আসা, ল্যাংবোটের মতন, খিদমদগারের মতন। আর বাঁচা হবে না! মরবে সে এবারে। একেবারেই মরবে।

দূরে ভূটান পাহাড়ের মেঘের মতো নীলচে শরীর দেখা যাচ্ছে ঘন জঙ্গলের মাথা ছাড়িয়ে। আস্তে একটা হাওয়া বইছে। হাওয়ার চেয়েও আস্তে আলতো পায়ে হাঁটতে হাঁটতে তটিনী ভাবছিল, তার সমস্ত জীবনটাই ভুল। যৌবন আর কতবছর থাকবে? এবার থিতু হওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে একটা। তবে, জীবনে নিজের চেষ্টাতে নিজের চাঁদমুখের জোরে এবং ঈশ্বরের অশেষ আশীর্বাদে সে অনেকই দূর চলে এসেছে। এই এতখানি পথ আসাটা তার কাছে একদিন সত্যিই অভাবনীয় ছিল। কী করে মোটামুটি ইংরেজি বাংলা শিখেছিল, যিনি তার মধ্যে সাহিত্য-বোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন, সুরুচি, সেই চাল-কলের

মালিক নারীদেহ-বিলাসী মোটা কুৎসিত মানুষটার কাছে ও শুধু এই কারণেই আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে।

প্রত্যেক মানুষেরই মধ্যে ভাল-মন্দ থাকেই। যদিও শুধুই ভাল, শুধুই মন্দ মানুষ দেখেনি যে, জীবনে ও তাও নয়। একথা ঠিক যে, সাহিত্যেই তাকে তার আজকের যতটুকু প্রাপ্তি তার প্রায় সবটুকুই দিয়েছে। বাংলা গল্প-উপন্যাস পড়ে সে নিজেকে গড়ে-পিটে নিয়েছে। তার সেই প্রথম বাবু প্রাণধন খাঁ পয়সাওয়ালা হলেও শিক্ষিত ছিলেন।

বাবু বলতেন, মুনিয়া রে! সাহিত্য পড়। Literature makes a person. সাহিত্য পড়। তার চেয়ে বড় শিক্ষা আর নেই।

শরীর-ভাঙিয়ে খাওয়ার মধ্যে লজ্জার কিছু দেখেনি ও। কিন্তু নিদারুণ অসহায়তা অবশ্যই দেখেছে। সেই জীবিকা যে অতি স্বল্পমেয়াদী তাও ও জেনেছে। এবং জেনে, শরীরের চেয়ে মনের উপরে, গুণের উপরে, ক্রমশই অনেকই বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে।

সে একাই জানে, শুধু সে একাই, এই দীর্ঘ, দুর্গম, বন্ধুর পথের দু' পাশে কি ছিল?

লোভ কিন্তু আদৌ বেশি নেই ওর। ও একজন সাদা-সিধে ভালমানুষ, কম-বুদ্ধিসম্পন্ন, সচ্চরিত্র পুরুষ চায়, যার সঙ্গে ঘর বেঁধে ও বাকি জীবনটা কাটাতে পারে। একটি কোলজোড়া ছেলে। তারপরে একটি মেয়ে। ব্যাস্‌স্‌।

আর কিছু চাইবার নেই ওর জীবনের কাছ থেকে। চারবার অ্যাবর্শান করতে হয়েছে ওকে। প্রথমবার চোদ্দ বছর বয়সে, শেষবার সাতাশ বছর বয়সে। সহবাস আর দাম্পত্যর মধ্যে তফাৎ যে কি তা ও বোঝে। তার সঞ্চয়ের সুদ থেকে, আড়ম্বর করে নয়, সাদামাটাভাবে কেটে যাবে বাকি জীবন। গুমা-হাবড়াতে দশ কাঠা জমিও কিনে রেখেছে। এখন...

তবে পুরুষ দেখে দেখে ওর ঘেন্না ধরে গেছে পুরুষ জাতটারই ওপরে। শুয়োরের জাত এই পুরুষ।

হাঁটতে হাঁটতে তটিনী ভাবছিল, ওর পায়ে পায়ে মুগ্ধ, বাধ্য কুকুরের মতন হেঁটে-আসা আকা মানুষটি কিন্তু বেশ! ভাল নাম আকাতরু রায়। আজব নাম। মানুষটি একশো ভাগ খাঁটি মানুষ। আর তটিনী বুঝতে পেরেছে যে, তাকে মানুষটা পাগলের মতন ভালবেসে ফেলেছে। একমাত্র নির্বুদ্ধি মানুষেরাই, সৎ, উদার, নিজ স্বার্থবোধহীন পুরুষেরাই এমন করে ভালবাসতে পারে কোনো

নারীকে, প্রথম দর্শনেই। তবে এখনও জানে না ও, এটা ভালবাসা না মোহ না কাম! অনেক সময়েই এই তিনের মধ্যে তফাৎ করা ভারি কঠিন হয়ে ওঠে। অনেকইবার দেখেছে ও। অধিকাংশ পুরুষেরাই স্বভাবে শুধু শুয়োরই নয়, গর্দভও বটে। তাছাড়া, পুরুষের ভালবাসা আর মুসলমানের মুরগী পোষা সমগোত্রীয় ব্যাপারই।

ঠিক সেই সময়েই পারুল গাছের মগডাল থেকে একটা কোকিল ডেকে উঠল খুব জোরে, কুহু-কুহু-কুহু করে।

তটিনীর বুকের মধ্যেটা চমকে উঠল।

আকা নাক তুলে উঁচু পারুল গাছটার মগডালে কোকিলটাকে চোখ সরু করে আকুল হয়ে খুঁজতে লাগল। ওর চোখে রোদ পড়েছে। পাখিটা যে কোথায় তা কিছুতেই ও দেখতে পাচ্ছে না।

তটিনী ভাবছিল, বেচারা! বোকা মানুষটা জানেই না যে, কোকিলটার বাসা মানুষটার নিজেরই বুকের মধ্যে।

উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত-১৮৯৭
খুলনা

২

যখন রাজাভাতখাওয়ার বন-বাংলোতে এসে পৌঁছল ওরা তখন প্রায় বারোটা বাজে।

মৃদুলের সামনে টেবলটার উপরের অ্যাশট্রেটা সিগারেটের টুকরোতে ভরে গেছে। সে কালকের THE STATESMAN-টা পাশের চেয়ারে সরিয়ে রেখে, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বাবাঃ! হলো তোমাদের ইনফরমেশান সেন্টার দেখা! এত ইনফরমেশান জড়ো করলে তা স্থানান্তরিত করতেও তো পুরো সপ্তাহ লাগবে।

তটিনী মৃদুলের উল্টোদিকের চেয়ারে বসে বলল, সত্যি! কত কীই-না জানলাম, দেখলাম। গেলে পারতেন আপনিও।

থ্যাঙ্ক উ্য। আমার নিজের মধ্যে এত ইনফরমেশান জমে আছে যা হজম করতে বহু যুগ লেগে যাবে। আমি আমাতেই টইটম্বুর।

সত্যি! আপনি ভারি ভাল কথা বলেন কিন্তু মৃদুলবাবু। আপনি নিজেই একটা কিছু লিখুন না!

কি?

নাটক, শ্রুতি নাটক, নয়তো যাত্রা।

লিখলেই হতো। মাঝে মাঝে শুধু যাত্রার ডায়লগই নয়, সিনেমার ডায়লগও এমন বোকা-বোকা, অপার অশিক্ষিতর মতন শোনায়, নিজে লিখতে ইচ্ছে যে হয় না, তা নয়। প্রায়ই মনে হয়, রেগেমেগে খাতা-কলম নিয়ে বসে যাই।

তারপর?

তারপর আর কি! লিখতে কোনো কিছু যে পারি এই ভাবনাটাকে ফোঁড়ার মতন লালা করতে খুব ভাল লাগে আমার। ইচ্ছে করলেই, মানে, যে জিনিস আমার করতলগত, তা করে ফেললেই পুরো মজাটাই মাটি হয়ে যায় বলে মনে হয়।

অবনী বলল, তাছাড়া একেবারে ঝুলও তো হতে পারে! সেই ভয়টাও থাকে।

মৃদুল হেসে বলল, তাও বটে!

জানেন, আকাতরু গাছ দেখলাম আমরা।

আকাতরু? গাছের নাম আকাতরু?

তাহলে আর বলছি কি? লালি, দুধে লালি, চাঁপ, চিকরাসি, গামহার, কাট্টুস, উদাল, ঝিমুনি আর খয়ের। খয়ের গাছও দেখলাম তো!

অবনী বলল।

না, না। সেসব গাছের নাম তো আমরা জানিই! কিন্তু যেসব গাছ এখানেই প্রথম দেখলাম সেগুলোর কথা শুনি। ভারি আশ্চর্য সব নাম তো! তা আকাতরু গাছ দেখতে কেমন?

বলেই ডান হাতের তর্জনী নির্দেশ করে বলল, আচ্ছা, এই গাছটা কি গাছ, এই যে আমাদরে বাংলোর গেট-এর ডান পাশে?

আকা বলল, ইটারেই তো কয় গামার। বা, গামারি।

অবনী বলল, আমাদের এখানে বলে গামার বা গামারি কিন্তু বিহারে এবং মধ্যপ্রদেশে বলে গামহার। জানিস আকা?

তাই?

ইয়েস।

তা আকাতরু গাছ কেমন তা তো বললেন না?

মৃদুল শুধোল আকাকে।

জাম গাছ দ্যাখছেন?

জাম গাছ? না তো। গাছ দেখিনি তবে খেয়েছি। কালোজাম। গোলাপজাম।

শ্যামবাজারের মৃদুল আকাশ থেকে পড়ল।

হায়! হায়! জাম গাছও দ্যাখেন নাই?

না।

খাইলে কি হয়। আকাতরু জাম গাছেরই মতন মস্ত গাছ—পাতাগুলান কিন্তু ঠিক পাকুর গাছের পাতার মতন। পাকুর গাছ দ্যাখছেন তো?

পাকুড় গাছ? নাঃ।

খাইছে। এ তো মহা সাহেবেরে লইয়া পড়লাম দ্যাখতাছি।

তারপর বলল, মস্ত বড় বড় গাছ হয় আকাতরু। সাদারঙা আমের বোলের মতন ফুল ফোটে, মার্চ-এপ্রিল মাসে আকাতরু গাছে।

এখনই তো মার্চ মাস।

তয় দেখবেন। চোখ খুইল্যা থাইকেন য্যান?

ইংরেজি, মানে বটানিকাল নাম জানেন নাকি? আকাতরুর?

মৃদুল সংকোচভরে আকাকে আবারও জিজ্ঞেস করল।

আমি জানুম কোত্থনে? তবে কল্যাণ দাস সাহেবে আর ভগবান দাস সাহেবে এই বাংলোতেই বইস্যা কয়দিন আগে কথা কইতাছিলেন, আমি শুইন্যা লইছি। খালি শুইন্যাই লই নাই, টুইক্যাও থুইছি। তা না হইলে আমারই ব্রেণ তো। হঃ। এক্কেরেই বেগ-বেগা!

বেগ-বেগাটা আবার কি বস্তু?

মানে, আমার ব্রেনে যা কিছুই ঢোকে তা বেগে টুইক্যাই আবার তৎক্ষণাৎ বেগে বাইরাইয়া যায়, বোঝলেন কি না!

কি? মানে, বটানিকাল নামটা কি?

HEYNEE TRIJUGA.

হেইল হিটলার-এর মতন শোনাল যে!

অবনী বলল।

সে এক ইংরেজ সাহেব আছিল B.Rox. স্যায় নাম থুইয়া গ্যাছে গিয়া ঐ গাছের।

তিনি কোথায়? সেই রক্স সাহেব?

কেডা জানে তা। কবে মইর‍্যা ভূত হইয়া গ্যাছে গিয়া।

কল্যাণ দাসটা কে?

বাবাঃ। তিনিই ত হইলেন গিয়া অ্যাডিশানাল ডি.এফ.ও। এ.ডি.এফ.ও কইলে আবার মহা চইট্যা যান গিয়া। তিনিই ত সব। ডিরেক্টরে রোজ আসেন থোরী।

অ্যাডিশনাল ডি.এফ.ও.-ও তো এ.ডি.এফ.ও.-ই।

তা ঠিক। কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট ডি.এফ.এ. ও ত এ.ডি.এফ.ও। তাই পুরাডা না

কইলে তাঁর মানহানি হয়।

তাই?

আসনে কি আর হয়? তিনি ভুল কইর‍্যা ভাবেন, যে হয়।

আর ভগবান দাস সাহেব?

তিনি শিলিগুড়ির থনে আইছিলেন। সিলভিকালচারের এ. ডি. এফ. ও।

ও।

তারপরই বলল, এইসব কথা থাউক। এহনে কয়েন, এঁচড় কি খাইবেন? ফাসকেলাস এঁচড় হইছে বাবুর্চিখানার পিছনের গাছে।

এঁচড় তো অমৃত।

মৃদুল বলল।

গাছপাঁঠা।

অবনী বলল।

তাইলে কই যাইয়া নর্বুরে।

নর্বুটা কে?

আরে? তারেই চিনলেন না? এই বাংলোর চৌকিদার-কাম-কুক-কাম-কেয়ারটেকার। হোয়াট নট? তার পুরা নাম হইতাছে নর্বু তামাং।

এত সব কথা আকা বলছিল বটে মৃদুল আর অবনীর সঙ্গে কিন্তু সমস্ত বাক্যাড়ম্বরের লক্ষ্য ছিল তটিনী।

কী যে হবে আকার, আকা জানে না।

তটিনী, ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটি চটির মধ্যে ঘষতে ঘষতে বলল, আপনার নাম যে আকা, সে কি আকাতরু থেকেই?

তটিনী তাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতেই ছাই-চাপা আগুন যেমন ফুঁ দিলেই দপ করে জ্বলে ওঠে, আকা তেমনি করে জ্বলে উঠল।

বলল, হ। বড়মায়ে তো তাই কইতেন। মস্ত গাছ তো। ভাবছিলেন আমিও মস্ত হইব বুঝি মানুষের মইধ্যে, আকাতরুরই মতন।

হয়েছেনেই তো।

মৃদুল বলল।

হঃ। স্যা তো চেহারায়। মানুষ আর হইতে পারলাম কই। বনমানুষই রইয়্যা গেলাম।

তটিনীর হাসি পাওয়ার কথা ছিল আকার এই কথাতে। কিন্তু অন্যদের মুখ

স্মিত হাসিতে ভরে উঠলেও তটিনী হাসল না।

একটু চুপ করে থেকে ও বলল, আপনারা সবাই কখন খাবেন?

তুমি যখন খাবে। তুমিই একমাত্র মহিলা দলে। তোমার ইচ্ছেতেই সব হবে।

মৃদুল বলল।

বাঃ তা কেন! একদিকে পুরুষের সমান বলে দাবি করব আর অন্যদিকে নেকু পুষু মুনু হয়ে সব সুযোগ নেব, তেমন মহিলা আমি নই। না, বলুন না?

অবনী বলল, কি রে আকা? যা না নিচে একবার। নর্বু তামাং না কি নাম বললি, তাকে একবার জিজ্ঞেস করে আয় ক'টা নাগাদ তৈরি হয়ে যাবে লাঞ্চ। আর এঁচড়ের লোভ যখন জাগিয়েই দিলি আমাদের মনে, তখন দেখিস যেন...

আরে কুনোই চিন্তা নাই তর। এঁচড়টা আমিই রাঁধুম।

তবেই তো সেরেছে। মুখে দেওয়া যাবে না।

তারপর তটিনীর দিকে ফিরে বলল, যা ঝাল আর তেল দেবে আকা!

তারপর বলল, তোর গুণপনা দেখাবার আরও অনেক জায়গা পাবি, জয়ন্তী, সান্ত্রাবাড়ি, বক্সাদুয়ার, ভুটানঘাট। অদ্যই তো আর শেষ রজনী নয়। কিন্তু যেখানে বাবুর্চি আছে সেখানে তোর হাতের রান্না খেতে আদৌ রাজী নই আমি।

ঠিক আছে।

আকা বলল।

আকা সিঁড়িতে ধপ ধপ শব্দ করে নিচে নেমে গেলে, মৃদুল স্বগতোক্তির মতন বলল, ভেরী গুড সোল। আপনার বন্ধু মানুষটি ওরিজিনাল। ভারি ভাল। ওঁর কোনো প্রোটোটাইপ এই ধরাধামে খুঁজে বের করা যাবে বলে মনে হয় না।

তারপরই বলল, করেন কি ভদ্রলোক। মানে অকুপেশান কি?

পরোপকার।

যাঃ। সত্যি বলুন না।

সত্যি পরোপকার। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়। অথচ বড়লোক যে, তাও নয়। আদৌ নয়। একটা বই-এর আর স্টেশনারির দোকান আছে আলিপুরদুয়ার বাজারে কিন্তু সেখানে সে দিনের মধ্যে দু ঘণ্টা থাকে কিনা সন্দেহ। বাকি সময়টা সত্যি দেশের উপকার করে বেড়ায়। স্বার্থগন্ধহীন উপকার। আলিপুরদুয়ারে এবং আশেপাশে ও হয়তো আজ অবধি শ'খানেক মড়া পুড়িয়েছে, পনেরোটি মেধাবী কিন্তু গরীব ছেলেকে পড়াশুনা শিখিয়ে পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, জনা কুড়ি দুঃস্থা মেয়ের ভাল বিয়ে দিয়েছে। একমাত্র

মিডওয়াইফ-এর কাজটাই করতে পারে না অথবা করতে দেওয়া হয় না সহজবোধ্য কারণে তা নইলে, ওর মতন সেবা-শুশ্রূষা হয়তো সদরের হাসপাতালের কম ট্রেইনড নার্সই জানে!

কুড়িটি মেয়ের বিয়ে দিলেন আর নিজের বিয়ে?

তটিনী জিজ্ঞেস করল।

ঐ তো! করল কোথায় আর!

কেন? বিয়ে করেন না কেন?

কেন?

বলে, হেসে ফেলল অবনী।

হাসছেন কেন?

তটিনী বলল।

অবনী বলল, সময় তো যায়নি।

তারপরে বলল, আকা রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা আউড়ে ডান হাতটা হাওয়ায় নেড়ে নেড়ে বলে, "মোর তরে যদি কেউ প্রতীক্ষিয়া থাকে / সেই ধন্য করিবে আমাকে।"

তারপরেই বল, হে বন্ধু "আয়"।

বাক্যটা তো "হে বন্ধু বিদায়"।

তা তো জানাই। কিন্তু ও বলে, হে বন্ধু আয়।

তারপর বলল, বাঙাল তো আমিও। কিন্তু ওর মতন হোল-হার্টেড হোলসাম বাঙাল পাওয়া ভার।

এই কথাতে ওরা সমস্বরে হেসে উঠল।

রিফিউজি হয়ে এসেছিলেন ওর বাবা-মা ফরিদপুর থেকে। আমার বাবার কাছে গল্প শুনেছি। আমরা পূর্ববঙ্গীয় হলেও আলিপুরদুয়ারে দেশভাগের আগে থেকেই থিতু হয়েছি। আমার বাবা ভারী ভালবাসতেন আকাকে। বলতেন Gem of a Boy। যখন আসেন তখন ছিল ওর কিশোরী বয়সের মায়ের স্বপ্নে আর পুতুল খেলাতে। উনিশশো বাষট্টিতে ওর জন্ম। বড় দাদারা সব অবস্থাপন্ন। কিন্তু আলাদা হয়ে গেছে। একজন গোয়ালপাড়ার গৌরীপুরের প্রফেসর। অন্যজন ধুবড়ির বড় কন্ট্রাক্টর। শুধু ওই ছোট থেকে গেল। ওর বৃদ্ধা মার সব দায়িত্ব ওরই। পরোপকার করে আর মায়ের যত্ন করে। মানুষ না-হওয়া আকাই মানুষের ভূমিকা পালন করে গেল। শুধু করলই না, ও আদর্শ মানুষের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

বড় ভায়েরা দেখেন না? মাকে?

ঐ উপর উপর।

পড়াশোনা?

আকা স্কুল ফাইন্যালের পরে আর পড়েনি বটে কিন্তু প্রচুর পড়াশোনা ওর। বন-জঙ্গল খুব ভালবাসে। আলিপুরদুয়ারের "নন্দাদেবী ফাউন্ডেশান" আর "ঋজুদা ফ্যান ক্লাব"-এর সক্রিয় সদস্য। প্রতি শীতে ভুটানের সীমান্তের পাহাড়ে বাচ্চাদের দল নিয়ে যায়। ও যেহেতু অজাতশত্রু, ওর দোকানের বিক্রি খুবই ভাল। ওর সাহায্যকারী যে ছেলেটি দোকান দেখে, সে বই আর স্টেশনারি জিনিস বিক্রি করেই হিমশিম খেয়ে যায় তাছাড়া প্রায় পঞ্চাশটি পরিবারের মাসের সব স্টেশনারি যায় ওরই দোকান থেকে। গৃহিণীরা লিস্ট করে পাঠিয়ে দেন। সাইকেল-ভ্যানে করে ও বাড়ি বাড়ি আরেকটি ছেলেকে দিয়ে তা সাপ্লাই করে। ধারে। মাস শেষ হলে টাকা দেন ওর পাতানো বৌদি, মাসিমা, পিসিমা, বোনেরা, দিদিরা।

আকা গর্ব করে বলে, দ্যাখ অবনী, ক্রেডিটে কারবার করি বটে, কিন্তু এক পয়সাও মার যায়নি আজ অবধি।

আমি বলি, তা যাবে কেন? তুই তো প্রায় কস্ট প্রাইসেই দিস সবকিছু, সকলকেই। প্রফিট আর কতটুকুই রাখিস? সস্তাতে হয়, তাই সকলেই নেন।

তাতে কি বলেন উনি?

তটিনী বলল।

বলবে আবার কি? জিভ কেটে বলে, ছিঃ ছিঃ। যা বাজার। প্রত্যেকের সংসার চালানোই যে এক বিষম ব্যাপার। বেশি প্রফিট করে কি করব? আর আমার সংসার তো শুধু আমার এবং আমার মায়ের। আমাদের প্রয়োজনটাই বা কতটুকু। কিন্তু ওর ব্যবসার যা ভল্যুম, তাতে ও ন্যায্য প্রফিট রাখলে এতদিনে গাড়ি কিনতে পারত, দোতলা পাকা বাড়িও করে ফেলতে পারত সহজেই। তার উপরে খয়রাতিও তো কিছু কম নয়। সাইকেল চড়ে পাড়ায় পাড়ায় ছেঁড়া কিন্তু সবসময়েই পরিষ্কার পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে ঘুরে বেড়ায় যখন, তখন মনে হয় যেন দেবদূত এল সাদা পক্ষিরাজে চড়ে। এ যুগে ওর মতন চরিত্র সত্যিই দেখা যায় না।

বাঃ।

তটিনী বলল, স্বগতোক্তির মতন।

তারপর বলল, এরকম চরিত্র যাত্রা থিয়েটারেই দেখা যায়, বাস্তবেও যে আছেন তা জানা ছিল না।

কী যে বল তটিনী! যাত্রা থিয়েটারে সিনেমাতে এখন ভাল বলতে কোন চরিত্রই বা দেখতে পাও? একটাও কি পাও? সমাজের, জীবনের যত কাদা তাই নিয়েই তো আমাদের মাখামাখি।

সত্যি!

অবনী বলল।

কাদা মাখতে বা তাতে ডুব দিতেও দোষ নেই। যদি কখনও সেই পঙ্কে পঙ্কজও ফুটত দু-একটি!

মৃদুল বলল।

ঠিক!

তটিনী বলল।

এমন সময়ে সিঁড়িতে আবার ধপ ধপ শব্দ হল। ঋজু, কালো, প্রায় ছ'ফিট লম্বা আকা উঠে এল দোতলার বারান্দাতে নিচ থেকে।

ওর পায়ের শব্দ শুনেই ওর সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করে দিয়েছিল ওরা।

কী বুঝলি?

অবনী বলল।

কি? আকা বলল।

আরে তোর নর্বু তামাং কি বলল?

নর্বু বলল, দেড়টার সময়ে টেবলে খাবার লাগিয়ে আমাদের খবর দেবে।

মেনু কি?

অবনী বলল।

হেঁটে বেশ খিদে হয়েছে, না? কিন্তু যা ঘেমে গেছি। আমার কিন্তু চান করতে হবে।

তটিনী বলল।

তাছাড়া ফ্রেশ, আন-পল্যুটেড পরিবেশ। তার একটা এফেক্ট নেই? আমার কিন্তু বেশ ভাল লেগেছে এই আলিপুরদুয়ার আর দুধ-ভাত-খাওয়া।

মৃদুল বলল।

তটিনী হেসে উঠল জোরে। বলল, দুধ-ভাত-খাওয়া নয়, রাজা-ভাত-খাওয়া। ভুটানের রাজা আর কুচবিহারের রাজার মধ্যে জোর যুদ্ধ লেগেছিল।

কিন্তু সেই যুদ্ধশান্তি হয়েছিল এখানেই। আর দুই রাজাই একসঙ্গে তাঁবুতে বসে ভাত খেয়েছিলেন বলেই জায়গার নাম হয়ে গেছে রাজাভাতখাওয়া। কুচবিহার তো কাছেই, ভুটানও তাই।

অবনী বলল মৃদুলকে, আপনি তো নড়লেনই না বারান্দা ছেড়ে। গেলে, দেখতে পেতেন ওয়াইল্ড লাইফ ইনফরমেশান সেন্টারের একটি দেওয়ালে চমৎকার রঙিন ছবি, মানে ফ্রেসকোর মতন আঁকিয়েছেন বিস্ত সাহেব।

বিস্ত সাহেব কে?

উনি ছিলেন বক্সা টাইগার প্রজেক্টের ফিল্ড ডিরেক্টর। এখন চলে গেছেন কনসার্ভেটর (হিলস) হয়ে দার্জিলিং-এ। ওঁর সময়েই এই ইনফরমেশান সেন্টারটি তৈরি হয়েছে। বিস্ত সাহেব এবং "ঋজুদা ফ্যান ক্লাবের" তপন সেন ইত্যাদিদেরও খুবই ইচ্ছে ছিল কলকাতা থেকে "জঙ্গলের লেখক' বুদ্ধদেব গুহকে এনে ঐ সেন্টারটির উদ্বোধন করানোর কিন্তু তিনি কাজে বম্বে চলে যাওয়াতে এবং উদ্বোধনের তারিখ আগেই স্থিরীকৃত হওয়াতে বর্ষীয়ান ও শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক, উত্তরবঙ্গেরই বাসিন্দা অমিয়ভূষণ মজুমদারকে সসম্মানে এনে তাঁকে দিয়েই ওটি উদ্বোধন করানো হয়।

অবনী বলল।

তাই?

হ্যাঁ।

তা বুদ্ধদেব গুহ জংলী লেখক না জঙ্গলের লেখক?

তা জানি না। একবার কাগজে পড়েছিলাম মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য জঙ্গলের লেখক বলে অভিহিত করেছেন ওঁকে।

জংলীও বলতে পারতেন।

ছাড়ুন তো! বুদ্ধদেব গুহ এমন কেউ নন যে তাঁকে নিয়ে সকালটা নষ্ট করতে হবে।

আপনি কি কোনো লেখা পড়েছেন ওঁর?

আকা বলল।

না। সাহিত্যিক বিচারে বই যে পড়তেই হবে তার কি মানে আছে? উনি বুর্জোয়া এবং বুর্জোয়াদের লেখক এইটুকু জানলেই যথেষ্ট।

আঁতেল মৃদুল দুশো পার্সেন্ট আত্মপ্রত্যয় এবং যুক্তির সঙ্গে বলল।

আকা বলল, বিস্ত সাহেব মানুষটা ফাস কেলাস। বাড়ি দেরাদুনে কিন্তু বাংলা

কন এক্কেবারে বাঙালীরই মতো, আর বই-ও যা পড়েন। কী আর কম্যু! বিশেষ কইর‍্যা বন-জঙ্গলের বই-এর, যারে কয় "পুকা" উনি তাই।

পুকাটা কি বস্তু?

মৃদুল বলল।

অবনী হেসে উঠে বলল, পোকা।

তাতে ওরা সকলেই হেসে উঠল।

মেনুটা কি তা তো বলবি।

ছিম্পল-এরই উপর করতাছে। যেমন কয়্যা দিছি।

তা-ও। কি কি বল না? **

'অবনী বলল।

এই হলুদ পোলাউ, যারে কয় বাঙালী পোলাউ, একটু মিষ্টি মিষ্টি, শিলবিলাতি আলু ভাজা, নারকোল, ছুটো-ছুটো চৌকো-চৌকো কইর‍্যা কাইট্যা তা ডালের মধ্যে ফ্যালাইয়া ছোলার ডাল। বকফুল ভাজা। তেকাটা মাছের ঝাল। বোরোলি মাছের ঝোল। কচি পাঠার মাংস। পুদিনা পাতা, ধইন্যা আর কারিপাতা একসঙ্গে কইর‍্যা বাটতে কইছি, চাটনি হইব। আর তটিনী দেবীর লইগ্যা পুস্ত বাটা। সঙ্গে হাঁসের ডিম সেদ্ধ।

মৃদুল ঠাট্টা করে বলল, মাত্র এই? আর কিছুই বললেন না রাঁধতে?

নাঃ। কইলামই তো! ছিম্পল-এর উপরেই কয়্যা দিছি। রাতে জয়ন্তীতে ভাল কইর‍্যা হইবখন। সেই বাংলার চৌকিদার অজয় ছেত্রী, নর্বুর চাইয়া বয়সেও বড় আর ইক্সপিরিয়েন্সডও বটে। ফাস কেলাস ডিনার খাওয়াইম্যু আজ।

বলেই, তটিনীর দিকে ফিরে বলল, আর আপনে দই খাইতে ভালবাসেন, তাই আপনার লইগ্যা আনছি বাণেশ্বরের দই।

কোথায় পেলি!

অবনী বলল, অবাক হয়ে।

আরে! লোক পাঠাইয়াছিলাম যে কুচবিহারে। বাণেশ্বর। ম্যাডাম খাইতে ভালবাসেন।

আপনাকে কে বলল?

তটিনী বলল।

কি?

যে আমি দই খেতে ভালবাসি?

তটিনী আবার বলল।

আমি জানি। আপনেরা যখন ছার্কিট-হাউসে কাল রাতে ডিনার খাইতেছিলেন তখন তো আমিই আড়ালে থাইক্যা সব খাবার-দাবার এক এক কইর‍্যা পাঠাইতেছিলাম আপনাগো। নইলে বাবুর্চি বাণেশ্বরের দই পাইত কোথনে?

মৃদুল বলল, তার আগে এগুলো কি জিনিস একবার ব্যাখ্যা করে বলুন।

কি জিনিস?

ঐ যে বললেন, শিলবিলাতি আলু, তেকাটা মাছের ঝাল, আর বোরোলি মাছের ঝোল? হাঙ্গর তিমিও খাওয়াবেন না তো?

মৃদুল কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করল।

অবনী বলল, এই সবই ইখানকার স্থানীয়। তেকাটা মাছ বা বোরোলি মাছ ডিমা, নোনাই কালজানি, রায়ডাক ইত্যাদি নদীতে হয়। ছোট মাছ, কিন্তু দারুণ স্বাদ। আর শিলবিলাতি আলুও এই অঞ্চলের স্পেশ্যালিটি, হয়ও শুধু বছরের এই সময়টাতেই।

বিশেষত্ব কি?

অবনী বলল, খুব ছোট ছোট হয় আলুগুলো। আঁশফলের চেয়েও ছোট। একেবারে নিটোল গোল। খেতেও ভারি ভাল।

বাঃ।

আপনাদের এইসব অঞ্চলে কত যে অবাক-করা সব ভাল লাগার জিনিস আছে!

শুধুই ভাল লাগার! ভালবাসার নেই?

তটিনী চুপ করেই রইল।

আকা মনে মনে বলল, হায়রে! চোখে কেবল শিলবিলাতি আলু আর বাণেশ্বরের দই-ই পড়ল, চোখের সামনে এই যে মস্ত এই আকাতরু, প্রায় মহীরুহরই মতন, তাকে চোখে পড়ল না।

তটিনী বলল, খেতে যখন দেরিই আছে অনেক, তখন আমি আরেকবার চানটা করেই ফেলি।

অবনী বলল, সে কি! সকালে তো করলেন।

সে তো কাকচান। আপনারা সব তৈরি হয়ে তাড়া লাগালেন। ঘুম থেকেও দেরি করে উঠেছিলাম। কী সুন্দর ঠাণ্ডা ছিল রাতে! আমার তো দুটো কম্বল লেগেছিল। কে বলবে মার্চের শেষ। কলকাতাতে তো পাখা চলছে সরস্বতী পুজোর পর থেকেই।

কিন্তু মজা দেখেছো? রোদ উঠলেই চারদিক গরম হয়ে গেল।

মৃদুল বলল।

তা ঠিক।

তটিনী বলল।

এখানে থেকে গেলে হতো বাকি জীবন।

মৃদুল বলল।

আপনি!

বলে, হাসল তটিনী।

কেন? আমি নই কেন?

বাবাঃ, আপনার কলেজ স্ট্রিট কফি হাউস, শনিবারের রেস-এর মাঠ, রবিবারের দুপুরে লেক-ক্লাবের ভডকা-সেশান, আড্ডা। আপনি তো ইনটেলেকচুয়াল। আপনি কি...এসব কথারই কথা। আর...

আর কি?

আর তো আমার জানা নেই। যতটুকু জানি, তাই বললাম। আপনি থোড়াই থাকতে পারবেন এমন জায়গাতে। আর কলকাতায় প্রতি মুহূর্তের প্রতিযোগিতা। পিকুল ব্যানার্জী বা বুলু চৌধুরী যেন জনপ্রিয়তাতে, যশে, বুদ্ধিজীবীদের জগতের নানাপ্রকার ক্ষমতার ক্রিয়াবিক্রিয়াতে আপনাকে ছাড়িয়ে না যায় তাও তো দেখতে হবে। সব সময়েই পায়ের পাতার উপরে ভর দিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যে। এই যে অভ্যেস আপনার। সকাল থেকে সন্ধ্যে এই তো একমাত্র একসারসাইজ। আপনি পারবেন এই শান্ত ঘটনাবিহীন জায়গাতে থাকতে? কোন কাগজ আপনার কোন ভূমিকা-সম্বন্ধে কি লিখল তা না জানলে রাতে আপনার ঘুমই হবে না। তাছাড়া, যাতে ভাল লেখা হয় সে জন্যেও তো কলকাঠি নাড়তে হবে, অঢেল মদ খাওয়াতে হবে। মদই তো আপনার তরল অস্ত্র। কত শত্রুকে নিধন করলেন আপনি আজ অবধি তা দিয়ে।

মৃদুলের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে এল। বলল, তাই? তুমি আজকাল অনেক বুঝছ তো তটিনী! এসব কি অনিমেষের শেখানো কথা?

ভুল মৃদুলবাবু। আমি কারও তোতা নই। কারো শেখানো কথাই আমি বলি না। আমি যেখানে পৌঁছেছি সেখানে অনেক উঁচুনিচু পথ নিজ পায়ে হেঁটে এসেই পৌঁছেছি। কেউই আমাকে সাহায্য করেনি।

মৃদুল বিদ্রূপের গলাতে বলল, তোমার তো তুমিই আছ। একশোতে একশো

নম্বর তো সেখানেই। আমার তো...

অবনী কথা ঘুরিয়ে বলল, মৃদুলবাবুর কথা জানি না। তবে অনেকেই টেনশানকে, স্ট্রেসকে গালাগালি করেন বটে কিন্তু স্ট্রেস এবং টেনশান ছাড়া কি আধুনিক কোনো মানুষ আদৌ বাঁচতে পারে? টেনশানই তো টানটান করে রাখে মানুষকে, আধুনিক মানুষের জীবনকে। একথা অবশ্যই ঠিক যে, প্রতিযোগিতা না থাকলে, সব সময়েই দৌড় না থাকলে, হেরে যাবার, সর্বক্ষণই পিছিয়ে পড়ার আতঙ্ক না থাকলে, মানুষ কি আদৌ এগোতে পারত? জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই? অমনভাবে বাঁচলে স্থিতপ্রজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, নাদুসর্বস্ব বুদ্ধদেব হয়ে যেত।

তুমি কোন বুদ্ধদেবের কথা বলছ?

বুদ্ধদেব আর ক'জন আছেন? যিনি বোধিলাভ করেছিলেন তিনিই তো একমাত্র বুদ্ধ। আদি এবং এক নম্বর।

আজকাল বুদ্ধদেব বললে এক নম্বর বুদ্ধদেবের কথা কারোই মনে পড়ে না। দু নম্বর বুদ্ধদেবেই দেশ ছেয়ে গেছে, সরোদিয়া, চিত্র-পরিচালক, মন্ত্রী, লেখক, এমনকি পাঁঠার কারবারীও।

পাঁঠার ব্যবসাদারের নামও আছে নাকি বুদ্ধদেব?

আছে বইকি। আমাদের আলিপুরদুয়ারের বুদ্ধ মজুমদার নেই?

হ। হ। আছে জলপাইগুড়ির ফ্যামাস রাইটার সমরেশ মজুমদারের কী য্যান ডিসট্যান্ট রিলেশান হয়।

আকা বলল।

আরে আসলে হয়তো হয় না কিছুই! কোনো মানুষের একটু নাম-টাম হলেই, গুড়ের ব্যবসায়ী, পাঁঠার ব্যবসায়ী সকলেই তাঁর "আত্মীয়" এবং "গ্রেট ফ্রেন্ড" বলে দাবি করে। অথচ জলপাইগুড়ির মানুষ সমরেশ মজুমদার হয়তো এই আত্মীয়র কথা জীবনেও শোনেননি।

যাক্ গে। আপনারা দু নম্বর বুদ্ধদেবদের নিয়ে থাকুন। আমি চানে যাই। গানে যাই-এর মতন?

মানে?

ও, অল ইন্ডিয়া রেডিও-এর এফ. এম. চ্যানেলের প্রোগ্রাম শোনেন না বুঝি? "ভোরাই", "আলাপন", "আজ রাতে"?

না তো!

সে কি! আজকাল তো সেটাই ক্রেজ।

তাই? শুনতে হবে তো!

শুনলে, তবেই জানতেন। "গানে যাওয়া" বা "চানে যাওয়া"র যে কত্ত রকম হয়!

মানে?

সেখানে অনেকেই ন্যাকা পুরুষ ও মহিলার গলা শুনবে, যাদের জন্যে হয়তো শীগগিরি বাংলা ভাষাটিই বিনা কারণে বিকৃত হয়ে যাবে। ন্যাকা মহিলা তাও সহ্য হয়, ন্যাকা পুরুষ দেখলে আমার গা বমি-বমি করে। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রত্যেক শব্দের শেষ অক্ষরটিকে নিয়ে রাবারের বেলুনের মতন টানাটানি করে, টেনে লম্বা করে ফুলিয়ে যাচ্ছেতাই করে দিচ্ছেন। দীর্ঘদিন এমন চললে তাদেরই মতন শ্রোতাদেরও উচ্চারণ অনবধানে বিকৃত হয়ে যাবে।

অবনী বলল, কত দিকের কত বিকৃতি আর রোধ করবেন আপনি মৃদুলবাবু? বিকৃতিই তো এখন জীবনের সমার্থক হয়ে গেছে।

মৃদুল একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তা ঠিক।

তারপরই বলল, একটা ইন্টারেস্টিং খবর দেখেছেন অবনীবাবু?

কোথায়?

THE STATESMAN-এ।

নাঃ। আমি কোনো খবরের কাগজ পড়ি না।

কেন?

অকারণ সময় নষ্ট বলে মনে হয়, তাই। টি.ভি.ও দেখি না। শুনে হয়তো অবাক হবেন আপনি, আজকালকার খবরের কাগজের ইন্ডাস্ট্রি, পুরোপুরিই বিবেক ও কর্তব্যজ্ঞানরহিত। দেশ ও দশের প্রকৃত ভাল নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। পাটের অথবা গুড়ের অথবা নরকঙ্কালের ব্যবসা ছেড়ে তাঁরা দয়া করে খবরের কাগজ যে কেন করতে এলেন ভেবে পাই না। পয়সা ছাড়া তাঁরা আর কিছুই বোঝেন না।

আর যা বোঝেন তা হলো বাঁদরকে শিব বানানো আর শিবকে বাঁদর।

যাত্রার বিজ্ঞাপন দেখতে, পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপন দেখতে যাঁরা কাগজ পড়েন তাঁরা পড়ুন। আমার বিন্দুমাত্র দরকার নেই।

চেয়ার পেছনে সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তটিনী বলল, অবনীবাবু, আপনি মানুষটি কিন্তু ওরিজিনাল। দশজনের মতো নন।

মানে, প্রোটোটাইপ নন আর কি!

মৃদুল বলল।

অনেক ভাবনা-চিন্তা করেন, বাছবিচারও। খুবই ভাল।

বাছবিচার না করলে আপনাকে এবং অবশ্য মৃদুলবাবুকেও খুঁজে-পেতে আমাদের আলিপুরদুয়ারে নিয়ে আসব কেন কলকাতা থেকে। যাত্রার কোম্পানি অথবা নট-নটীর কি অভাব ছিল?

হ। এটা তুই ঠিকই কইছস।

আমি তাহলে যাই। আপনারা তো সকলেই সকালেই চান সেরে নিয়েছেন। আবারও করবেন না কেউ নিশ্চয়ই!

না। যাও তটিনী। তুমি তটিনী! কোথায় তুমি অন্যকে চান করাবে না নিজে চললে চান করতে।

উত্তর না দিয়ে তটিনী ওর ঘরে গিয়ে দুয়ার দিল ভিতর থেকে। চানঘরটি বেডরুমের সঙ্গে লাগোয়া। সকালেই চানঘরটা খুব পছন্দ হয়েছে ওর। ঘেমেও গেছে খুবই। খুব ভাল করে চান করবে। চানঘর পছন্দ না হলে চান করতে ইচ্ছেও হয় না ওর। গান গাইতেও নয়।

৩

এই একটা জায়গা, যেখানে প্রত্যেক মানুষই, কী স্ত্রী, কী পুরুষ, স্বচ্ছন্দ, সৎ, অভণ্ড এবং ঢিলেঢালা। এই চানঘর। এখানে কারোই কোনো মুখোস থাকে না। যে মুখখানি মাকে দেখানো যায়, মুখোশহীন মুখ, তা আর দেখানো যায় শুধুমাত্র চানঘরের আয়নাকেই।

একে একে জামা-কাপড় সব খুলে ফেলল তটিনী। তারপর দাঁড়ালো আয়নার সামনে। তার প্রিয় শরীরের ছায়া ফেলে। ও কালো হলে কী হয়, ওর ফিগারটা যে এত সুন্দর তা শুধু নিজেকে পুরোপুরি নিরাবরণ করলেই ও বুঝতে পারে। আর বুঝতে পারে পুরুষমানুষদের চোখের আয়নাতে। কিন্তু পুরুষদের চোখের আয়নাতে যে শুধুই স্তুতি থাকে না, এই মুশকিল!

নিরাবরণ কিন্তু ও নিরাভরণ নগ্ন। দু কানে দুটি রুবীর দুল। মস্ত বড় জুয়েলার গেঁদু সেন দিয়েছে ওকে। ম্যাচ করা রুবীর হারও আছে। দুহাতে রুবীর বালা। শুধু দুলজোড়াই নিয়ে এসেছে। অভিনয়ের সময়ে তো ইমিটেশান জুয়েলারীই পড়তে হয়। সব সুদ্ধ লাখ তিনেক টাকা দাম হবে কম করে পুরো সেটটির।

গেঁদুবাবু বলেন, আহা! তোমার ফিঙের মতো কালো শরীরে এই রুবীর বেদানাদানার গয়নাগুলো যে কী জেল্লাই দিয়েছে! মনে হয়, যেন পলাশ ফুটেছে কালো গাছ আলো করে।

কিন্তু মুখে কাব্যি করলে কি হয়! মানুষটা বড়ই জংলী। কোন পুরুষ যে

আসলে কোন প্রজাতির তা বোঝা যায় সে নগ্ন হয়ে যখন বিছানাতে ওঠে শুধুমাত্র তখনই। কচুবনের শুয়োরের মতন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে গেঁদুবাবু তার শরীরে। নরম, নিভৃত, আর্দ্র শরীরী মাটি ছিটকোয় শক্ত খুরের আঘাতে আঘাতে। শুয়োরেরই মতন গেঁদু তার দাঁত দিয়ে তটিনীর নবনী-শরীর যেন চিরে চিরে দেয়।

শরীরী আদরও একটা মস্ত বড় আর্ট। পনেরো বছর বয়স থেকে অনেক পুরুষকে আদর করে আর অনেক পুরুষের আদর খেয়ে এই ভর তিরিশে পৌঁছে এসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনেছে তটিনী।

চাল-কলের মালিক, সেই মোটা, বেঁটে, কালো, মুখে বসন্তের দাগওয়ালা পানখাওয়া বাবুটি, যিনি তার বাবার চেয়েও বড় ছিলেন বয়সে, ধুতি আর পাঞ্জাবি পরতেন, সেই মানুষটিই কিন্তু তাকে যা কিছু শেখাবার সব শিখিয়েছিলেন। সব শরীরী ইতিবৃত্ত। মনেরই মতন, শরীরের মধ্যেও কম জটিলতা নেই। নারী-বিলাসী ছিলেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে বড় নরম, বুঝদার। কী সুন্দর করে কথা কইতেন তিনি, হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন কী করলে ওঁর নিজের ভাললাগা বাড়বে আর কী করলে তটিনীরও। পুরুষের আর নারীর শরীরের আলোছায়ার অলিগতিতে, খানা-কন্দরে, পাহাড়চুড়োয়, উপত্যকায় যে কত অগণ্য সুইচ আছে, যেখানে আঙুল ছোঁয়ালেই এক একটি পাঁচশো পাওয়ারের বাল্‌ব দপ দপ করে জ্বলে ওঠে, কত কঠিন হিমবাহ অবলীলায় গলে যেতে থাকে নারী শরীরের অভ্যন্তরে, তা উনি না শেখালে তটিনী কি কখনও জানত? মাস্টার রেখে গান ও নাচও তো প্রথমে উনিই শেখান তাকে। উনিই নামও রাখেন 'তটিনী'। ওর আসল নাম তো ছিল মাস্তুই। ডাক নাম যদিও। ভাল নাম ছিল ফুল্ললোচনী। ঐ নামেরই জন্যে পোস্ট অফিসে ফাই-ফরমাশ খাটা মাস্তুকে দেখেই ফ্লাশব্যাকে ওর পুরনো দিনে ফিরে গেছিল তটিনী। কিন্তু সে-নামে পরবর্তী জীবনে কেউই ডাকেনি ওকে। মা-মরা, মাতাল বাবার পরম অবহেলার মেয়েকে বাবা এবং অন্য সকলেও যে মাস্তু বলেই ডাকত।

ঐ প্রাণ খাঁ-ই মাস্তুর, থুড়ি, তটিনীর প্রকৃত শিক্ষাদাতা বাবা ছিলেন। যদিও সেই মানুষটার সঙ্গে তার শরীরী সম্পর্কও ছিল। সে তার রাখন্তি ছিল কিন্তু একটি দিনও জোর করেননি তার উপরে প্রাণবাবু। না শরীরের উপরে, না মনের উপরে।

তটিনীর শোবার ঘরে ছাগলের দুধ খেয়ে এবং চরকা কেটে অথবা অক্সোনিয়ান ইংরেজিতে বক্তৃতা করে ভারত স্বাধীন করা গান্ধীজীর বা

জবাহারলাল নেহরুর কোনো ফটো নেই। দুটি মাত্র ফোটো আছে। একটি মা-কালীর আর অন্যটি প্রাণ খাঁর। গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি আর চুনোট ধুতি পরা। পাঞ্জাবিতে হীরের বোতাম। রিমলেস চশমা। তাতে হালকা গোলাপি আভা। হাতের কব্জিতে রোলেক্স ঘড়ি, সোনার। বুক-ভরা কাঁচা-পাকা চুল। পাকানো, ছুঁচলো গোঁফ। মাথাকে ব্যাকব্রাশ-করা চুল। ব্রাইলক্রিমে চকচকে।

সেই এক বহিরঙ্গ মূর্তি। আর তার কুৎসিত নিরাবরণ মূর্তিটার কথা ভাবলে আজও গা ঘিন ঘিন করে। অধিকাংশ সময়েই চোখ দুটি বন্ধই করে রাখত তটিনী। প্রাণ খাঁ বলতেন, থাক থাক। চোখ বন্ধই থাক। শরীরের ও চোখ ছাড়া অন্য হাজারো চোখ আছে। তোর সব চোখ আমি একে একে খুলতে শেখাব দেখিস। সব মেয়েই অক্টোপাশ!

শিখিয়েওছিলেন।

পরে পরে চোখ খুলে থাকলেও কুরূপ মানুষটাকে দেখতেই পেত না। সেই অপার অন্ধকারেই মানুষটার শরীর অগণ্য ফুল ফোটাতো ওর শরীরে। কখনও কিছু হুল ফোটাতো। গান গাইত তটিনীর শরীরে।

বুঁ-উ-উ-উ-উ শব্দ করে একটা বোলতা নগ্না তটিনীকে চমকে দিয়ে উড়ে এল। মনে হলো, যেন ওর বুকেই কামড়াবে।

চিৎকার করে উঠছিল ও একটু হলেই। করলে, সীন ক্রিয়েট হতো। বাইরের দরজাতে ধাক্কা পড়ত। ওর শান্তি বিঘ্নিত হতো।

বোলতাটা পরমুহূর্তেই ঘুরে অন্য দিকে চলে গেল ভাগ্যিস!

তটিনী নজর করে দেখল, কমোডটা যেদিকে, তার পাশেরই কাঠের দেওয়ালে একটা ফুটো। জানালার পর্দার উপর দিয়ে দেখল, একটা মস্ত কাঁঠাল গাছ, অসংখ্য এঁচড় এসেছে সে গাছে আর সেই গাছেই মস্ত মধুর চাক। এই গাছ থেকেই বোধহয় আকাতরুবাবু এঁচড়ের বন্দাবস্ত করবেন। চানঘরের মধ্যে ঐ ফুটো দিয়ে তারা ঢোকে আর বেরোয়। সকালে লক্ষ্য করেনি যে, পেছনের দেওয়ালে লাইন দিয়ে বোলতা পিল পিল করছে।

ও সাবধানে ডানদিকের জানালাটা খুলে দিল হাঁটু গেড়ে বসে। মেয়েদের এই অসুবিধে। ছেলেদের ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো লজ্জাস্থান নেই। সে পুরুষ হলে দাঁড়িয়েই জানালাটা খুলতে পারত। জানালার পর্দার আড়ালে থাকত তার নিম্নাঙ্গ।

জানালাটা খুলতেই দেখল, পাশ দিয়ে একটা পাহাড়ী ঝোরা বয়ে গেছে পাথরে পাথরে লাফিয়ে লাফিয়ে। আর অন্য পারে, রাজাভাতখাওয়ার ডরমেটরীটা যেদিকে, তার পেছন দিকে একটি দোতলা বাংলো। অনেকগুলি

নেপালি পরিবার অথবা একটি যৌথ পরিবার সেখানে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা খেলছে। তাদের চিকন চিৎকারে এই নির্জনের বিলম্বিত সকাল চমকে চমকে উঠছে। লাল-নীল-হলুদ নানা রঙা ব্লাউজ আর শাড়ি পরা নেপালি মেয়েরা কেউ চুল আঁচড়াচ্ছে। কেউ চুল আঁচড়ে দিচ্ছে কারো। কেউ-বা রঙিন উলের লাছি নিয়ে বসে সোয়েটার বা গরম ব্লাউজ বুনছে আর সকলেই নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে।

বাংলোটার পেছনে একটা মস্ত বড় গাছ। কি গাছ, কে জানে? আকাতরু কি?

আকাতরু! গাছের নাম আকাতরু। আশ্চর্য! তার চেয়েও আশ্চর্য মানুষের নাম আকাতরু! গাছটা কি গাছ তা আকাবাবু এখানে থাকলে হয়তো বলতে পারতেন। ভাবনাটা ভেবেই ওর শরীর শিউরে উঠল। ভয়ে কি?

না ঠিক ভয়ে নয়, এক মিশ্র অনুভূতিতে।

ঐ জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে তটিনীর মন বড় উদাস হয়ে গেল। উদাস হয়ে গেল নানা মিশ্র কারণে। প্রাণবাবুর একটা কটেজ ছিল কালিম্পং-এ। গরমের সময়ে তটিনীকে নিয়ে প্রতিবছরই তিনি দিন পনেরোর জন্যে যেতেন সেখানে। সেই কটেজটিতে প্রাণবাবুর শোবার ঘরের লাগোয়া যে চানঘরটি ছিল সেই চানঘরে জানালা দিয়ে এইরকমই একটি ঝোরা আর নেপালিদের বাড়ি দেখা যেত।

প্রাণবাবু প্রতিদিন ওকে নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াতেন। রান্না শেখাতেন। কালিম্পং-এর সেই কটেজে সময় পেতেন তো অনেকেই। কলকাতাতে তো বড়জোর ঘণ্টাখানেক থাকতে পারতেন। খাওয়া-দাওয়া, গান শোনা, বই পড়া, তারপর বিকেলে তটিনীকে নিজে হাতে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে কালিম্পং-এর হেলিপ্যাডের দিকে হাঁটতে বেরোতেন প্রত্যেক দিন।

যদি কেউ দেখে ফেলে?

ভয়ে ভয়ে, তটিনী বলত, প্রথম প্রথম।

দেখলেই বা। আমি তো কারো মেয়ে-বৌ ভাগিয়ে আনিনি। তোকে তো আমি ফাটিয়েছি কুঁড়িরই মতন। প্রাণ খাঁ বাঘ। তাকে পেছন থেকে, আড়াল থেকে অনেকেই ফেউ অনেক কিছু বলবে হয়তো কিন্তু সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস কারোরই নেই।

কলকাতায় পুরোদস্তুর বাঙালী প্রাণবাবু কালিম্পং-এ গেলেই সাহেব হয়ে যেতেন। থ্রী-পিস স্যুট পরতেন, বাড়িতে গরম ড্রেসিং গাউন, মুখে পাইপ, দুপুরে গর্ডনর্স জিন আর রাতে হালকা সবুজ চারকোণা বোতলের ANCESTOR স্কচ

হুইস্কি খেতেন। তটিনীকে ভডকা আর টোম্যাটো জুস দিয়ে "ব্লাডি মেরী" বানিয়ে দিতেন যত্ন করে নিজের হাতে। ডিনারের পরে যখন দুজনে শীতের মধ্যে লেপের তলায় যেতেন তখন স্বর্গ নামত পৃথিবীতে। মানুষটা জীবনকে কি করে ভালবাসতে হয়, টাকা কি করে খরচা করতে হয়, তা জানতেন।

খেতে এবং খাওয়াতে খুব ভালবাসতেন মানুষটা। খাদ্য, পানীয়, শরীর এবং মন এই চার নিয়েই ছিল তাঁর জীবন। জীবন যে ভোগ করারই জিনিস, হা-হুতাশ করে বেদনা-বিলাস নিয়ে কাটিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে চিতাতে গিয়ে ওঠার জন্য নয়, তা প্রাণবাবু বিশ্বাস করতেন এবং সকলকে বিশ্বাস করতে বলতেনও।

নামহীন, যশহীন ছোট্ট পরিধির মধ্যে পরম তৃপ্ত সদা হাসি-খুশি মানুষটি মারাও গেলেন অমনি হঠাৎই। যেমনটি চেয়েছিলেন। কাজ করতে করতেই। তাঁর চাল-কলের বিরাট বিরাট বয়লারগুলো আর চাল সেদ্ধ করার ভ্যাটগুলোর সামনেই একদিন সকালে জলখাবার খাওয়ার পরে হার্ট ফেল করে পড়ে মারা গেলেন। তটিনী, কলের একজন কর্মচারীর মুখেই শুনেছিলেন।

প্রাণবাবু ওকে বলেছিলেন, দ্যাখ তটিনী, তোর আমার সম্পর্ক কিন্তু শুধুমাত্র জীবনেরই। মরণের পরে আমার আর কোনোই দাবি রইবে না তোর উপরে। আমি মরে গেলে তুই আমার কেউ নোস। তুই তখন যা খুশি করিস। পাছে তোকে কেউ অপমান করে বা বঞ্চিত করে তাই আমার জীবদ্দশাতেই তো তোকে সবকিছু করে দিয়ে গেলাম। মরে গেলে তোর জীবনে আমি শুধু একটা ফটোই হয়ে যাব। তাই এই ফটোটা তোকে দিয়ে গেলাম। তোকে নাচ-গান, অভিনয়, পড়াশুনো শিখিয়ে দিয়ে গেলাম তটিনী। সুখেই তোর দিন চলে যাবে। তোর ঘরের জোড়া খাটে শুয়ে যখন তুই অন্য পুরুষের সঙ্গে সোহাগ করবি, তাকে ভালবাসবি, তখন আমার এই ফটোটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখিস। নইলে তোর আনন্দে হয়তো কাঁটা বিঁধবে। আমারও হয়তো খারাপ লাগবে। মরার পরে কি সে সব বোধ বেঁচে থাকবে? কে জানে!

গায়ে সাবান মাখতে মাখতে ভাবছিল তটিনী, কত গভীরভাবে ভাবতেন প্রাণবাবু ওর কথা, ওর ভবিষ্যতের কথা। অমন করে বোধহয় খুব কম স্বামীও ভাবেন তাঁদের স্ত্রীদের জন্যে।

তাকে প্রাণবাবু তাঁর বিবাহিত স্ত্রীর সমান মর্যাদাই দিয়েছিলেন।

তটিনীর খুবই ঔৎসুক্য ছিল প্রাণবাবুর স্ত্রী কেমন তা জানতে। একদিন প্রাণবাবু নিজেই স্বগতোক্তির মতন বলেছিলেন, জানিস, তটিনী, আমার গিন্নী ভারি ভাল মানুষ। রূপও তার অঢেল। গুণের শেষ নেই। আমাকে খুব ভালও

বাসে।

তবে। আপনি আমাকে...

ওসব তুই বুঝবি না। একেকজন মেয়ে একেকরকম। ভগবান পুরুষকে এমনি অতৃপ্ত করেই গড়েছেন। ক্ষতিই বা কি? আমি তো তাকে কোনোদিক দিয়েই ঠকাইনি। সত্যিই তো ভালবাসি। তোকেও ঠকাইনি।

তবু...

তটিনী বলেছিল।

ও তুই বুঝবি না। তোর নিজের যখন একের বেশি নাগর হবে, সেদিন হয়তো বুঝবি। হয়তো নাও বুঝতে পারিস। মেয়েরা অন্যরকম। এ সবই ভগবানের লীলাখেলা। আমাদের বোঝাবুঝির বাইরে।

তটিনী অবশ্য কোনোদিনও অসতী হয়নি। যতদিন প্রাণবাবু তাকে রেখেছিলেন ততদিন শত প্রলোভনেও সে নিজেকে উড়িয়ে দেয়নি অন্যদিকে।

একবার প্রাণবাবুর বড় জামাই ওর কাছে এসেছিল, এক বর্ষার দুপুরে, প্রচুর মদ গিলে, বেহেড মাতাল হয়ে। একটি চকোলেট-রঙা ব্যুইক গাড়ি চড়ে। শুনেছিল, সেটা প্রাণবাবুরই দেওয়া। নাদুসনুদুস। নানারকম বীজ-এর মস্ত বড় ব্যবসাদার জামাই।

ফ্রিজ থেকে রসোগোল্লা বের করে আর লেমন স্কোয়াশ দিয়ে সরবৎ করে তাকে খাইয়ে তটিনী বলেছিল, শুনুন জামাইবাবু, বাড়ির উল্টোদিকের রক-এ কিন্তু একজন গুণ্ডা সবসময়েই বসে থাকে। তার কোমরে রিভলবার বাঁধা। আপনার শ্বশুরমশাইয়েরই নির্দেশে। চোখের ইশারা করলেই আপনাকে খতম করে দেবে। কখনও আর এমুখো হবেন না। আপনার শ্বশুরমশাই-এর চরিত্রের নরম দিকই দেখেছেন আপনি, কঠিন দিক দেখেননি। আপনার ভালর জন্যই একথা বলছি। মানুষটার মধ্যে অনেকগুলো মানুষ আছে।

কতক্ষণ যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এমন আবোল-তাবোল ভাবছিল তা বলার নয়।

অটোম্যাটিক গিজারে গরম জল ছিলই। অনেকক্ষণ ধরে ভাল করে চান করে তোয়ালে দিয়ে সারা শরীর মুছতে মুছতে আবার ও ওর শরীরের দিকে তাকাল।

শরীর, সব শরীরই ভারি সুন্দর। এবং ভারি নোংরাও। গাছের পাতারা এলোমেলো হাওয়াতে যখন আন্দোলিত হয়, যখন উল্টে যায়, যখন তাদের পেটের দিকটা দেখা যায়, তখন তা সাদা দেখায়। তাদর পিঠের রঙ যাই হোক না কেন। মানুষের শরীরেও যেখানে রোদ পড়ে না, তলপেট, উরু, জঘন, বুক,

মেয়েদের নাভির উপর থেকে বুকের নিচ অবধি পেটের অনাবৃত অংশটুকু ছাড়া তার 'ফিঙের' মতন কালো শরীরকেও পাতিকাকের গলারই মতন মসৃণ, ছাই-রঙা দেখায়। সে রূপ, ফর্সা যারা, তাদের চেয়েও ভাল। যারা দেখেছে তারাই জানে।

পাতাদের ভিতরদিকের রং যে অন্যরকম হয়তা কি জানে আকাতরুও?

এই লম্বা-চওড়া, পেটা, রোদ জলে তামাটে হওয়া শরীরের শিশুর মতন মনের এই যুবক তটিনীর মনে ভারি একটি শিহরণ তুলেছে। খরগোশ বা ছাগলছানা নিয়ে খেলতে যেমন ভাল লাগে, আকাতরুর সঙ্গও যেন তার মনকে তেমনই এক নিষ্পাপ, স্বর্গীয় ভাললাগায় ভরিয়ে দিয়েছে। দিচ্ছে।

আর শরীরকে?

শরীরও যেন মেঘলা আকাশ হয়ে গেছে। পরতের পর পরত মেঘের আড়ালে যেন গুরুগুরু ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। অস্ফুট। হয়তো বৃষ্টি নামবে। তখন কখন? কোথায়? কবে? তা ও জানে না। নাও নামতে পারে। কিন্তু নামতে যে পারে, এই ভাবনাটুকুর মধ্যেও ভারি শিহরণ আছে একটি।

আকাতরুর দৃষ্টিতে কোনো পাপ নেই। কিন্তু মৃদুলের দৃষ্টিতে আছে। অবনীর দৃষ্টিতে পাপও নেই, পুণ্যও নেই।

মৃদুলের চোখ তো নয়, যেন এক্স-রে মেশিন। ওর সামনে গেলেই তটিনীর মনে হয় যে, ও বিবস্ত্র হয়ে গেল। অধিকাংশ পুরুষই ঐরকম। তারা মেয়েদের শরীর ছাড়া অন্য কিছুই দেখে না। মেয়েরাও যে সমান সমান মানুষ, বুদ্ধিতে, শিক্ষাতে, রুচিতে, তাদের মনও পুরুষের মনের চেয়ে কোনোদিক দিয়ে, কোনো অংশেই যে কম নয়, এই সরল সত্যটি অধিকাংশ পুরুষেই বোঝে না। পুরুষেরা প্রেম বোঝে না, কাম বোঝে। এমনকি, আশ্চর্য, তারা মোহ পর্যন্ত বোঝে না।

সেই কারণেই এই সোজা, সরল, উদার, ভাল, কাঠ-বাঙাল আকাতরুকে এত ভাল লেগেছে তটিনীর। আর আকাতরুও প্রাণে বাঁচলে হয়! তার যে কী অবস্থা তা তটিনী ভাল করেই বুঝতে পারছে। এবং পারছে বলেই তার কষ্টটাকে আরও গভীর করে তুলে নিজের আনন্দকে দীপ্যমান করছে।

এও কি একধরনের স্যাডিজম?

কে জানে। মনস্তাত্ত্বিকেরাই বলতে পারবেন।

ভাবল, তটিনী।

মৃদুলের মতন শিক্ষিত পুরুষেরা আপাদমস্তক ভণ্ড, মিথ্যাচারী, পাজী। মৃদুল বিয়ে করেছে প্রমাকে। লিটল থিয়েটারের একটি দলে অভিনয় করে প্রমা। যেমন দেখতে মিষ্টি তেমনই ভাল মেয়ে। তটিনীর মতন নয়। ভাল ঘরের। সচ্চরিত্র।

মৃদুলের চেয়ে বয়সে অনেকই ছোট। প্রায় শিশুবধূই করেছে বলতে গেলে। প্রমা, মৃদুলের কণ্ঠস্বর, তার বুদ্ধি, তার ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে দারুণ গর্বিত। আবৃত্তিও ভাল করে মৃদুল। আজকাল যেমন অনেক আবৃত্তিকারেরাই জুটি বেঁধে নানা জায়গাতে আবৃত্তি, পাঠ, শ্রুতি-নাটক, এসবে প্রায় রোজই অংশ নেন এবং কিছু উপরি রোজগারও করেন, ওরা দুজনেও তা করতে শুরু করেছে। নাটক করে মিডিয়ার নজর যেটুকু কাড়া যায়, এই সব করে কাড়া যায় তার চেয়ে অনেকই বেশি, পৌনঃপুনিক প্রচারও হয় এইসবে যদি মিডিয়ার নজরে থাকে।

কিন্তু প্রমা জানে না যে মৃদুলের শিক্ষা আর সব গুণ সত্ত্বেও সে একজন বাজে স্বামী। অসৎ। নীতিহীন। সে প্রমাকে ভালও বাসে না। এক পার্টির একজন মাঝারী শ্রেণীর নেতা প্রমার মামা হন বলেই হয়তো প্রমাকে বিয়ে করেছে ও। সেই নেতা এবারের নির্বাচনে হেরে গেলেই 'প্রমাকে' ছেড়ে দিতে পারে মৃদুল। তার নিজের কেরিয়ারের জন্যে সে সবকিছুই করতে পারে।

কাব্য-সাহিত্য-সংগীত-আবৃত্তির জগতের এইসব মানুষেরা চেহারার ভণ্ড বদমাশদের তটিনীর মতন ভাল কেউই চেনেনি হয়ত। এই প্রেক্ষিতে তার প্রথম "বাবু" চাল-কলের মালিক প্রাণবাবু আর আকাতরু তার চোখে দুই আলাদা মেরুর মানুষ হয়েও অনেকই শ্রেয়, এইসব এঁটো-কুড়োনো, পাত-চাটা, শুধুমাত্র পচাগলা বাতিল মাংস ছিঁড়ে-খাওয়া শকুনদের চেয়ে। এদের কণ্ঠস্বর কৃত্রিম, উচ্চারণ বিকৃত, এরা চরম অসৎ।

'সৎ' শব্দটায় শুধু অর্থনৈতিক সততাই বোঝায় না। যদিও এই হা-ভাতেদের দেশে অর্থনীতিই সবচেয়ে মান্য বিষয়। শুধু অর্থনৈতিক সততাই নয়, কোনো রকমের সততাই নেই এদের। অথচ এদের সঙ্গেই তটিনীর ওঠা-বসা। এই সব আঁতেলদের চেয়ে প্রাণবাবু, গেঁদুবাবুরা অনেকই ভাল। তাঁরা ভণ্ড নন অন্তত। অনেক দিয়ে, সোজাসুজি বদলে কিছু চান। তাঁরা ব্যবসাদার। তাঁদের বাণিজ্যের রকমটা তবু বোঝা যায়। এরা সত্যিই চিজ এক একটি। অথচ পেশাদার যাত্রা করার বা নাটক করার কারণে মৃদুল-এর মতন মানুষদের সঙ্গেই তটিনীর দিনরাতের অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়। যাত্রাতে যে আজকাল অনেক পয়সা! এই বছরে ওর চুক্তি পাঁচ লাখের। পঁচিশ চেক-এ দেবে প্রডুসার। আর চার লাখ পঁচাত্তর ক্যাশ-এ। প্রডুসার সরকারী ঠিকাদার। যাদের বানানো রাজপথ প্রথম বর্ষাতেই ধুয়ে যায় তাদের পক্ষে চেক-এ বেশি দেওয়া মুশকিল তো! তটিনীদেরও সুবিধে। মিথ্যে বলবে না।

সরকারকে ট্যাক্স দেবেই বা কেন? কী দেয় সরকার বদলে? চোখরাঙানী ছাড়া?

৪

খেতে করতে সেই তিনটেই হয়েছিল। তবে খাওয়া দাওয়ার পরে বিশ্রাম আর নেওয়া হয়নি। রাজভাতখাওয়া থেকে জয়ন্তীর পথ অবশ্য খুব একটা বেশি নয়। কল্যাণ দাস, অ্যাডিশনাল ডি.এফ.ও. ওয়্যারলেস টেলিফোনে খবর পাঠিয়েছিলেন যেন ওয়াচ-টাওয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে যায় ওদের। কল্যাণ দাস-এর হেডকোয়ার্টার্স আলিপুরদুয়ারে। জীপ নিয়ে প্রায় রোজই তাঁকে আসতে হয় নানা জায়গাতে। সান্ত্রাবাড়ি, ভুটানঘাট, কোনোদিন সাংহাই রোডের মধ্যে দিয়ে বন দেখতে যেতে হয় কলকাতা থেকে ওপরওয়ালারা এলে অথবা ফিল্ড-ডিরেক্টর নিজে এলে। কখনও বা হাতির দলের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্যে তাদের দলের কোনো হাতিকে রেডিও-অ্যাকটিভ কলার পরানোর জন্যে ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে বেহুঁশ করে তারপর সেই কলার পরানো হয়। তখন অবশ্য কলকাতা থেকে সুব্রত পালচৌধুরী আসেন। টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। তাছাড়া, অবনী বলেছিলেন, কল্যাণ দাসের উপরওয়ালাও তো কম নয়। এখন কনসার্ভেটরের তো ছড়াছড়ি। ওয়াইল্ড লাইফ-এর কনসার্ভেটর শ্রী অতনু রাহা। সিলভিকালচারের কনসার্ভেটর সুব্রত পালিত। তাঁদের উপরে আছেন চিফ কনসার্ভেটর। তবে ওঁদের নাকি খুবই দুঃখ যে ফরেস্ট সেক্রেটারী কল্যাণ বিশ্বাস একবারও বক্সা টাইগার প্রজেক্টে আসেননি। এলে, এখানের সকলেই খুব খুশি হতেন, নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা বলতে পারতেন।

তটিনী গাড়ির সামনে বসেছে একা ড্রাইভারের পাশে। মারুতি ভ্যান একটি, লাল রঙা। পেছনে ওরা তিনজন। আকাতরু, অবনী আর মৃদুল। মৃদুল ঘন ঘন সিগারেট খায় বলে জানালার পাশে বসেছে।

এখন ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে গাড়িটা। আলো ছায়ার শতরঞ্জি বিছানো আছে পথে। দুপাশে মাথা উঁচু সব প্রাচীন মহীরুহ।

অবনী বলল, কি রে আকা! ঘুমিয়ে পড়লি না কি? তোকে বললাম, অত খাস না! তুই ঘুমিয়ে পড়লে তটিনী দেবী আর মৃদুলবাবুকে এই সব গাছগাছালি চেনাবে কে? তুই মানুষ নোস, বনমানুষ। সেই জন্যেই তো তোকে সঙ্গে আনা।

তটিনী বাঁ হাতটা খোলা জানালার উপরে রেখে বসেছিল। মাথায় পনিটাইল করেছে। লো-কাট একটা হালকা বাদামী রঙা ব্লাউজ। ঘাড়ের কাছে সাদা লেস-এর কাজ। তাতে যেন তটিনীর গ্রীবাকে মরালীর গ্রীবার মতন দেখাচ্ছিল।

তটিনী মুখটা পেছনে ঘুরিয়ে অবনীর কথার প্রতিবাদ করে বলল, উনি ভালোমানুষ বলে আপনার ওর পেছনে অমন করে লাগাটা উচিত নয় অবনীবাবু।

অবনী বলল, বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। বনে এসেছি বলেই তো বনমানুষকে এত ইম্পর্ট্যান্স দিচ্ছি। কিছুদিন আগে আমার চেয়েও বড় বনমানুষ এখানে এসেছিল। সব ঘুরে ফিরে দেখে গেলেন। বলেছেন ফিরে গিয়ে এখানকার কথা লিখবেন।

কে?

লেখকদের মধ্যে তো লেজবিশিষ্ট একজনই আছেন। বনমানুষ।

ও। বুঝেছি।

তটিনী বলল।

তাঁকে আমিও দেখেছি। 'নন্দাদেবী ফাউন্ডেশান'এও এসেছিল। চেহারা দেখলে মনে হয় না কোনোদিন বনে-জঙ্গলে ঘুরেছিলেন বলে।

তটিনী বলল, বয়স হলে, তারপর শহরে দিনের পর দিন থাকলে মানুষের চেহারা তো বদলে যেতেই পারে। তা বলে তাঁর অতীতটা তো আর মুছে ফেলা যায় না। বাহ্যিক চেহারাটা কিছুরই পরিচায়ক না মানুষের। না বিদ্যা-বুদ্ধির, না অভিজ্ঞতার, না মানসিকতার।

সেটা ঠিক।

মৃদুল বলল। তোমাকে দেখলেও কি বোঝা যায় যে তুমি কাছিম!

কেন? কাছিম কেন?

দেখলে মনে হয় গন্ধরাজ ফুল। শিশুও যেন সে ফুলের পাপড়ি ছিঁড়তে

পারে। কিন্তু তোমার ভিতরটা কাছিমের পিঠের মতো শক্ত।

তা হবে। আপনার চোখ তো নয়, এক্স-রে মেশিন। আপনি বলেই যা অন্যে দেখতে পায় না তা আপনিই পারেন সহজেই।

এই ফ্যাকল্টিটা ডেভালাপ করতে হয়েছে অনেক যত্ন করে তটিনী। কোনো কিছুই সহজে পাওয়া যায় না। চাওয়া যতই তীব্র হোক না কেন!

যাক। সার কথাটা বুঝেছেন যে এইটাই আনন্দের। এই সরল সত্যটাই বোঝে না অধিকাংশ মানুষ।

সামনে ওটা কি?

আকা বলল, ওইটারেই তো টাওয়ার কয়।

কিসের টাওয়ার?

ওয়াচ টাওয়ার। ওরই উপরে বইস্যা ত মান্যিগণিরা জানোয়ার দেখে। মানে, যারে কয় 'ওয়াচ' করে। তাই তো নাম, ওয়াচ-টাওয়ার।

তাই?

আউজ্ঞা।

সামনে ঐ ন্যাড়া জায়গাটা কি? ডানদিকে? এখানে কি মান্যিগণ্যি মানুষেরা কুস্তি লড়েন? দেখতে কুস্তির আখড়ার মতন।

আকাতরু হেসে উঠল।

তটিনী লক্ষ্য করল যে আকাতরুর হাসির মধ্যেও সত্যিই একটা বন্য ব্যাপার আছে। তার হাসিতেও যেন ডিমা নোনাই জয়ন্তী রায়ডাক এই সব নদীর আর চিকরাসি আর গামারি আর লালি গাছের আর বোরোলি আর তেকাটা মাছের গন্ধ লেগে আছে। আকাতরু এই আকাতরু—বনে না জন্মালে যেমন ওর জীবন বৃথা হতো। কলকাতার মেকী আর ভণ্ড আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের প্রেক্ষিতে ও যেন সত্যিই এক প্রতিবাদ। আকাতরু সঙ্গে না থাকলে এই বঙ্গার বনে তটিনীর আসাই বৃথা হতো।

আকাতরু বলল, এরে কয় নুনী।

নুনী! মানে?

অবনী বলল, ইংরেজিতে একেই বলে SALT LICK.

সেটা কি বস্তু?

মৃদুল বলল।

ন্যাচারাল সল্ট-লিক থাকে সব বনেরই ভিতরে। মাটিতে বা পাথরে নুন থাকে। সেই নুন চাটতে আসে তৃণভোজী সব জানোয়ার। আর তাদের পেছনে

পেছনে আসে মাংসাশীরা। তবে এটি ন্যাচারাল নয়। বন-বিভাগ বস্তা বস্তা নুন ফেলে রাখেন। নইলে মান্যিগণ্যিরা জানোয়ার দেখবেন কি করে।

অবনী বলল।

আই সী।

মৃদুল বলল।

আমার কিন্তু ভাল লাগে না। এই নুনীতে যে সব জানোয়ার নুন চাটতে আসে নির্ভয়ে, এই টাওয়ার ওখানে আছে জেনেও তাদের মধ্যে বন্যতা থাকে না। তার চেয়ে আমি মানুষটা বেশি বন্য।

তা ঠিক। কাজিরাঙ্গার গণ্ডার, বান্ধবগড়ের বাঘ যেমন দেখতে লাগে আর কি। এমন কি আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি বা গোরোংগোরোর সিংহ বা চিতা। মনে হয় চিড়িয়াখানার জানোয়ার দেখছি।

মৃদুল বলল।

আপনি কি আফ্রিকাতে গেছেন না কি?

মৃদুল বলল, আজকাল পৃথিবী দেখতে বেরোয় গাধারা। সমস্ত পৃথিবীটাই তো স্যাটেলাইট আর টিভির নানা চ্যানেলের দৌলতে মানুষের বসার বা শোয়ার ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছে। আমি যাব কোন দুঃখে। পাশে হুইস্কির বোতল, বরফ আর সিগারেট নিয়ে সোফাতে বসে মোড়ার উপরে পা তুলে দিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াই।

আর প্রমা? প্রমা তখন কি করে?

তটিনী বলল।

মেয়েদের যা করা উচিত। আমার জন্যে ভাল মন্দ রান্না করে।

বাঃ।

বাঃ। কেন? এতে বাঃ-এর কি আছে? আমি একজন নাট্যকার, অভিনেতা যাত্রা করলেও ওয়ান অফ দ্যা লিডিং স্টেজ অ্যাকটর, আমিই রোজগারটা করি। আমি আমার কর্তব্য করলে সে তার কর্তব্য করবে না!

প্রমাও তো অভিনয় করে। ভাল গান গায়। আবৃত্তি করে।

তটিনী বলল।

ছাড়ো তো। সে সব তো আমারই কানেকশানস-এর জন্যে।

তটিনী আহত হলো। মৃদুলের এই স্বার্থপর আত্মম্ভরী রূপের সঙ্গে পরিচয় ছিল না তটিনীর। হেসে ও যেন নিজেই লজ্জিত হলো। ভারী কষ্ট হলো প্রমার জন্যে।

মৃদুল বলল, আসরে প্রমা খুব হোমলি। স্বামীকে নিজে হাতে ভাল-মন্দ রান্না করে খাওয়াতে খুব ভালবাসে।

সময় পায় কি করে! বেশির ভাগ দিনই তো আপনারা দুজনে একই সঙ্গে বাড়ি ফেরেন!

সময় করে নেয় প্রমা। আমার জন্যে সময় করে। সব পুরুষের ক্যারিসমা তো সমান নয়। কিছু পুরুষ থাকে তারা প্রত্যেক মেয়ের কাছেই জাস্ট ইরেজিস্টিবল্।

তটিনী মুখে কিছু বলল না। মনে মনে বলল, ভাবছ তাই! কজন মেয়েকে দেখেছ? কী যে ভাবে নিজেকে! আর...

তারপরই বলল, ও মাঃ! ওগুলো কি লাল লাল বলের মতন? ঐ মানুষেরা ওগুলো কুড়িয়ে জড়ো করছে কেন? নিয়ে যাব কটা ঘর সাজাবার জন্যে?

টাওয়ারের সামনে থেমে-থাকা গাড়ির দরজা খুলে আকাতরু নামতে নামতে বলল, ঘর তো সাজায় মানুষে এ দিয়ে। তারপর বনবিভাগও জমিয়ে রাখে বীজের জন্যে।

দেখে মনে হয়, যেন মাকাল ফল। তাই না? ছোট মাকাল ফল।

মৃদুল বলল।

মাকাল ফল দেখেছেন আপনি?

তটিনী বলল।

দেখব না!

আপনি তো গ্রামে থাকতেন না। আমি না হয় গ্রামের মেয়ে।

চিনি। চিনি। আমি সব চিনি।

সর্বজ্ঞর মতন বলল মৃদুল।

তটিনী মনে মনে বলল, মাকাল তো মাকাল চিনবেই। গায়ের রঙ একগাদা ফর্সা হলেই এদেশে মানুষে সুন্দর বলে গণ্য হয়। এই পদ্ধতিতে মিত্তির সাহেবের পিগারিতে সুইটজারল্যান্ড থেকে ইমপোর্ট করা সাদা শুয়োরগুলোও সুন্দর।

তারপর, আকাতরুকে প্রশ্ন করল, ওগুলো কোন গাছের ফল?

দুধে লালি। লইবেন তো কয়টা, না কি?

নেব।

সোৎসাহে বলল তটিনী।

দুধে লালির ফল সংগ্রহ করার পরে তটিনী বলল, যেখানে যাচ্ছি সেখানে গিয়ে একটু ধুয়ে নিতে হবে। কোথায় যেন যাচ্ছি আমরা?

জয়ন্তী। অবনী বলল।

তারপর, বলল, আকা তুই কিন্তু ফাঁকি মারছিস। ওই সব গাছগাছালি তো অন্য বেশি জমিতে হয় না, সব গাছগুলো চেনা মৃদুলবাবু আর তটিনী দেবীকে। চুপ করেই যদি বসে থাকবি তো এলি কেন?

উত্তরে আকাতরু চুপ করেই রইল। কী আর বলবে। কেন যে এল সে ওই জানে। আকাতরুর সেই গানটি মনে পড়ে গেল। ইন্দ্রনীল সেন সেদিন গেয়ে গেলেন আলিপুরদুয়ারে।

"কি সুর বাজে আমার প্রাণে
আমিই জানি, মনই জানে।
কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কী ধন মাগি
তাকাই কেন পথের পানে।।
আমি জানি, মনই জানে।"

এটা কার গান কে জানে! অতুলপ্রসাদের কি? নাঃ। ওর গলাতে যদি ভগবান একটু সুর দিতেন তবে ও অবশ্যই গান শিখত। তটিনী যে কী সুন্দর গান গায়। যখন স্টেজে উঠে ও সেজেগুজে গান গায় তখন মনে হয় আকাতরুর যে, ওর গলাতে চুমু খায়! একটা গান আছে 'হলুদ গোলাপ'-এ। কার লেখা গান অতশত ও জানে না আকা, কিন্তু গানের কথা আর তটিনীর গলা মিলে যেন ওর প্রাণে রাভাদের ছোঁড়া বর্শারই মতন গেঁথে গেছে সেই গানটি।

"প্রাণ তুমি প্রেম সিন্ধু হয়ে, বিন্দুদানে কৃপণ হলে
ওগো পিপাসিত জনে, উপায় কি দেহ বলে...।

দানাদার টপ্পার দানাগুলি যেন এক একটি হিরের মতন ঝকমক করে।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। ওরা চলেছে জয়ন্তীর দিকে।

এটা কি গাছ?

এবারে মৃদুল বলল।

কোন্‌টা?

লম্বা আকা ঘাড় হেঁট করে মুখ বাড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করে বলল, কোন গাছটা?

ঐ যে। ঐ সামনের ঐ মোড়ের বাঁদিকে যে গাছটি আছে, সেটি।

ওইটারে ইখানে আমরা কই মেড়া গাছ।

কি গাছ?

তটিনী জিজ্ঞেস করল।

কইলাম না। মেড়া গাছ।

কী নাম রে বাবাঃ। এ কোন লিঙ্গ? পুরুষ তো।

অবনী বলল, মেড়া যখন তখন নিশ্চয়ই পুরুষ। "দুর্বলে সবলা নারী সসাঃ প্রাণঘাতিকাঃ"।

মৃদুল আর তটিনী খুব জোরে হেসে উঠল।

তটিনী বলল, আপনি খুব রসিক আছেন মশাই। যাই বলুন আর তাই বলুন।

অবনী বলল, আকা আমার চেয়েও বেশি রসিক। তবে ওর জার্মান ভাষাটা বোধহয় আপনাদের বিশেষ রপ্ত হচ্ছে না। ল্যাঙ্গোয়েজ ব্যারিয়ারে আটকে যাচ্ছেন।

তটিনী বলল, এই জন্যেই আমার মনে হয় পৃথিবীর সব মানুষদেরই বোধগম্য হয় এমন একটা INSTRUMENTAL ভাষা উদ্ভাবন করা উচিত। ভাষার বাধা না থাকলে মানুষে কত সহজে সারা পৃথিবীর কাছে পৌঁছতে পারত। পণ্ডিত রবিশংকর, আলি আকবর খাঁ সাহেব, আমজাদ আলি খাঁ সাহেব বা নিখিল ব্যানার্জি বা বুধাদিত্য মুখার্জি যত সহজে সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে পৌঁছেছেন তত সহজে কি আবদুল করিম খাঁ সাহেব বা ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খাঁ সাহেব, সিদ্ধেশ্বরী দেবী অথবা কিশোরী আমনকার কখনও পৌঁছতে পারবেন?

অবনী বলল, পারবেন অবশ্যই তবে হৃদয়ের সঙ্গে বোধ ও অনুভূতির মাধ্যমে যতখানি পৌঁছনো যায় ততখানিই পৌঁছবেন। তার বেশি নয়।

আকা বলল, ঐ দেখেন। ঐটা হইল গিয়া সিঁদুরে গাছ। বড় গাছ তাত দেখতাই আছেন। ঐ গাছের ডাল পুড়াইয়া যে কাঠকয়লা হয় তা গুঁড়া কইর‍্যা গান-পাউডার হয়। গারো রাভা মেচিয়া নেপালি ডুবকা হক্কলেই যাদের কাছে বে-পাশী গাদা বন্দুক আছে, তারা বারুদ বানায়।

গাদা বন্দুকটা কি জিনিস?

তটিনী বলল।

হেইডাই ত ওরিজিনাল বন্দুক। গান পাউডার নলের মধ্যে ঠুইস্যা দিয়া সামনে সীসা বা লোহার বল বা খুচড়া টুকরা-টাকরা ভইর‍্যা দিয়ে 'BALL' আর 'SHOTS' হয়। তারপরে না সব একে একে অন্য বন্দুক রাইফেল সব আইছে। কর্ডাইট, হ্যামারলেস, চোক, ইজেক্টর, রিপিটর। আর বন্দুকই বা কত, সিংগল-ব্যারেল, ডাবল-ব্যারেল, ওভার-আন্ডার, প্যারাডক্স, লেখা জোখা আছে না কি।

আপনি এত জানলেন কি করে?

ওর বড়মামা ছিলেন খুব নামকরা শিকারী জলপাইগুড়ির। চা-বাগানের সব সাহেবরা বন্ধু ছিলেন। চা বাগান ছিল মামার। তারই শাগরেদি করে শিখেছে আর কি। আমাদের আকা কিন্তু গোটা চারেক চিতাও মেরেছে। হরিণ, কুমীর, ঘড়িয়াল, পাখি, এসবের তো গোনাগুনতি নেই।

ছিঃ। কী নিষ্ঠুর আপনি। কী করে মারেন অমন সব প্রাণী আর পাখিদের।

আকা বলল, যখন মারছি, তখন মেলাই ছিল। আর শিকারী হিসাবেই মারছি। BUTCHER হিসাবে নয়। আমাগো ছুটোবেলায় আইনকানুন ছিল দ্যাশে। এমন পূর্ণ স্বাধীনতা তো ছিল না তখন।

বলেই, মনে মনে বলল, হায়রে সুন্দরী। বন্দুকে আওয়াজ হয় বইল্যা বন্দুকের মার বোঝন যায় আর তুমি যে আমারে এক এক চাউনি দিয়াই প্রতিক্ষণে মারতাছ তার বেলা? শালার ভগবানের কুনোই বিচার নাই।

ঐগুলো কি গাছ?

মৃদুলবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন।

ও তো আমলকি।

অবনী বলল। এ গাছ আমিও চিনি। একেবারে বন হয়ে রয়েছে যে।

আকাতরু বলল, চিত্রল হরিণে আমলকি খাইতে খুব ভাল পায়। আর কোটরা বা বার্কিং ডিয়ারে খুবই ভাল বাইস্যা খায় শিমুলের ফুল।

ঐ সিঁদুরে গাছের বটানিকাল নাম জানিস?

অবনী শুধালো আকাতরুকে।

জানি।

কি?

MALLOTUS PHILIPINENSIS. মুয়েল সাহেব নাম দিছিল।

তিনি আবার কিনি?

তা আমিই কি ছাই জানি।

এটি কি ফিলিপাইনস-এর গাছ?

সম্ভবতঃ তাই। নাম শুইন্যা তো তাই মনে হয়।

আপনি এত জানলেন কি করে? আকাতরুবাবু?

মৃদুল বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল।

জানবার ইচ্ছা হইল তাই। আমাগোর মধ্যে অধিকাংশরই কুনো ইনকুইজিটিভনেসই নাই। আপনে যদি ফরেস্ট ডিপার্টের সাহেবদেরও জিগান, ইটা কি গাছ মশয়? তয় উত্তর পাইবেন : গাছ। যদি জিগান, ইটা কি পাখি

মশয়? তবে উত্তর পাইবেন : পাখি। তবে এই অঞ্চলে ময়নাবাড়ি বিট-এর বিট অফিসার আছেন সুভাষ রায়। সেই ভদ্রলোক জঙ্গল এক্কেরে গুইল্যা খাইছেন। অত বটানিকাল নাম টাম জানেন না, ইংরাজি বা ল্যাটিন, কিন্তু দিশি নাম জানেন হক্কলের।

অবনী বলল, ময়নাবাড়ি বিট কোন ফরেস্ট রেঞ্জ-এর আন্ডারে?

নর্থ রায়ডাক রেঞ্জ। ঐ রেঞ্জের রেঞ্জার সুবীর বিশ্বাসও ভাল মানুষ। নতুন আইছেন। তবে জঙ্গলের 'পুকা' হইলেন গিয়া ঐ সুভাষবাবু।

মৃদুল বলল, 'পুকা-ফুকা' দিয়ে আমি কি করব। যখন জয়ন্তী থেকে ভুটানঘাটে যাব তখন আপনার ঐ সুভাষবাবু বা রেঞ্জার সাহেব কি ভুটানি হুইস্কি খাওয়াতে পারবেন? "ভুটান মিস্ট" বলে একটা হুইস্কির নাম শুনেছিলাম আলিপুরদুয়ারে।

অবনী বলল, সর্বনাশ। সে তো স্মাগলড জিনিস।

হ্যাঁ।

মৃদুল বলল।

তারপর বলল, ভুটান থেকে সস্তা এক বোতল "ভুটান মিস্ট" যোগাড় করলেই জেলে যেতে হবে আমাকে। কিন্তু ভারতে স্মাগলড জিনিসতো কিছুই আসে না! কলকাতার খিদিরপুর, মেট্রো সিনেমার পাশের গলি, পুরো চৌরঙ্গী এলাকা, শিলিগুড়ির বাজার, নকশালবাড়ির কাছের ধুলাবাড়ির বাজার, এ সমস্ত জায়গাতেও কোনো স্মাগলড জিনিসই বিক্রি হয় না। কলকাতার নিউমার্কেট, এয়ারকন্ডিশানড মার্কেট, নিউ দিল্লীর পালিকা বাজার, বম্বের 'হীরা-পান্না', স্মাগলড জিনিস কি কোথাওই পাওয়া যায়? আমাদের দেশের পুলিস আর কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট যখন সততার গল্প ফাঁদে তখন তাদের বলতে ইচ্ছে হয় যে, আর কোনো গুণ যদি নাই থাকে তো চক্ষুলজ্জাটা তাদের অন্তত থাকা উচিত। 'বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।'

আপনি বেশি সীরিয়াস হয়ে যাচ্ছেন মৃদুলবাবু।

মৃদুল, দুশ্চরিত্র হলেও, ভণ্ড হলেও মনে হয় মানুষটা অসৎ নয়।

সে বলল, 'সীরিয়াস' একটা ইংরেজি শব্দ। তাতে কোনো ম্যাগনেচুড নেই। তাই, আমি সীরিয়াস হতে পারি কিন্তু বেশি বা কম সীরিয়াস হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

যাকগে।

অবনী বলল।

অবনী ভাবছিল, মৃদুলবাবুর গলার স্বরটি ভারী ভাল। কলকাতার এফ.এম.-এর প্রোগ্রাম যাঁরা কনডাক্ট করেন তাঁদের গলার স্বরের মতন। কিন্তু গলার স্বরের ভালত্ব আর বক্তব্যর ভালত্ব বোধহয় সমার্থক নয়।

তটিনী বলল, আমাকেও কলকাতাতে একজন বলেছিল 'ভুটান মিস্ট' বলে একটা হুইস্কি ভুটান থেকে আসে। সেটা নাকি চমৎকার।

তুমি কি আজকাল হুইস্কির সমঝদার হয়েছ নাকি তটিনী?

যে পরিবেশে, যে প্রতিবেশে থাকি তাতে এতদিনে যে পাঁড় মাতাল হয়ে যাইনি তাই তো যথেষ্ট। আমি মাঝে মধ্যে একটু-আধটু খাই না যে তা নয়, তবে শুধুই সাধুসঙ্গে খাই।

আমি কি সাধু নই?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন নিজেকেই করবেন। আমি তো জজসাহেব নই, আপনার আয়নাও নই। আমার মতামতের দামই বা কি?

মৃদুল বলল, যাই হোক অবনীবাবু, তটিনী যখন খোঁজ দিলই তখন 'ভুটানী কুয়াশা' একটু যোগাড় করুন। আপনাকে দিয়ে হবে না মনে হচ্ছে। পারলে ঐ আকাতরুবাবুই পারবেন। দাম আমি দিয়ে দেব।

আকাতরু চুপ করে থাকল। সে মদ খায়ও না, কেউ খাক তা পছন্দও করে না। তটিনী যে মাঝে মধ্যে খায় এই কথাটা তাকে ব্যথিত করেছে।

সুভাষচন্দ্র রায়, মানে ময়নাবাড়ি বীট-এর বীট অফিসারের কথা যখন উঠলই তখন বলি প্রমীলার কথাও।

আকাতরু বলল।

প্রমীলাটি কে? তার রক্ষিতা নাকি? নাকি অনূঢ়া কন্যা?

মৃদুল বলল।

ছিঃ। ছিঃ।

বলল অবনী।

'যাদৃশী ভাবনা যস্য', কী করা যাবে। মৃদুলবাবুর ভাবনার জগতটা হয়তো ছোট।

তটিনী বলল।

হয়তো তাই। রক্ষিতাদের বৃহৎ জগৎ সম্বন্ধে তোমার যতখানি জ্ঞান আমার তো ততখানি নয়।

মৃদুল বলল।

আকাতরু বলল, ভদ্রলোক সংসারী। ওখানে একা থাকেন। ফ্যামিলি অন্যত্র

থাকেন। তারপর একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, এইরকম বাজে ইয়ার্কি ভাল নয়।

যাক সে কথা। এখন বলুন, প্রমীলা কে?

প্রমীলা বনবিভাগের পোষা হাতি। ময়নাবাড়ি বীট-এই থাকে। নানা কাজে লাগে। মাদী হাতি।

প্রমীলা যে মরদও হয় তা তো আগে জানতাম না! তবে প্রমীলাদের মধ্যেও মরদের স্বভাব থাকে যদিও অনেকেরই।

মৃদুল বলল।

খোঁচাটা যে তটিনীরই প্রতি তা তটিনী যেমন বুঝল, অন্যরাও বুঝল।

তটিনী বলল, তা ঠিক। আবার উল্টোটাও দেখা যায় অনেক সময়ে।

কী রকম?

মৃদুল বলল।

খ্যাতিতে পুরুষসিংহ, আসলে নখদন্তহীন, ম্যাদামারা।

মৃদুল চুপ করে গেল।

আকাতরু শুনছিল সব আর তার কপালের শিরা দুটি দপ্‌দপ্‌ করছিল। ওর বন্ধু ডাক্তার মৃগেন বলে যে, ব্লাড-প্রেসার হাই হয়ে গেছে। ওষুধ খাওয়া দরকার। সবরকম উত্তেজনা বর্জন করাও উচিত। কিন্তু কী করবে। তারই সামনে কেউ তটিনীকে ঠুকবে আর তার ব্লাড-প্রেসার ঠিক থাকবে তা তো হবার কথা নয়!

এটা কি গাছ?

তটিনী বলল, আকাতরুকে।

ঐটা হলদু। সফ্‌ট উড। কাঠের রঙও হলুদ হয়। কাঁটাল কাঠ দ্যাখছেন কখনও?

হ্যাঁ। গ্রামে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি দেখেছি। আমাদের বাড়িতেও ছিল। সস্তার কাঠ।

ঠিকোই কইছেন! হলদুও তাই।

এবারে আপনি পর পর গাছগুলো চিনিয়ে দিন তো আমাকে। এই 'হলুদ গোলাপ' যাত্রা নিয়ে এসে তো অনেক কিছুই ভুলতে বসলাম। কিছু শিখেও যাই এখান থেকে।

বেশ। কইত্যাছি। শোনেন আপনে।

মৃদুল বলল, মনেই ছিল না। আমাদের সঙ্গে ফ্লাস্কে তো কফি আছে। এই নিবিড় নিশ্ছিদ্র জঙ্গলে একটু কফি খেয়ে অ্যাডভেঞ্চার করলে হতো না কি? না

কি রাতের বেলা হবে।

রাতের বেলা হাতির লাথি খেতে কে আসবে এখানে? উত্তরবঙ্গের হাতিরা ডেঞ্জারাস এবং আনপ্রেডিকটেবল। হ্যাবিট্যাট নষ্ট হয়ে গেছে।

অবনী বলল।

হাতির হ্যাবিট্যাট নষ্ট হয়েছে বলে প্রায়ই নানা কাগজে বন্যপ্রাণী দরদী আর পণ্ডিতদের আর্টিকেল দেখি। অথচ মানুষের হ্যাবিট্যাট যে কবেই পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে সে কথা আর কে বলে। মানুষের নিজের প্রতিই তার কোনো দরদ নেই। ভারী আশ্চর্যের কথা।

মৃদুল বলল।

তা যা বলেছেন। মানুষই এখন সবচেয়ে কম ইমপর্ট্যান্ট প্রাণী পণ্ডিতদের কাছে।

অবনী বলল।

আকাতরু বলল, রবিঠাকুরে ঠিকোই কইছিলেন। যারা সবকিছুই পণ্ড করে তারাই হইল গিয়া পণ্ডিত।

মানুষের মধ্যে আবার পুরুষ মানুষই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি নেগলেগটেড। কবে যে এই প্রজাতির পুংলিঙ্গ পুরোপুরি extinct হয়ে যাবে তা কে বলতে পারে। তাদের জন্যে কাঁদবার কেউই নেই। আর তাদের জন্যে কেঁদে পুরুষের দু চোখ দিয়ে ধারা বইছে অবিরত।

দ্যাখেন ম্যাডাম, ঐটা কি গান কন দেহি?

আমাকে ম্যাডাম বলবেন না।

ত! কি কম্ম? মানে, কী বইল্যা ডাকুম?

নাম ধরেই ডাকবেন। আমি কি আপনার পিসীমা, না শাশুড়ী?

নাম ধইর‍্যা ডাকুম?

হ্যাঁ।

আকাতরুর সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেল। ভাল করেই বুঝতে পারল যে এক একবার 'তটিনী' বলবে আর তার শরীর মনের ব্যাটারী একটু একটু করে ডিসচার্জ হতে থাকবে। ডায়নামোটা যে চারদিন আগে তটিনীর সঙ্গে প্রথমবার দর্শনেই গেছে! আকাতরুর রবিঠাকুরের সেই গানটা মনে পড়ে গেল।

"বিনা প্রয়োজনের ডাকে ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই পুরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে,

বলতে পারে এই সুখেতেই মায়ের নাম সে বলে
তোমার নাম বলব নানা ছলে।"

মনে মনে বলল, তটিনী! তটিনী! তটিনী!

অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল আকাতরু।

কী হলো আকাতরুবাবু, গাছ চেনাচ্ছেন না যে! জয়ন্তীতে পৌঁছে গেলে কি আর এত গাছ পাব? সে জায়গাটা কেমন?

দারুণ জায়গা।

অবনী বলল, কত গাছ চাই? সব গাছই পাবেন।

তারপর বলল, মনে হবে, যেন নদীর মধ্যেই রয়েছেন। চানঘরে যখন চান করবেন, যদি জানালা খুলে রাখেন, তা রাখতে কোনো বাধাও নেই, কারণ বাংলোটা অনেক উঁচু আর দিনের বেলাতে তো বাইরে থেকে কিছু দেখা যাবে না, তাহলে মনে হবে যেন নদীতেই চান করছেন। নদীর ওপারে ভুটানের দিকের পাহাড়। আকাশ প্রায় ঢেকে দিয়েছে। বাঁদিকে দূরে বাঁক নিয়ে একটি দ্বীপের সৃষ্টি করে হারিয়ে গেছে।

আহা! আর বলবেন না। নিজের চোখে দেখব।

নদী যেখানে বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে যায় মনে হয় না কি যে নদীর সব রহস্য সেখানেই আছে? সব ফুল, সব পাখি, তার গায়ের গন্ধ...

তটিনী বলল।

আকাতরু বলল, আপনের কথাগুলানও য্যান যাত্রার ডায়লগেরই মতন মিষ্টি। কী কইর‍্যা যে অমন কন আপনে, আপনেই জানেন।

তটিনী হেসে উঠল।

তটিনী হাসলে আকাতরুর বুকটা ভাললাগায় কেঁদে ওঠে। ভালবাসা যে ঠিক এইরকম বেদনাদায়ক কোনো হাড্ডি পিলপিলানো অসুখ, যে সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাই ছিল না! বড় কষ্ট। এ কেমন আনন্দ যার মধ্যে এমন কষ্ট থাকে?

ভাবছিল আকাতরু।

ঐ গাছটার নাম আকাশপ্রদীপ।

বাঃ। কী সুন্দর গাছ। আর আরও সুন্দর নাম।

হ্যাঁ। গাছটা অস্ট্রেলিয়ান।

তাই?

হ্যাঁ।

বটানিকাল নাম কি জানেন নাকি?

বটানিকাল নাম অ্যাকাসিয়া মানগিয়াম।

তটিনী বলল, রাঁচীতে একবার নাটক নিয়ে গেছিলাম। ওঁরা বেতলাতে নিয়ে গেছিলেন, পালামৌ ন্যাশনাল পার্ক-এ। বেতলার সবচেয়ে পুরনো বনবাংলোর কম্পাউন্ডে একটি অস্ট্রেলিয়ান ফুল গাছ দেখেছিলাম। দেখেছিলাম, ডি.এফ.ও. কাজমি সাহেব আর গেম-ওয়ার্ডেন সঙ্গম লাহিড়ী। ভারী সুন্দর। তবে গাছটা আকাশমণির মতন বড় নয়। মানে, আমি যখন দেখেছিলাম তখন বড় রাধাচূড়ার অথবা স্থলপদ্মর মতন ছিল। ফুলগুলো কাগজের ফুলের মতন দেখতে।

নাম কি? মনে আছে?

অবনী বলল।

দাঁড়ান দাঁড়ান। মনে করি। নামটাও ভারী সুন্দর। ফুল হয় মার্চ-এপ্রিলে। কাগজের ফুলের মতন। সাদা ফুল। হ্যাঁ মনে পড়েছে। গ্লিনিসিডিয়া সুপার্বা।

বাবাঃ। এ কোথায় এসে পড়লাম রে বাবা। কখন যে আমার পিতৃদেবের বটানিকাল নাম জিজ্ঞেস করে বসবেন আপনারা মশাই সেই ভয়ে আছি এখন। জঙ্গলে বেড়াতে এসে এমন বিপদে পড়ব আগে জানলে আসতাম না। কোথায় একটু নির্জনে তাস খেলব, মাল খাব শান্তিতে, তা নয় এ কী বিপদ রে বাবা!

অবনী ও আকাতরু এমনকি ভাড়াগাড়ির ড্রাইভার মদন পর্যন্ত হেসে উঠল মৃদুলের কথাতে। কিন্তু তটিনী হাসল না।

সে বলল, আশ্চর্য। অথচ আমাদের মধ্যে আপনিই সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এম.এ.।

বাংলায় এম.এ. পাসের সঙ্গে বাঁশ অথবা ঘেঁটুফুল চেনার কি সম্পর্ক?

আমরা কেউইতো এম.এ. পাস নই। আমি তো কলেজেই যাইনি। অবনীবাবু ও আকাবাবুর কথা জানি না। কিন্তু জানবার ইচ্ছার সঙ্গে ডিগ্রীর তো কিছুমাত্র সম্পর্ক আছে বলে বুঝতে পারি না। যদিও থাকা উচিত ছিল। কথাতেই বলে 'The purpose of a University is to bring the horse near the water and to make it thirsty'। জ্ঞানের আসল স্পৃহা তো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকানো কাগজটি হাতে পাবার পরেই জাগবার কথা। তাই নয় কি? সব মানুষের সব ডিগ্রীই তো পাকানো কাগজই মাত্র। শিক্ষা তো মানুষ তার কথাবার্তা, তার ব্যবহারেই, তার চলায়-বলায়, তার জ্ঞান-পিপাসার মধ্যেই বয়ে বেড়ায়। প্রকৃত শিক্ষাতে আর ডিগ্রীতে তো কোনোদিনই কোনো মিল ছিল না।

তুমি বলতে চাইছ সাযুজ্য? শব্দটা সাযুজ্যই কি?

হ্যাঁ। আমি তো ভাল বাংলা জানি না।

তটিনী বলল।

ইংরেজি আর ফ্রেঞ্চটা বুঝি বাংলার চেয়েও ভাল জানো?

মৃদুল বলল।

তটিনী অপমানিত হয়ে বলল, আমি যাত্রাদলের অশিক্ষিত নায়িকা—বাংলাটাই ভাল করে জানি না আর ওসব তো! তাছাড়া আমি তো মৃদুলবাবু আপনার এবং অনেক তাবড় তাবড় বুদ্ধিজীবীদের মতন হেলিকপ্টার থেকে গড়িয়াহাটের মোড়ে পড়িনি। মেদিনীপুরের গ্রাম থেকে, অতি সাধারণ, প্রায় লজ্জাকর অতীত থেকে এতখানি ধুলো-ময়লা মাড়িয়ে হেঁটে এসেছি অনেক কষ্ট করে।

জানি। ধুলো-ময়লা মাড়ায় অনেকেই কিন্তু মন্দিরে ঢোকার আগে যে জুতো পরে তা মাড়িয়ে এল, তা খুলে রাখে বাইরে। শোবার ঘরে বা মন্দিরে জুতো পায়ে ঢোকার দরকারই বা কি? আমি তো তোমার অতীত সম্বন্ধে কিছু জানি। একেবারেই জানি না তা তো নয়!

মৃদুল বলল।

কি জানেন?

তোমার অতীতের সব কথা জানি না। কিছু অবশ্যই জানি। তোমার বর্তমানটাও কি খুব একটা গৌরবের?

তটিনী দাঁত চেপে বলল, তাই বা বলি কি করে। আপনি যখন স্টেজে আমার নায়ক, বর্তমানটাও যে গর্ব করার মতন কিছু তাই বা বলি কি করে! আমার মতন অনেকেই আছেন যাঁরা সমস্ত জীবনেই গর্বিত হবার মতন কিছু করতে পারেন না। কী করা যাবে। তাদের সবকিছুকেই মানিয়ে নিতে হয়।

আকাতরু মনে মনে খুব রেগে গেল মৃদুলের উপরে। মানুষটা একটা বাজে মানুষ এবং শ্রদ্ধা বাড়ল তটিনীর উপরে।

তটিনী বলল, এই সমাজে যে মেয়ে একা থাকে, একা কাজ করে, যার সংসার নেই সে সবসময়েই খারাপ, সমালোচনার পাত্রী। আর পুরুষ মাত্রই দেবতা, সে একাই থাকুক কী সংসারীই হোক।

তুমি কি ধোওয়া-তুলসী পাতার কথা বলছ? তুমি...

আমি তুলসী পাতার পবিত্রতা কোথায় পাব? তুলসীই নই! তার ধোওয়া আর অধোওয়া!

অবনী প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলল, কি রে আকা, গাছ চেনাবার কি হলো?

গাছ চিনাইতে যাইয়াই ত এমন বিপত্তি। দেখতাছি যে, মানুষ চিনোনের

চাইয়া গাছ চিনোন অনেকেই সোজা।

মৃদুল বুঝল কথাটা আকাতরু তাকে উদ্দেশ করেই বলেছে। কিন্তু এই ষাঁড়ের মতন মানুষটাকে না ঘাঁটানোই মনস্থ করল। মৃদুলকে সে জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। আর বাঙালের রাগ বলে কথা!

ওটা কি পাখি?

তটিনী হঠাৎ বলল, বাঁ দিকের জঙ্গলের মধ্যে ঝুঁটিওয়ালা একটা বাদামী আর সাদা পাখিকে দেখিয়ে।

অবনী বলল, ওটা হুপি।

আর ঐগুলো?

ওগুলো ছাতারে। ইংরেজি নাম BABBLER। সবসময় মানুষের মতনই কলকলিয়ে কথা বলে।

অবনী বলল।

BABBLER না THRASHER?

আকাতরু বলল।

THRASHER বুঝি? তা হবে।

মানুষই কি সবচেয়ে বেশি কথা বলে? সব প্রাণীদের মধ্যে?

তটিনী শুধোল।

নট্ আনলাইকলি।

অবনী বলল।

৫

জয়ন্তীতে পৌঁছে তটিনী অভিভূত হয়ে গেছিল একেবারে। তবে ভয়ও যে পায়নি তাও নয়। সন্ধ্যেবেলা গা ধোবার সময়ে হটাৎ জানালার কাচে একটা বড় অথচ দৈর্ঘ্যে কম সরীসৃপের ছায়া দেখে ভয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল। ঘরে ঢুকে জামাকাপড় পরে বাইরে বেরিয়েই আকাতরুকে বলেছিল, ভীষণই ভয় পেয়ে গেছিলাম। বাথরুমে, খাবার ঘর দিয়ে গিয়ে দেখুন কী একটা জিনিস বাথরুমের জানালার কাচের বাইরে সেঁটে আছে। ভয়ে হার্টফেলই করে গেছিলাম বলতে গেলে।

আকাতরু দেখে এসে হাসল, বলল, জিনিসটা কি তা আপনি চিনেন তবে এত বড় হয়তো আগে দেখেন নাই কুখনও।

কি?

তটিনী বলল।

তক্ষক।

তক্ষক? সে তো অনেকই দেখেছি পেঁপে গাছে, অন্যান্য গাছে। ঠিক! ঠিক! ঠিক! করে ডাকে।

ওগুলো ছোট প্রজাতির। তারপরেই বলল, একটু চুপ কইর‍্যা থাহেন। শুনতে পাইবেন আনে ওদের ডাক। নদীর ওপরে থিক্যা ডাকলে এপার থিক্যা শুনতে পাইবেন। ডাকবআনে টাকটু-উ-উ! টাকটু-উ-উ কইর‍্যা। ডাকোনের আগে

আবার একটু গলা খাঁকড়াইয়া লয়। বড় বড় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পণ্ডিতেরা বোধহয় মইর‍্যা তক্ষক হন।

ওদের ইংরেজি নাম কি?

GECKO। অন্য নাম Tucktoo। ঐ টাকটু-উ-উ বলে ডাকে বলেই।

হাসল তটিনী।

আকাতরু যেন অবশ হয়ে গেছে। চান-করে-ওঠা তটিনীর গায়ের সাবান আর পারফুমের গন্ধ, বনের গন্ধ, নদীর গন্ধ, ওই চাঁদনী রাতের গন্ধ সব মিলেমিশে আকাতরুর জীবনের সব স্বপ্ন যেন সত্যি হয়ে মর্তে নেমে এসেছে। আর ওপরের পাহাড় থেকে গেকো ডাকছে টাকটু-উ-উ আর এপার থেকে দোসর সাড়া দিচ্ছে টাকটু-উ। পাহাড়ের কণ্ঠার কাছে দাবানল জ্বলছে। আগুনটা সোনালি চিতার মতন একবার এদিক আরেকবার ওদিক করে নিচে নামার চেষ্টা করছে যেন। আগুনের মালা গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। গাঁথছে কেউ। এখনও অসম্পূর্ণ আছে। মালা গাঁথা শেষ হয়নি। তটিনী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছে সেদিকে।

আকাতরুর কথা শেষ হতে না হতেই জয়ন্তীর বন বাংলোর ছাদের নিচে ফলস-সিলিং-এর মধ্যে থেকেই একটা ডেকে উঠল টাকুট-উ-উ বলে আর অন্য একটা সাড়া দিল নদীর ওপার থেকে। নদীটা বাংলোর সামনে অনেকই চওড়া—চাঁদের আলোয় শঙ্খের মতন রঙে আর ওপারের কালো রোমশ কাছিম-পেঠা আকাশ-ছোঁওয়া পাহাড়ের পটভূমিতে আরো যেন সুন্দর দেখাচ্ছে। বাংলোর সামনে ঠিক নদীর উপরেই একটা বসার জায়গা। বাঁধানো। হাতার মধ্যে কয়েকটি শাল গাছ।

শাল ইখানের স্বাভাবিক গাছ নয়। বনবিভাগই লাগাইছেন।

আকাতরু বলল।

ওরা দুজনেই ছিল একা। মৃদুল অবনীকে নিয়ে গাড়ি নিয়ে রেঞ্জার বিমান বিশ্বাসের বাড়িতে গেছে আলাপ করতে। আসলে বোধহয় ভুটানী হুইস্কি কি করে পাওয়া যায় তারই তত্ত্বতালাস করতে।

আকাতরু বলল, বিশ্বাস সাহেবের মিসেস খুবই সুন্দরী।

তাই? আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

আমি একটা ফালতু লোক। আমার সঙ্গে আলাপ কারই বা আছে। আপনেই দয়া কইর‍্যা আমারে এত ইজ্জৎ দিয়া কথা কন। নইলে আমার কি আছে? না বিদ্যা, না বুদ্ধি, না টাকা, না রূপ। আমি ত একটা মাকনার চায়্যাও অধম।

মাকনা কি?

ওঃ তাও জানেন না? মাকনা হইল গিয়া পুরুষ হাতি কিন্তু যার দাঁতি নাই। তার আর দাম কি?

তবে দাম কোন হাতির?

দাঁতালের আর গণেশের। গণেশের আবার পূজাও করে অনেকে।

গণেশটা কি বস্তু?

ওঃ। যে পুরুষ হাতি এক দাঁত তারে কয় গণেশ।

তাই?

হুঃ।

আপনি কত্ত জানেন। সত্যি!

হুঃ। আপনার পায়ের নখেরও যগ্যি যদি হইতে পারতাম।

কী যে বলেন! আপনি মানুষটা খুব ভাল। আপনাকে আমার খুব ভাল লেগেছে আকাবাবু।

আকাতরুর হৃৎপিণ্ডটা বন্ধ হয়ে গেল যেন। ওর বুকের মধ্যে আকাশ বাতাস নদী পাহাড় চাঁদনী রাত সব যেন একসঙ্গে গান গেয়ে উঠল। জন্মের পর থেকে সে এত খুশি কোনোদিন হয়নি। ওর ইচ্ছে করল তটিনীর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ওর পায়ের পাতাতে চুমু খায় নিচু হয়ে।

কিন্তু কিছুই করতে পারল না।

শুধু মুখে বলল, আপনে কি যে কন। আপনারে আমার হৃদয়টা একখান লাল বারোমাইস্যা জবার মতন নিজে হাতে ছিঁইড়্যা দিতে পারি। কিন্তু আপনের তাতে কি প্রয়োজন।

তটিনী চুপ করে আকাতরুর মুখে চেয়ে রইল।

পুরুষ মানুষ সে অনেকই দেখেছে। অনেক পুরুষের সঙ্গে সে শুয়েছে। পুরুষ জাতটা সম্বন্ধে একমাত্র প্রাণধন খাঁ ছাড়া তার মনে শ্রদ্ধার কোনো আসন নেই। কিন্তু আকাতরুর মতন নিষ্পাপ, শিশুর মতন সরল, পবিত্র পুরুষ সে আগে দেখেনি কখনও। বড়ই আবিষ্ট হয়ে গেছে তটিনী। ওর মনে হচ্ছে নিজেই নষ্ট করে দেওয়া ওর কোনো ভ্রূণ যেন জীবন্ত হয়ে ওর প্রেমিক হয়ে আকাতরুর মাধ্যমে ওর কাছে এসেছে। ভ্রূণও প্রাণ। ভ্রূণহত্যাও পাপ। মেরী স্টোপস ক্লিনিকের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান লেডি ডাক্তার তাকে বলেছিল। কে জানে! হয়তো তাই!

আকাতরু বলল, আমি ম্যামসাহেবরে দেখিও নাই কুনোদিন। তবে শুনছি

যে, সুন্দরী। সুন্দরী বইল্যাই ত কারোরেই দেখান না ওয়াইফরে বিশ্বাস সাহেব। না দেখানোই ভাল।

কেন?

তটিনী বলল।

মৃদুলবাবুদের মতন মানুষদের ত এক্কেরেই বাইরে বাইরেই রাখন উচিত। অবনী যে কোন আক্কেলে তারে লইয়া গেল সিখানে কে জানে! মৃদুলবাবু হাইলি-এডুকিটেড হইতে পারেন, পার্টও দারুণ করেন কিন্তু মানুষডা ইক্কেরে থার্ড ক্লাস। আপনের সাথে এমন কইর‍্যা কথা কইতাছিল না, আমার মনে হইতাছিল দিই গলাডা টিইপ্যা ইক্কেরে শেষ কইর‍্যা।

তটিনী আতঙ্কিত গলায় বলল, না, না। অমন করতে যাবেন না। ওঁরা মানীগুণী লোক। এস.ডি.ও., এস.ডি.পি.ও., এস.পি., ডি.এম. সকলেই ওদের একনামে চেনেন। আপনিই সারা জীবন জেল খেটে মরবেন। আপনার কি ধারণা যে হাজার হাজার মানুষ আমাদের দেশের শয়ে শয়ে জেলে পচে মরছে, ঘানি ঘুরোচ্ছে, যাবজ্জীবন দীপান্তরে গেছে তারা সকলেই দোষী। বদমাইশ, চোর, ডাকাত, খুনে, রেপিস্টদের মধ্যে অধিকাংশই বাইরে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রর কমলাকান্তের দপ্তর পড়েননি আপনি? "আইন সে তো তামাশামাত্র বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।" ডেপুটি বঙ্কিম এ কথা বলেছিলেন পরাধীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। আজ বঙ্কিম এই পূর্ণ-স্বাধীন ভারতবর্ষে বেঁচে থাকলে কি বলতেন তা কে জানে! জানেন আকাতরু। বড় লজ্জা হয় ভাবলে। না, না আপনি ওরকম কিছু করার কথা ভাববেন না। কখনও না।

তটিনী ভাবছিল, এ জীবনে অনেকই ছদ্ম-ভালোবাসা পেয়েছে অসংখ্য পুরুষের। কিন্তু আকাতরুর মতন কোনো একশ ভাগ সৎ, একশ ভাগ পবিত্র, একশ ভাগ নারীসঙ্গর অভিজ্ঞতাহীন পুরুষ তাকে এমন শুদ্ধ, সুন্দর ভালবাসা বাসেনি। তার উপরে জয়ন্তীর এই পরিবেশ। মাথার উপরে এক জোড়া কাঠগোলাপের গাছ। বিস্তৃত চওড়া নদীরেখা। চাঁদের আলোতে মোহময়, রহস্যাবৃত। দূরের বাঁকে হারিয়ে গেছে নদী, বিপরীতের কাছিম-পেঠা আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়। তার কণ্ঠার কাছে দাবানলের আলোর মালা। লাল। রাতের বাঘের চোখের মতন লাল। ও ভাবল যে এমন পরিবেশে, এমন শুদ্ধ পবিত্র একজন মানুষের অস্ফুট প্রার্থনা, অশুচি, বহুভোগ্যা তটিনী মঞ্জুর করে নিজেই ধন্য হবে।

পরক্ষণেই হাসি পেল তটিনীর।

ভাবল, এই মহীরুহর মতন পুরুষটা এতটাই ছেলেমানুষ যে, সে যদি তাকে এই মুহূর্তে বলে যে তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই, তবে এই নিষ্পাপ অনভিজ্ঞ শিশুটি হয়তো তার পায়ের একপাটি চটি, তটিনীর সাদা-রঙা স্পিৎজ কুকুর জিম-এরই মতন, তুলে নিয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তার চাহিদা যে কি, একজন পূর্ণযুবতী নারী তাকে যে কি দিতে পারে, সে সম্বন্ধেও তার হয়তো কোনোই স্পষ্ট ধারণা নেই। এই দেবশিশুর ভালবাসা সে কোথায় রাখবে, কী করে তার দাম দেবে, ভেবেই পেল না তটিনী।

পরমুহূর্তেই ভাবল, একমাত্র আকাতরুর মতন অকলুষিত, নিষ্পাপ, গ্রাম্য প্রবল পুরুষ আর তার জার্মান স্পিৎজ জিম-এর মতন মদ্দা কুকুরই একজন নারীকে প্রকৃত নিঃস্বার্থ ভালবাসা দিতে পারে। নইলে, তটিনীর দেখা পুরুষ প্রজাতির অধিকাংশই শুয়োর। শুয়োর যে, তা তো সমারসেট মম বহুদিন আগেই তার "RAIN" গল্পেই বলে গেছেন। "All men are pigs"!

আকাতরু বলল, আমি আজ আত্মহত্যা করুম।

আত্মহত্যা?

চমকে উঠে আতঙ্কিত গলাতে বলল তটিনী।

তারপর বলল, কেন?

সে আপনে বোঝবেন না।

আমার কোনো অপরাধ হয়েছে কি?

হ্যাঁ। হইছেই ত!

কি?

আপনে আমারে মানুষের মর্যাদা দিছেন।

এটা কি অপরাধ?

হ! হ! হ! আপনের আগে আমারে সবাই Exploit-ই করছে। আমারে কেউই মানুষ বইল্যা ভাবে নাই।

কেন? আপনার বন্ধু অবনী? তিনি তো আপনাকে ভালোবাসেন খুব।

আমি মাইয়াদের কথা কইতাছি।

ও। তটিনী বলল।

তারপর স্তম্ভিত, দুঃখিত হয়ে তটিনী বলল, আপনি আমার পাশে এসে বসুন তো একটু।

আকাতরু পাশে না বসে তটিনীর পায়ের কাছে বসল।

তটিনী আকাতরুর মাথার কেয়াবনের মতো ঠাসবুনোন এবং ফিঙের মতন

কালো চুলগুলো নিজের ডান হাতে নেড়ে চেড়ে এলোমেলো করে দিয়ে ওর মাথার তালুতে একটা চুমু খেল। যে ঠোঁট দিয়ে সে অনেক অসৎ, দুষ্ট, অপবিত্র পুরুষের সর্বাঙ্গে চুমু খেয়েছে, সেই ঠোঁট দিয়ে।

তটিনীর মনে হলো আকাতরুর মাথাটাকেই অপবিত্র করে দিল যেন সে।

আকাতরু আনন্দে শিউরে উঠল। আর তটিনী লজ্জায়।

এমন সময়ে জয়ন্তীর বন-বাংলোর হাতাতে একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি এসে ঢুকল। একজন নেমে গেটটা খুলল। গাড়িটা হেড লাইট জ্বেলে গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে রইল। আলোর বন্যাতে জঙ্গল পাহাড় আর নদীর অনুষঙ্গের জ্যোৎস্না রাতের মোহময়তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তার উপরে গাড়ির এঞ্জিনের আওয়াজ। গাড়িটার সাইলেন্সার পাইপটা ফুটো হয়ে গেছে। তাতে এঞ্জিনের আওয়াজের সঙ্গে গাঁক গাঁক আওয়াজ যোগ হয়েছে। হেড লাইট জ্বালা থাকায় ওদের দুজনের চোখ ধেঁধে গেছিল। দেখতে পাচ্ছিল না কিছুই। গাড়িটা ভেতরে ঢুকে ওদের কাছে চলে এল। যে লোকটি গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলেছিল সে রোগা মতো। চেহারাটা বড়লোকের মোসাহেবের মতন। গাড়ি থেকে চারজন লোক নামল। সেই প্রথম লোকটিকে নিয়ে। ড্রাইভার গাড়িতেই বসে রইল।

কে যেন বলল, এই তো পাখি এখানে।

আকাতরু চিনতে পারল একজনকে। চানু রায়। আলিপুরদুয়ারের কুখ্যাত বড়লোক। নামী মাতাল। নানারকম ব্যবসা তার। লোকে বলে জঙ্গলের চেরাই কাঠেরও ব্যবসা আছে। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ির কাঠ-চেরাই কল-এ সরাসরি ট্রাক-ট্রাক কাঠ চালান যায়। বনবিভাগের কোনো কোনো আমলার সঙ্গেও তার আঁতাত আছে বলে মনে হয়, নইলে অত কাঠ বের করে কি করে! মানুষটাকে দু চোখে দেখতে পারে না আকাতরু। তবে বড়লোক এবং ক্ষমতাবান বলে এড়িয়ে চলে।

চানু রায় এগিয়ে এসে বলল, অবনী নেই?

আকাতরু বলল, না। রেঞ্জার সাহেবের কাছে বাংলোয় গেছেন গিয়া।

তাই?

তারপরই বলল, নমস্কার তটিনী দেবী। আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

আমার সঙ্গে?

তটিনী উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

তারপর বলল, আপনাকে তো আমি চিনি না।

কে আর কাকে চেনে বলুন? চিনতে আর কতক্ষণ লাগে? যদি চেনার ইচ্ছা

থাকে। চা বাগানে আজ আমরা একটু আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করেছি। আপনাকে তাই নিতে এলাম। যদি গান করেন একটু। রাতে গেস্ট-হাঁউসেই থাকার বন্দোবস্তও করা হয়েছে। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। আর সম্মানী দেব আমরা দশ হাজার। কাল সকাল আটটার মধ্যে এখানে ফেরৎ দিয়ে যাব আবার।

দশ হাজার?

টাকার অঙ্কটা শুনে আকার মাথা ঘুরে গেল।

তটিনী বলল, আপনার বোধহয় মাথা খারাপ হয়েছে। চিনি না শুনি না আপনি কি ভাবে এমন প্রস্তাব করেন? তা ছাড়া আমি এদিকে বেড়াতে এসেছি। মৃদুলবাবুও এসেছেন?

কে মৃদুলবাবু?

হলুদ গোলাপ-এর নায়ক, মৃদুল দাস।

অ। তাতে কি? ওঁর তো আপত্তি নেই কোনো।

উনিও যাবেন? মানে যাবেন বলে বলেছেন আপনাকে?

না, না উনি গিয়ে কি করবেন। ওঁর সঙ্গে আমার আলিপুরদুয়ারেই কথা হয়েছে। বলেছিলেন দশ হাজার অফার করলেই আপনি রাজী হয়ে যাবেন।

তটিনী প্রচণ্ড রেগে গেল।

বলল, আমি তো মৃদুলবাবুর স্ত্রীও নই, বোনও নই। আমার উপরে তাঁর কোন অধিকার যে উনি আমার সম্বন্ধে বে-এক্তিয়ারে এমন কথা বলেন?

তা তো আমি জানি না তটিনী দেবী।

অবনীবাবুও কি আপনাকে কিছু বলেছিলেন এ ব্যাপারে?

তটিনী বলল।

না। অবনী তো লোকাল ছেলে। সে কি করে আপনার সম্পর্কে আমার সঙ্গে কথা বলবে।

তারপর আকাতরুর দিকে ফিরে, চানু রায় বলল, আপনিও তো লোকাল। কলেজ পাড়াতে বাড়ি নয় আপনার?

হ।

আকা বলল।

আপনি এখানে কি করছেন?

আমি ওঁর বডিগার্ড।

চানু রায় হো হো করে হেসে উঠল।

বলল, বডিগার্ড! ব্ল্যাক-ক্যাট কমান্ডো। বাবাঃ। তটিনী দেবী যে সঙ্গে

বডিগার্ড নিয়ে ঘোরেন তা তো জানা ছিল না। সঙ্গে কি সেল্ফ-লোডিং রাইফেল টাইফেল আছে না কি? এ.কে-ফর্টি সেভেন? চাইনিজ?

আকা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে বলল, না। সেসব তো থাকে স্মাগলারদেরই। যারা কাঠ ও সোনার বিস্কিট-এর স্মাগলিং করে নানা ব্যবসার ছুতার আড়ালে। আমার হাত দুইখানই যথেষ্ট।

চানু রায় খোঁচাটা নীরবে হজম করল।

তারপর বলল, বাবাঃ আপনি অনেকই খবর রাখেন দেখছি।

আপনার সম্বন্ধে রাখি না তবে স্মাগলারদের মোডাস-অপারেন্ডির খবর কিছু কিছু রাখি। ডি.আই.জি. সাহেবের লগেও আলাপ আছে। একসঙ্গে ফুটবল খ্যালতাম আমরা।

চানু রায়ের মুখটা কালো হয়ে গেল। চক্রবর্তী সাহেব?

হ।

খুব অনেস্ট অফিসার।

হ। একশৃঙ্গ গণ্ডার আর অনেস্ট পুলিশ অফিসার ত কেরমেই একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠতাছে।

তাহলে আপনি যাবেন না আমাদের সঙ্গে তটিনী দেবী? আমি ফালতু লোক নই। আমার নাম চানু রায়। বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায় এখানে আমার নামে। আপনার বডিগার্ডকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন। অবনী এবং এই ভদ্রলোকও মানে, আপনার বডিগার্ডও আমাকে চেনেন। আপনার নামটা যেন কি?

আকাতরু রায়।

তাই বলুন। তা নইলে দুধে লালির সঙ্গে এত ভাব।

মুখ সামলাইয়া কথা কইয়েন য্যান চানু বাবু। আপনের নামে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল ক্যান খায় তা আমি জানি। কিন্তু ইখানে গরুর কারবার নাই। খালিই বাঘ।

তাই?

হ। তাই।

তাহলে আপনি যাবেনই না তটিনী দেবী?

কী করে বলেন আপনি যাওয়ার কথা ভেবে পাই না আমি।

এমন সময়ে ওদের মারুতি ভ্যানটা ফিরে এল। মৃদুল আর অবনী নামল।

এই যে অবনী!

অবনী চানু রায়কে দেখে অবাক হয়ে গেল।

বলল, আপনি চানুবাবু? এখানে।

অবাক হলে নাকি? যেখানে মধু সেখানেই মৌমাছি। আমি যে কখন কোথায় থাকি, বিশেষ করে উইক-এন্ডে তা কি আমি নিজেই জানি?

মৃদুল তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সিগারেট-এর প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল। দেখে মনে হলো সে যেন বেশ নার্ভাস।

চানু রায় বলল, এই যে হিরো। কেসটা কি হলো? আমি এদিকে বাগানে সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। ইয়ার-দোস্তরা সব বসে আছে। আর একি শুনি মন্থরার মুখে? পীপিং থেকে আপনার জন্যে আমার এক শাগরেদ আপনার জন্যে ভুটান মিস্ট হুইস্কিও যোগাড় করেছে।

পীপিং? সে তো চায়নাতে।

মৃদুল, বলার মতন কিছু খুঁজে পেয়ে, স্বস্তি পেয়ে যেন বলল।

দূর মশাই। পীপিং কি চায়নাতে কেনা নাকি। ভুটানেও পীপিং আছে। ভুটানঘাট থেকে এগিয়ে গেলেই পীপিং। ভুটানের গিরিখাদ থেকে বেরিয়ে ওয়াঞ্চু নদী যেখানে এসে রায়ডাক হয়ে সমতলে ছড়িয়ে গেছে।

তাই?

মৃদুল বলল।

সেকথার উত্তর না দিয়ে চানু রায় বলল, এখন কি হবে মৃদুলবাবু?

কিসের কি?

আপনার হিরোইন যদি আমাদের সঙ্গে না যায় তবে তো আপনাকেই আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। ফাসখাওয়া অথবা জয়ন্তী নদীর শুকনো বুকের উপরে কাল সকালে যদি আপনার উলঙ্গ ডেডবডি পাওয়া যায় তবে আমাকে দোষ দেবেন কি?

মৃদুল বলল, কি হলো কি? আপনি এসব কি বলছেন?

কী বলছি তা বুঝতে পারছেন না?

অবনী তাড়াতাড়ি মাঝে পড়ে বলল, চানুদা আপনি একটু ওদিকে চলুন তো! ব্যাপারটা কি বুঝি।

ব্যাপার বোঝার জন্যে ওদিকে যাবার দরকার কি অবনী? তোমাদের হিরো আমার কাছ থেকে পরশু শোয়ের শেষে পাঁচশ টাকার নতুন নোট নিয়েছেন দশখানি। দালালি। তোমাদের হিরোইনকে এক রাতের জন্যে ঠিক করে দেবেন বলে। রেট নাকি দশ। বলেই পাঞ্জাবির ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা খাম বের করল। বলল, এতে কুড়িখানি বড় পাত্তি আছে। একেবারে টাঁকশালের

গন্ধমাখা। এমন নেশাধরানো গন্ধ কোনো মেয়েছেলের শরীরেও নেই।

সাবধান। আপনেরে আমি সাবধান কইর‍্যা দিতাছি।

বলেই আকা চানু রায়ের দিকে এগিয়ে গেল।

সেই মোসাহেব গাড়ির দিকে ফিরে গিয়ে হাতে করে কি একটা নিয়ে ফিরে এল। তটিনীর মনে হলো রিভলভার-টিভালবার হবে হয়তো।

তটিনী আকার হাত ধরল পেছন থেকে এসে।

চানু রায় বলল, এই পালাটার নাম কি অবনী?

কোন পালা?

এই এখন আকাতরু রায় আর তটিনী দেবী যে পালাটি চালু করলেন।

মোসাহেব প্যাকেটটা মৃদুলের হাতে দিয়ে বলল, ভুটান মিস্ট-এর বোতলটা। যেমন কথা ছিল।

চানু রায় বলল, কথা আর কিছু নেই। ফেরৎ নিয়ে যা গদাই বোতলটা। শালা বেইমানকে আর হুইস্কি খাওয়াতে হবে না।

গোলমাল শুনে ভিতর থেকে বাংলোর চৌকিদার অজয় ছেত্রী বার্বুচিখানা থেকে দৌড়ে এল ফিনফিনে জাল লাগানো স্প্রিং-এর দরজা ঠেলে। বলল, কী হইছে স্যার? রেঞ্জার সাহেবরে কি খবর দিমু?

বলেই বলল, নমস্কার চানুবাবু।

চানুবাবু একটি লাল পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে অজয়কে দিয়ে বললেন ভাল খবর তো সব অজয়?

হ্যাঁ স্যার।

নোটটা নিয়ে সেলাম করে অবস্থাটা যে মনোরম নয় তা আন্দাজ করেই অজয় ভিতরে চলে গেল। যাওয়ার আগে একবার দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আপনেরা কেউ কি জল খাইবেন স্যার?

না অজয়। জল খাব না। তবে এক গ্লাস আমাকে দিতে পার। মাথায় দেব। মাথা গরম হয়ে গেছে।

এর পরই চানু রায় সেই গদাই নামক মোসাহেবকে বলল, গদাই, মালটা ফেরৎ নিয়ে নে হিরোর কাছ থেকে। হিরো! কালচার্ড মানুষ। কথায় কথায় ইংরেজি ফোটায়। কবিতার আবৃত্তিকার। রোজ খবরের কাগজে নাম বেরোয়, প্রশংসা বেরোয় এই সব মানুষদের। ছবি বেরোয়। ছিঃ। কাগজ রাখাই বন্ধ করে দেব। শুধু যাত্রার বিজ্ঞাপন আর এই সব হিরোদের হিরোসিমা।

ঐ প্রচণ্ড অস্বস্তিকর অবস্থাতেও হাসি পেল অবনীর চানু রায়ের সেন্স অফ

হিউমার লক্ষ্য করে।

গদাই বলল, মৃদুলকে, টাকাটা ছাড়ুন হিরো। যাত্রা করে ত অনেকই টাকা পান তার উপরেও মেয়ের দালালি করে রোজগার কি না করলেই নয়? তাও যদি মাল কন্ট্রোলে থাকত।

মৃদুলের মুখ ছাই-এর মতন সাদা হয়ে গেছিল।

বলল, নিয়ে আসছি। স্যুটকেস-এ আছে।

যেতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়ে একবার আকাতরুর দিকে তাকাল ও। দেখল আকাতরু সত্যিই বাঘের মতন লাল চোখ করে তাকিয়ে আছে মৃদুলের দিকে। অবনী, তটিনী, এমনকি চানু রায়ও বুঝতে পারল যে চানু রায় অ্যান্ড কোং চলে গেলেই আকাতরু মৃদুলকে আজ মেরেই ফেলবে।

মৃদুল বলল, চানুবাবু, আপনারা যেখানে যাচ্ছেন আজ রাতটা আমাকেও সেখানে নিয়ে যাবেন? তারপর আপনাদের সঙ্গেই ফিরে যাব আলিপুরদুয়ারে।

তারপর?

চানু রায় বলল। তারপর কি করবেন?

কলকাতায় যাব।

অবনী বলল, এখান থেকে জলপাইগুড়ি যাবার কথা যে আপনাদের। তাঁরা তো নিতে আসবেন পরশু। আপনাদের পুরো ইউনিটও কাল রাতেই বাস ভর্তি করে ফিরে আসবেন কুচবিহার থেকে যে!

আমি যাব না জলপাইগুড়ি।

মেরে তক্তা করে দেবে। হাবু ঘোষকে তো চেনেন না।

সে ভেবে দেখব। আজকে নিয়ে যাবেন আমাকে?

ভিখিরীর মতন ভিক্ষা চাইল মৃদুল চানু রায়ের কাছে।

চানু রায় বলল, চলুন। হিরো বলে ব্যাপার। গেলেই দেখবেন চানু রায় এক তটিনীর ভরসাতে বাঁচে না। ডিমা, নোনাই, কালজানি, জয়ন্তী, ডিমা, রায়ডাক নদীর দেশে অভাব নেই কোনো। কলকাতার হিরোইন না হলেও চলে যাবে। আমাদের মোদেশিয়া, নেপালি, ডুবকা, টোটো, রাভা, মেচিয়া, বাঙালিদের মধ্যে কি সুন্দরী নেই না কি? না, তারা নাচ গান জানে না?

থার্ড ক্লাস যত্ত।

বলেই, দু হাত জড়ো করে তটিনীর কাছে ক্ষমা চাইল চানু রায়। বলল, তটিনী দেবী, বুঝতেই পারছেন, দোষটা আমার নয়। আমি খারাপ তা সকলেই যেমন জানে, তেমন আমি নিজেও জানি। সপ্তাহে ছ দিন হাজার ঝামেলাতে কাটে। বউ, পূজা আচ্চা আর তার হা-ভাতে বাপের বাড়ির কল্যাণেই লেগে থাকে।

আর সে গুষ্টি তো নয়, রাবণের গুষ্টি। আমার নিজের প্রয়োজনে আমি বরবাদ হইনি। হয়েছি ঐ হারামজাদা গুষ্ঠির জন্যে। আমার উপরে বিয়ের পরদিন থেকে তারা বডি ফেলে দিয়েছে। শ্বশুরবাড়ি মানুষের কত আদর-যত্ন-সম্মানের-ভালোবাসার বাড়ি। আর আজ ঘেন্না ছাড়া তাদের প্রতি কিছুমাত্রও নেই! এইটুকুই আমার আনন্দ ম্যাডাম।

এক একজন মানুষ একেকরকম করে খুশি হয়। তার খুশি অন্যকে দুখী না করলেই হলো। আমি খারাপ হতে পারি কিন্তু আমি ভণ্ড নই আপনার হিরোর মতন। এই সব মানুষকেই সমাজ শিক্ষিত বলে মানে। দূরদর্শনে এদের মুখই দেখতে হয় আমাদের প্রতি সপ্তাহে একবার করে। এরাই নানা পুরস্কার পায়, পুরস্কার পাইয়ে দেয় অন্যকে। এই বঙ্গভূমের এই কালচার্ড খচ্চরদের মতন এমন হাড়ে হারামজাদা খচ্চর আর বোধহয় হয় না।

এমন সময়ে মৃদুল বেরিয়ে এল হাতে ব্যাগ নিয়ে। তটিনীর মুখের দিকে তাকাল না। তাকাতে পারল না। আকাতরুর মুখের দিকেও নয়। অবনীর দিকে একটি চোরা চাউনি দিয়ে বলল, চললাম।

চানু রায় তটিনীকে আবারও নমস্কার করে বলল, ক্ষমা কি পেলাম?

তটিনী বলল, সত্যিই তো! দোষ তো আপনার নয়!

চানু রায় আকাতরুকে বলল, আচ্ছা ব্ল্যাক ক্যাট। চললাম। ভায়া—মেজাজটা বড় গরম। আসলে মানুষটা তুমি বড় সোজা। যে জগতটাকে মৃদুল সেন আর চানু রায়রা কন্ট্রোল করছে সেই জগতে সটান সোজা আকাতরু গাছ হয়ে যদি কেউ বাঁচতে চায় তবে তার মরার দিনই এগিয়ে আসবে। দেখেশুনে পথ চলো ভাই। আগে তো নিজের প্রাণটা। নেহরুদের তিন জেনারেশান দেশটার যে অবস্থা করে রেখে গেছে এখানে মানুষের মতন বাঁচার চেষ্টা করার মতন মূর্খামি আর নেই। হয় কুকুর-বিড়ালের মতন বাঁচো নয় সাপের মতন বাঁচো। Like snakes in the grass। এই বক্সাতে বিস্ট সাহেবের বাঘ বাঁচাবার, বাঘ বাড়াবার চেষ্টা করলে হবে কি বাঘ-ফাঘ-এর দিন শেষ হয়ে গেছে এই দেশে। খল, ধূর্ত শেয়াল হও, সুখে থাকবে। বেঁচে থাকবে।

গাড়ির দরজা খুলে উঠতে উঠতে বলল, আকাতরুভাই তোমাকে এই আমার ফ্রেন্ডলি অ্যাডভাইস। আমাদের বাড়িও আগে আলিপুরদুয়ারের কলেজ পাড়াতেই ছিল। তুমি আমার পুরনো পাড়ার লোক বলেই এত কথা বললাম। চলি। গুড নাইট।

৬

গাড়িটা হেডলাইট জ্বেলে চলে যেতেই আবার চাঁদের আলো স্পষ্ট হলো। নদীর সাদা বালি আর পাথরের বুকের উপরে কী একটা পাখি ভুতুড়ে ডাক ডেকে ফিরছে চমকে চমকে। সেই ডাক তটিনীর বুকের ভিতরটা পর্যন্ত চমকে দিচ্ছে। পাখিটা বলছে, ডিড উ্যা ডু ইট? ডিড উ্যা ডু ইট? ডিড উ্যা ডু ইট?

পাহাড়ের উপরে দাবানল আরও ছড়িয়ে গেছে। আলোর মালা ফুটে উঠেছে। কার গলাতে উঠবে সে মালা কে জানে!

উঠবে হয়তো কোনো অনাঘ্রাত সতী কুমারীর গলাতে। উলু দেওয়া হবে, শাঁখ বাজবে, আতর-জল ছড়াবে আর লাল গোলাপ দেবে ছোট মেয়েরা। কবিতা ছাপা হবে দীদার, দাদুর। ঠাকুর্দা, ঠাম্মার। বর আসবে টোপর মাথায় দিয়ে ফুল সাজানো গাড়িতে।

নদীর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তটিনীর দুটি চোখ জলে ভরে এল।

অবনী বলল, আমি চান করে শুয়ে পড়ছি রে আকা। আমার একদম খিদে নেই। তুই কিন্তু তটিনী দেবীকে দেখাশোনা করিস। উনি আমাদের অতিথি। আলিপুরদুয়ারের সকলেরই অতিথি। অনেক অপমান অসম্মান করেছি ওঁকে আমরা। তোর উপরে ভার দিলাম যদি ক্ষতে সামান্য প্রলেপও দিতে পারিস।

আকাতরু অথবা তটিনী কেউই অবনীর কথার কোনো উত্তর দিল না। কিছু কিছু কথা থাকে, যে সব কথার উত্তর হয় না। কিছু কিছু মুহূর্ত থাকে, যখন

কোনো কথা না বললেই সব বলা হয়।

নদীর ওপারে পাহাড় থেকে গেকো ডাকল টাকটু-উ-উ। এপার থেকে তার দোসর সাড়া দিল টাকটু-উ-উ। তক্ষক যে তক্ষক, তারও প্রেমিক আছে। স্বার্থহীন, সৎ, ভাল প্রেমিক। অবশ্য তক্ষকের প্রেমিকাও ভাল। সে নিশ্চয়ই সতী।

আকাতরু বলল, ফির‍্যা যাই আমি আলিপুরদুয়ারে। ঐ মৃদুল দাসের মুখের জিওগ্রাফি আমি যদি না পাল্টাইয়া দিই ত আমার বাবা-মায়ের বড়-মায়ের দেওয়া নামডাই আমি বদলাইয়া ফেলাইম্যু। দেইখ্যেন আনে!

তটিনীর দু চোখের জল গড়িয়েই যেতে লাগল দু গাল বেয়ে। গাল থেকে বুক বেয়ে এসে ব্লাউজ ভিজিয়ে দিল।

তটিনী বলল, দোষ তো ওদের কারোই নয়।

ক্যান? নয় ক্যান?

আমিই যে খারাপ, খারাপ, খারাপ।

আমারে ভগবান যদি স্বয়ং আইস্যা এই কথা কয় তবেও আমি বিশ্বাস করুম না। আপনে খারাপ হইতেই পারেন না। পিরথিবীর যা-কিছু ভাল সেই সব ভালর প্রতিনিধি আপনে।

হাতের ইশারায় ডাকল তটিনী আকাতরুকে কাছে। তারপর তার সামনে সিমেন্ট-বাঁধানো বসার জায়গাতে বসতে বলল।

আকাতরু তার সামনে গিয়ে বসল। তটিনী তার নিজের হাত দুটি দিয়ে সারল্য, ভালত্ব আর পবিত্রতার প্রতিমূর্তি আকাতরুর দুটি গাল স্পর্শ করল, বড় আদরে, বড় যতনে।

আকাতরু কাছে আসাতে বুঝতে পারল যে তটিনী কাঁদছে অনেকক্ষণ হলো।

আকাতরু বলল, ম্যাডাম, আপনের দুই পায়ে পড়ি। আমার সামনে আপনে কাইন্দেন না, কোনওদিনও কাইন্দেন না। আমার পরানডা ভাইঙ্গা যায়। প্লিজ! প্লিজ! প্লিজ! ম্যাডাম। বিশ্বাস করেন। আপনে আমারে বিশ্বাস...

দুধলি রাত আর তারা ভরা আকাশ আর দাবানলের মালা আর রাতের নদীর বুকে চমকে চমকে ডেকে বেড়ানো ডিড-উ্যা-ডু-ইট পাখিই শুধু জানাল আকাতরুর বুকের মধ্যে কি হচ্ছে।

এবং হয়তো তটিনীও জানল।

৭

সারা রাতই প্রায় জেগে কাটাল তটিনী। এমন সুন্দর স্বপ্নের পরিবেশে এর আগে কোনো রাত কাটায়নি ও। মিষ্টি মিষ্টি ঠাণ্ডা। এক চাদরের মতন। ছমছমে জ্যোৎস্নার রাত। চওড়া নদীর সাদা বুকে জ্যোৎস্না পড়ে নদীটাই আকাশ বা আকাশটাই নদী তা যেন বোঝা যাচ্ছিল না। জয়ন্তী বন-বাংলোর উল্টোদিকে, নদীর ওপারের পাহাড়ের মাথাতে আগুনের মালাটা মাঝরাতে নিভে এসেছিল। তটিনীরই মতো মালা পরাবার কোনো মনের মানুষ জোটেনি হয়ত সেই পাহাড়ের। চাঁদনী রাতে পাহাড়টাকে আরও রহস্যময় দেখাচ্ছিল। যা-কিছুই, যে জনই একা, তাই রহস্যময়। তা নারীই হোক কী পাহাড়, কী পুরুষ। তারা দুঃখীও। সেই দুঃখের স্বরূপ শুধু তারাই জানে। যে কোনো অবিবাহিত পুরুষ অথবা নারীকে ভাল করে লক্ষ্য করলেই এই কথার সত্য বোঝা যায়। লক্ষ্য, পাহাড় অথবা নদীকেও করা যায় কিন্তু প্রশ্ন করা যায় শুধুমাত্র মানুষকেই। নিজেদের দুঃখের কথা মানুষ যেমন প্রকাশ করতে পারে, অন্য প্রাণীরা অথবা নদী বা পাহাড় তো পারে না!

সারা রাত কত কী পাখি ও প্রাণী ডাকল চারধারের বন থেকে, নদীর বুক থেকে, পাহাড় থেকে। কোনটা যে কার ডাক তা তটিনী জানে না। আকাতরু তার পাশে থাকলে বলতে পারত। তার পাশে, শুধু তার মনকে ভালবেসে আজ অবধি একজনও থাকেনি। কী জীবনে, কী খাটে। পুরুষগুলো বড় বোকা।

মেয়েদের শরীরে এসেই তাদের সব চাওয়া থেমে যায়। শরীরের কবরেই মন লীন হয়। ভালবাসা কাকে যে বলে তা খুব কম পুরুষই জানে। পুরুষেরা অধিকাংশই ঐ চানু রায় বা মৃদুলদেরই মতন পরম মূর্খ। তাই নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবে। পুরুষমাত্রই ওভারকনফিডেন্ট নিজেদের সম্বন্ধে। বিধাতা প্রত্যেক নারীকেই তারা অন্যরকম বলেই তাদের এক সহজাত বুদ্ধি দিয়েছেন তাদের বর্ম হিসাবে। সে বর্ম সাদা চোখে দেখা যায় না।

জয়ন্তী নদীর চওড়া বুক ধরে, ঠিক আড়াআড়ি নয়, কোনাকুনি চলেছে ওদের জীপ। সাদা শুকনো পাথরময় নদীরেখা ধরে উথাল-পাথাল হতে হতে চলেছে ওরা। তবে বালি উড়ছে না। রাতের শিশিরে এখনও বালিতে আর্দ্রতা আছে।

একজোড়া পাখি বাংলোর হাতার মধ্যে অথবা হাতার সীমানার বাইরে, জয়ন্তী নদীর ধারের একটি গাছে শেষ রাত থেকে মহা শোরগোল তুলেছিল। ভোরে উঠে বাইরে এসে আকাতরুর সঙ্গে দেখা হতেই জিগ্যেস করেছিল তটিনী সেই গাছ ও পাখিদের দেখিয়ে। আকাতরু বলেছিল পাখিগুলোর নাম র‍্যাকেট টেইলড ড্রঙ্গো। ফিঙে একধরনের। তবে মহা মারকুট্টে নাকি! ওদের ভয় পায় ওদের চেয়ে আয়তনে বড় অনেক পাখিই। যেখানেই থাকুক ওরা এমনি করেই সকলের ঘুম ভাঙ্গায়। ভোরের ময়ূর-মুরগী জাগারও অনেক আগে ওরা জাগে। আর গাছেদের নাম, ডিকরাসি।

এবারে জয়ন্তী নদী ছেড়ে ও পাড়ে উঠল জীপ। সকালে জয়ন্তী বন বাংলোর চৌকিদার অজয় ছেত্রী জবরদস্ত নাস্তা করিয়ে দিয়েছিল। জয়ন্তী গ্রামে রসগোল্লাটা নাকি গৃহশিল্প। দুধ প্রচুর এবং সস্তা বলে এখানে বাড়ি বাড়ি রসগোল্লা বানিয়ে রাজাভাতখাওয়া এবং আলিপুরদুয়ারে চালান দিয়ে দু-পয়সা রোজগার করে নেয় স্থানীয় মানুষেরা।

অবনী বলছিল ওদের।

নদীটা পেরোবার পথেই একটি দোতলা কাঠের বাড়ি বাঁ পাশে। ওটি একটি লাইমস্টোন কোয়ারীর বাড়ি। বন্যা দয়া করে গ্রাস করতে করতেও করেনি। ছেড়ে গেছে।

তটিনী বলল, এসব অঞ্চলে অনেক খনিজ জিনিস পাওয়া যায়। না? মানে ধাতু?

যায়ই তো। পাহাড়ের গায়ে গায়ে যে সাদা সাদা দাগ দেখছেন, চাঁদনী রাতে যে সব জায়গাকে মনে হয় বরফাবৃত, সেই সব জায়গাতে হয় ধস নেমেছিল কখনও, নয় খোঁড়াখুড়ি করে নানা ধাতব আকর বের করা হয়েছিল একসময়।

কি কি ধাতব আকর পাওয়া যায় এখানে?

অনেক কিছু।

তবু।

ডলোমাইট, লাইমস্টোন, ক্যালসেরাস টুফা, কপার ওর, কয়লা, আয়রন ওর, ক্লে ইত্যাদি। এই সব ধাতব আকরের জন্যেই তো পুরো বক্সা বনাঞ্চলই বিপদগ্রস্ত। পাহাড়ে পাহাড়ে খোঁড়াখুঁড়ি চললে, ট্রাকের পর ট্রাক চললে, বনের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে না? একোলজিকাল ব্যালান্স নষ্ট হয়ে যাবে তো!

তাই?

তাই তো!

বাবাঃ! আপনি কত জানেন।

তটিনী বলল।

অবনী লজ্জিত হয়ে বলল, আমি তো এই অঞ্চলেই জীবন কাটালাম। এসব জানি একটু-আধটু তবে গাছ পাখি ফুলের কথা আকা জানে আমার চেয়ে অনেক বেশি। এসব আমরা জানলে কি হবে? আমরা কি আপনার মতন অভিনয় জানি না গান গাইতে জানি?

অভিনয় আর আমি কতটুকু জানি!

তা ঠিক।

অবনী বলল।

তারপর বলল, অভিনয়ে মৃদুলবাবু আপনাকে অনেক গোল দিয়ে দেবেন।

আকা বলল, সক্কালবেলা! তুই আর অন্য কোনো মানষের নাম পাইলি না? ঐ লোকটার নামও উচ্চারণ করিস যদি আর একবার।

সত্যি তো। কিন্তু মানুষটা গেল কোথায়?

তটিনী বলল।

যেখানেই থাক। থাকা-খাওয়ার অসুবিধে হবে না চানু রায়ের হেপাজতে যখন আছে। চানু রায় মানুষটা যেমন খারাপ, আবার ভালও।

তুই অরে ভাল কইতাছিস?

আকা ধমকে বলল।

ভালই তো। যে খারাপ মানুষকে খারাপ বলে চেনা যায়, যে নিজেও স্বীকার করে যে, সে খারাপ তাকে নিয়ে ভয় নেই। কিন্তু মৃদুলবাবুদের মতন আঁতেল যাঁরা, যাঁদের আমরা দূরদর্শনে দেখি প্রায়ই, দেখি খবরের কাগজের পাতায়, ধুমসো চেহারা আর থুম্বো মুখের, যাঁরা মদ খেয়ে আর দলবাজী করে বঙ্গভূমের

তাবৎ সাংস্কৃতিক সাহিত্যিক সাঙ্গীতিক পরিবেশের স্বনিয়োজিত রক্ষক, তাঁদের নিয়েই বিপদ। এই জানোয়ারগুলোর মাত্র দুটো পা থাকতেই এরা এ জন্মে বেঁচে গেল।

কদ্দিন বাঁইচা থাকব! আমি হালারে হালুয়া বানাইয়া ছাড়ুম। আর্ট-কেলচার করণ চিরজীবনের মত বন্ধ কইর‍্যা দিমু।

আঃ। ছাড় না।

অবনী বলল।

তারপর বলল, তোর এই এক দোষ আকা। তোর হাতে কি এই পৃথিবীর ভার দিয়েছেন ভগবান? তুই কি ডন কীয়টে? যে পৃথিবীর যে প্রান্তে যা অন্যায় হচ্ছে তারই প্রতিবিধান করার দায় নিয়ে এখানে এসেছিস। শান্ত হ। তোর নিজের জীবনের শান্তি বাহ্যিক কারণে নষ্ট করে লাভ কি?

সেই ত হইল গিয়া কথা। পরের অশান্তি যে একদিন নিজের হইয়া উঠব এ কথা বোঝে কোন ব্যাটায়। আমাগো স্বভাবও হইল গিয়া ঐ রকম। নিজের পায়ে জুতার চাপ না পড়ন পর্যন্ত আমাগো হুঁশই আসে না। ইটাই ট্রাজেডি।

আবারও নদী!

স্বগতোক্তি করল তটিনী।

তটিনী আজ সকালে একটা ছাইরঙা তাঁতের শাড়ি পরেছে। কালরঙা ব্লাউজ। চোখে কাজল দিয়েছে গাঢ় করে। কালো টিপ করেছে কপালে। সাদারঙা ঝুঠো মুক্তার মালা আর বালা পরেছে গলাতে আর ডান হাতে। শ্যাম্পু করেছে না শিকাকাই বুঝতে পারছে না আকাতরু কিন্তু সদ্যস্নাতা তটিনীকে ঝাঁকতে ঝাঁকতে যাওয়া জীপের মধ্যে খুবই কাছে থেকে দেখতে পেয়ে খুশিতে সে মরে যাচ্ছে। কী গন্ধ মেখেছে তটিনী কে জানে! বিলিতি সেন্ট-টেন্ট-এর নাম তো ও জানে না। জানতে চায়ও না। তটিনীর কোনো পারফ্যুমের দরকার নেই। তার গায়ের নিজস্ব গন্ধটা যদি একবার পেতে পারত আকাতরু তবে তাতেই ভাল লাগাতে অজ্ঞান হয়ে যেত। তটিনীর মতন মেয়েরা যে কেন নিজের গায়ের গন্ধ আকাতরুর মতন হতভাগ্য পুরুষদের পেতে দেয় না! তটিনী যেন কোন ফুল! কাছে থাকতেই আমোদিত হচ্ছে আকা।

আবারও বলল তটিনী, আবারও নদী!

অবনী বলল। হুঁ।

কী যেন ভাবছিল সে।

তারপর বলল, একটা নয়। তিনটে নদী পেরিয়ে যেতে হয়, জয়ন্তী থেকে

ভুটানঘাটে যেতে হলে। জয়ন্তী, ফাসখাওয়া আর চুণিয়া ঝোড়া। এখন সহজে যে সব নদীর বুকের উপর দিয়ে জীপ পেরিয়ে যাচ্ছে বর্ষাতে সেই সব নদীর চেহারা যদি দেখতে পারতেন তাহলে বুঝতেন এরা কী রকম!

কী রকম মানে?

মানে, প্রলয়ংকরী। মানে, আপনার যেমন রূপ এই সকালে। কত পুরুষই যে ঐরাবতের মতন ভেসে যাবে না জেনেই।

শব্দ না করে মুখ টিপে হাসল তটিনী একটু।

প্রশংসাতে খুশি ভগবানও হন। আর তটিনী তো কোন ছাড়।

বেশ ভাল লাগছিল ওর। বহু বছর এমন ভাল লাগেনি। পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টিতে ভাল লাগে সব মেয়েরই। কিন্তু সেই মুগ্ধতা একধরনের বন্যতা পায় আকাতরুর মতন বন্য কোনো পুরুষের জংলী চোখের দিকে চেয়ে।

একটি গান শোনান না।

অবনী বলল।

পাগল! এই লাফানো-ঝাঁপানো জীপে বসে! সে তো পপ মিউজিক হয়ে যাবে। গান থাক। তার চেয়ে আপনি বলুন তো কি কি নদী আছে আপনাদের এই বক্সা অঞ্চলে।

নদীর অভাব কি? কত্ত নদী।

স্বগতোক্তি করল ভিতরে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি নিয়ে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টায় ব্যপৃত আকাতরু। ও ভাবছিল, ও যদি অবনীর মতন কলকাত্তাইয়া ভাষাতে কথা বলতে পারত। তবে ও তটিনীকে সবই বলত। পশ্চিমবঙ্গবাসী সংস্কৃতিসম্পন্ন তটিনী আকাতরুর ভাষার ধাক্কাতে যেন চমকে চমকে ওঠে। কিন্তু আকাতরুর পুববাংলার ভাষাতে যা প্রাণ, যা দম, যা ফুর্তি তা কি চিবিয়ে চিবিয়ে বলা পশ্চিমবঙ্গীয় ভাষাতে আছে!

অবনী বলল, পানা, ডিমা, বালা, ফাসখাওয়া, রায়ডাক আর সংকোশ।

আর একটু ডিটেইলস-এ বলুন। ঐ সব নদীদের সম্বন্ধে কি আর কিছুই বলার নেই?

আছে বৈকি। বলছি। একটু পরে কিন্তু আমরা একটা চা বাগানের মধ্যে দিয়ে যাব। তার নাম তুরতুরি।

তুরতুরি? বাঃ কি সুন্দর নাম!

হ্যাঁ। এই বক্সা অঞ্চলে তুরতুরি ছাড়াও আরও অনেক চা বাগান আছে। যেমন রায়ডাক, ঢালাঝোড়া, কোহিনুর, নিউল্যান্ডস, সংকোশ, কুমারগ্রাম,

রায়মাটাঙ্গ, চিঞ্চুলা, গাঙ্গুটিয়া, মাজেরডাবরি, আচাপাড়া।

আকাতরু বলল, ভাটপাড়া, চুয়াপাড়া, রাধারানী, ডিমা, কানখাওয়ার দোষ করল কি? আর...

আর থাম এবারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন না? ভাল, বেশি হয়ে গেলে আর ভাল থাকে না। কম বলেই তা ভাল। চা-এর সেলসম্যান আমি থোরিই। ঐতেই হবে।

তা যা কইছস।

কলকাতার তটিনী হাসি হাসি মুখে আলিপুরদুয়ারের এই দুজন মানুষের সঙ্গ খুবই উপভোগ করছিল। এই সারল্য, কলকাতার কোনো মানুষেরই মধ্যে পাওয়ার নয়। কলকাতাতে সারল্যর মতন পাপ আর দুটি নেই। অপরাধও নয়। বক্র আর কুটিলদের শহর ঐ কলকাতা।

এবারে নদীর কথা বলুন।

তটিনী বলল।

তারপর ভাবল, কী চমৎকার কাটছে আজকের সকালটা। আকাশে মেঘ করে এসেছে। বোধহয় বৃষ্টি হবে। উদলা আকাশের নিচে বসন্তে বাদলা বাতাস বইছে। "আজ সকালবেলার বাদল আঁধারে/আজ বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে।"

বনে না এলে, প্রকৃতির মধ্যে একাত্ম না হতে পারলে রবীন্দ্রনাথের গানকে বোধহয় হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। বাণীর মানেই না বোঝা গেলে গান যে গান হয়ে ওঠে না। কলকাতার লাল রায়, নীল সেন, বাসন্তী রায়, বেগুনী দাশগুপ্ত, সর্বজ্ঞ গুহঠাকুরতাদের মতন ঝাঁক ঝাঁক রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীদের এই কথাটা যদি বোঝানো যেত!

অবনী সিগারেটটা হাত বাড়িয়ে পথে ফেলে বলল, পানা নদীর জন্ম ভুটানে। এই পানা নদী বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পর পশ্চিমের সীমানা নির্ধারণ করে বয়ে গেছে। ডিমার উৎসও ভুটান পাহাড়েই। ভুটান পাহাড় থেকে নেমে এসে পানা আলাইকরি নদীর সঙ্গে মিশেছে। তারপর বয়ে গেছে আলিপুরদুয়ারের মধ্যে দিয়ে। আর ডিমা নদীর সঙ্গে গাঙ্গুটিয়া এবং রায়মাটাঙ্গ নদী এসে মেশার পর এই একত্রিত তিন নদীর নাম হয়েছে কালজানি।

আর বালার কথা কইলি না?

আকাতরু বলল, ইন্টারাপ্ট করে।

বলছি তো। তুইই বল না তাহলে। আমি বললে কথার মধ্যে এত কথা বললে বলতে পারব না।

হ। হ। আমি আর কথা কম্যু না। তুইই ক। তটিনী দেবী কি আর কখনও আইবেন এই আমাগো ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে? তাই ভাল কইর‍্যা সব বুঝাইয়া দে উনারে।

বক্সা পাহাড় থেকে নেমে এসেছে বালা নদী। থেলাচাঙ্গ আর কালকূট নদী এসে মিশেছে বালাতে। বালা গিয়েও পড়েছে সেই কালজানি নদীতেই।

তাই?

হ্যাঁ।

আর যে জয়ন্তী পেরিয়ে এলেন, তা বেরিয়েছে ভুটান সীমান্তের জয়ন্তী পাহাড় থেকে। ফাসখাওয়া আর হাতিপোতা ফরেস্ট ব্লক-এর সীমানা চিহ্নিত করে রয়ে গেছে জয়ন্তী।

আর ফাসখাওয়া?

অন্য নদীগুলোর কথা এখন থাক। একটু জল খাই। বলেই প্লাস্টিকের পার্লপেট-এর জলের বোতল খুলে, ড্রাইভারকে বলল, একটু থামো তো ভাই। জল খেয়ে নি।

অবনীর জল খাওয়া হলে তটিনী বলল, আপনি এত সব জানলেন কি করে?

অবনী হাসল। বলল, আমার বড়দা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেই কাজ করতেন। বাবার মৃত্যুর পরে এই দাদাই আমাদের মানুষ করেন। সেই সময়ে এই সমস্ত অঞ্চলে আমার থাকবার সুযোগ হয়েছিল।

তাই বলুন। আচ্ছা, আমরা যে ভুটানঘাট বাংলোতে থাকব, সেখান থেকে ভুটান কত দূর?

কাছেই। তাই তো নাম ভুটানঘাট। বাংলোর সামনে দিয়ে বয়ে গেছে রায়ডাক নদী। আশ্চর্য সুন্দর তার রূপ। একেকরকম রূপ একেক ঋতুতে। এই রায়ডাক নদীও এসেছে ভুটান থেকে। পীপিং-এ নিয়ে যাব আপনাকে। ভুটানের সেই পীপিং-এ পৌঁছে ওয়াঞ্চু নদী সমতলে পড়েছে। ভারতে। পড়েই চওড়া হয়ে গেছে। পীপিং অবধি পর্বতের পর পর্বতের মধ্যের গিরিখাত দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে ওয়াঞ্চু। ভুটানঘাট-এর সামনে দিয়ে বয়ে গিয়ে নর্থ রায়ডাক, সেন্ট্রাল রায়ডাক, মারাকাটা এবং নারাখালি ফরেস্ট ব্লক-এর মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে রায়ডাক নদী। এই নদীর বিশেষত্ব হচ্ছে যে সমতলে এসে সে গত একশ বছরে বহুবার গতিপথ বদলেছে। একঘেয়েমি বোধহয় রায়ডাক-এর একেবারেই পছন্দ নয়। আমাদের কারই বা ইচ্ছে করে একই পথ বেয়ে আজীবন চলতে। কিন্তু নদী তো নদীই। আমরা নদী হলে আমরাও আমাদের গতিপথ বারবার

বদলে ফেলে নিজেদের নবীকৃত করতাম। উনিশশো পাঁচ, উনিশশো তিরিশ, উনিশশো তেত্রিশ, উনিশশো পঞ্চাশ এবং সবশেষ উনিশশো আটষট্টিতে গতিপথ বদলেছে রায়ডাক। এই গতি পরিবর্তনের পাগলামির খেসারত দিতে হয়েছে মারাত্মকভাবে বনকে। সেন্ট্রাল রায়ডাক আর মারাকাটা ব্লক একেবারে তছনছ হয়ে গেছিল। আটষট্টির পর রায়ডাক-এর পুরনো খাত-এর উপরে একটা "সসেজ" বোল্ডার-বাঁধ বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর থেকে বর্ষাতে সেন্ট্রাল রায়ডাক আর মারাকাটার তেমন ক্ষতি হয়নি।

এমন সময় আকাতরু হঠাৎ বলে উঠল, থামা ত তোর নদীর ইতিহাস।

বলেই বলল, তটিনীকে উদ্দেশ্য করে, অ্যাই দ্যাখেন, আমরা এহনে চুর্নঝোড়াও পার হইয়া আইলাম। ফাসখাওয়া ত আগেই পারাইছি। তা বোঝবেন ক্যামনে? রিভার রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের অফিসারের মতন যা বকবকান বকবকাইতাছে পোলায় তা আর কী কম্যু! তুরতুরি বাগানে ঢুকুম আমরা একটু পরই। তারপর ময়নাবাড়ি বীটে পৌঁছামু। মাইমেনসিঙ্গা সুভাষবাবু আছেন বীট অফিসার। শুঁটকি মাছ খাইবেন না কি ম্যাডাম?

শুঁটকি মাছ?

চোখ কপালে তুলে বলল তটিনী।

তারপর বলল, আপনি শুঁটকি মাছ খান? ঈসস। আপনি বাঙাল যে তা জানতাম। এমন পচা বাঙাল তা তো জানতাম না!

হঃ।

অপমানটাকে ঝেড়ে ফেলে আকাতরু বলল। শুঁটকি মাছের ট্যাস্ট যে একবার পাইছে, স্যা মানুষের অবস্থা মাংসর সোয়াদ পাওনের পর মানুষখেকো বাঘের মতন হইয়া যায় আর কী। বোঝলেন কি না!

তারপর বলল, জলে না নাইম্যাই সাঁতার শেখন কি যায়? আপনেই কয়েন।

আকাতরুর উদ্ভট উপমাতে হাসি পেল তটিনীর। সাধে কি আর বাঙালদের বাঙাল বলে পশ্চিমবঙ্গের পুরনো বাসিন্দারা! ঠিকই বলে।

ও হেসে বলল, আমার সাঁতার শিখে কাজ নেই। ভুটানঘাট আর কতদূর?

এই ত তুরতুরি বাগানের এলাকা প্রায় পেরিয়ে এলাম। বাঁদিকে সামনে একটু দাঁড়াতে হবে। সুভাষদার সঙ্গে দেখা করে যেতে হবে।

অবনী বলল।

একটু পরই গাড়িটা দাঁড়াল বাঁদিকে।

বীট অফিস এটা।

অবনী বলল।

সেটা কি আবার?

ফরেস্ট-এর নানা ভাগ থাকে। তেমন থাকে আমলাদেরও। এক একটি ফরেস্ট ডিভিশান-এর বড়সাহেব হচ্ছেন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার। মানে ডি.এফ.ও.। তাঁর নিচে থাকেন কয়েকজন রেঞ্জার। এক একটি রেঞ্জ-এর ভারপ্রাপ্ত অফিসার। এক একটা রেঞ্জ আবার কয়েকটা বীট-এ ভাগ করা থাকে। প্রত্যেকটি বীট-এর জন্যে থাকেন একেকজন বীট অফিসার। এক একজন বীট অফিসারের নিচে থাকেন কয়েকজন ফরেস্ট গার্ড। এবারে বুঝলেন?

হ্যাঁ। তাহলে এ.ডি.এফ.ও.-টা কি জিনিস?

এ.ডি.এফ.ও. দুরকম হয়। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডি.এফ.ও. বা সীনিয়র রেঞ্জার। আর অ্যাডিশনাল ডি.এফ.ও.। আজকার সারা দেশেই সরকারী চাকুরেদের মধ্যে গাজোয়ারি উপরে ওঠার এক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কী কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে, কী রাজ্য সরকারের। উপরওয়ালার খেতাবটি ব্যবহার করার বড়ই লোভ দেখা যায়। যেমন উপরওয়ালাদের দেখা যায় গাড়িতে লাল বাতি জ্বালিয়ে পদমর্যাদা বেড়েছে এমন ভাবা। এদিকে তাঁদের মধ্যে অনেকেই জানেন না যে, সাধারণ মানুষের মনোভাব বিচার করলে তাঁদের গাড়ির মাথাতে লাল বাতি না জ্বলতে দিয়ে তাঁদের প্রত্যেকের পেছনে একটা করে লাল বাতি জ্বেলে দেওয়া উচিত। তাই অ্যাডিশনাল ডি.এফ.ও.-দের ভুলক্রমে এ.ডি.এফ.ও. বললেই তাঁরা হামলে পড়ে কল্যাণবাবুর মতন বলে "অ্যাডিশানাল বলুন, অ্যাডিশানাল।"

একজন পান-খাওয়া রোগা-সোগা ভদ্রলোক বীট অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন।

অবনী বলল, সুভাষদা, এই যে তটিনী দেবী। আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন যাত্রার জন্যে।

আসেন আসেন। নামেন একটু। পায়ের ধুলা দিয়া ধন্য করেন আমাগো। চা খাইয়া যান এককাপ।

মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট হলো সকালের জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছি। আজ থাক। মানে, এখন থাক। ফেরার পথে হবে'খন।

তটিনী বলল, বিনয়ের সঙ্গে।

অবনী ও আকাতরু গাড়ি থেকে নামল। অবনী বলল, পাঁচ মিনিট একটু সুভাষদার সঙ্গে কথা সেরে আসছি ম্যাডাম।

ঠিক আছে।

তটিনী বলল।

তটিনীর মন বলল, ওঁরা নিশ্চয়ই চানু রায় আর মৃদুলবাবু সম্বন্ধে কথা বলতে গেলেন। গত রাতের ঘটনাটার কথা মনে হতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল তটিনীর। মৃদুলকে ও পছন্দ কোনোদিনও করেনি। কিন্তু অপছন্দ করা আর ঘৃণা করার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান আছে। কলকাতার পরিবেশ যেমন প্রতিদিন দূষিত থেকে দূষিততর হয়ে যাচ্ছে, দূষিত হচ্ছে প্রতিবেশও। এই সব মানুষদের সঙ্গেই দিন কাটাতে হয়। ভাবলেই বুকের মধ্যে একটা কষ্ট অনুভব করে। ওর কথা মনে হয়ে মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। ভারী ভাল মেয়েও। পুরুষগুলো কি সবাই এমন বজ্জাত? কে জানে! তা নয় বোধহয়। আকাতরুরাও তো আছে। মেয়েদের মধ্যেও বজ্জাত কম নেই। সে নিজেও তো বজ্জাতই। তাকে ভাল কে বলবে।

গাড়ির পিছনের সিটে বসে সামনে তাকালো। কাঁচা, কোরা রঙের ধূলিধূসরিত পথটি সোজা চলে গেছে গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে। বাগানের প্রান্ত এলাকা। বাগানের মধ্যে যে বড় বড় গাছগুলো লাগানো হয়, কী নাম কে জানে! আকাতরু জানবে। সেই গাছগুলো ছাড়া অন্য গাছ নেই। বাঁদিকে গভীর জঙ্গল দেখা যাচ্ছে।

উপরে চেয়ে দেখলো, চমৎকার নীল আকাশ। ঝকমক করছে রোদ। রোদের কুচি উড়ছে যেন হাওয়ার সঙ্গে। বীট অফিসে যাওয়ার পথে বাঁদিকে পথপাশে একটা ছোট্ট ডোবা মতন। তার কিনারে কলমী শাক ফুটেছে। অজস্র। চার-পাঁচটি পাতিহাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে প্যাঁ-এ-ক প্যাঁ-এ-এক শব্দ করে। সামনের মাটির বাড়ির দাওয়াতে একটা তিন-চার বছরের ছেলে, যার নিম্নাঙ্গ নগ্ন কিন্তু উর্ধ্বাঙ্গে একটি নীলরঙা বুকছেঁড়া হাফ-সার্ট, কোঁচড়ে মুড়ি রেখে নিবিষ্টমনে একটি একটি করে মুড়ি তুলে, তা সে গুনে গুনে খাচ্ছে। কোথাও কোনো তাড়াহুড়ো নেই। অবকাশই আকাশ। দুটি ছাগল নিয়ে এক বুড়ি হেঁটে চলেছে পথ বেয়ে। কে জানে কোথায় চলেছে। আজ বোধহয় হাট আছে এই ময়নাবাড়িতে। দু-একজনকে ধামাতে করে আনাজপাতি নিয়ে যেতেও দেখল। কারোরই কোনো তাড়া নেই। না হাঁসেদের, না ছেলেটির, না বুড়ির না অন্য কারোর। ভারী ভাল লাগছিল তটিনীর। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল ওর। পুকুরপাড়ে মধুচুষি ফুলের ঝোপের মধ্যে বসে থাকত ছোট্ট মেয়ে তটিনী এমনই নিস্তব্ধ দুপুরে। ফড়িং উড়ত। মরা নদীর সোঁতার পাশের সজনে গাছের ডালে নীলগণ্ঠ পাখি

উড়ে এসে বসত। হরেকৃষ্ণ দলুই-এর বাড়ি থেকে তার নব্বুই বছরের বুড়ি মা বাতের ব্যথায় কঁকিয়ে কাঁদত। নিস্তব্ধ ঘুঘুডাকা দুপুরে চিলের কান্নার সঙ্গে সেই কান্না মিশে যেত। তটিনীর সমস্ত ছেলেবেলাটা ফ্রেমে-বাঁধানো কোনো ছবিরই মতন তার মনের চোখে একঝলক ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। খুবই গরীব ছিল ওরা। কিন্তু আজকে কলকাতার ফ্ল্যাট, মারুতি গাড়ি, চাকর-ঝি, ফ্রিজ, ভি সি আর, টিভি, বেডরুমে এয়ার কন্ডিশনার, বসবার ঘরে সোফাসেট, কার্পেট এসব কোনো কিছুর মূল্যেই ছেলেবেলার সেই আশ্চর্য দিনগুলিকে কেনা যাবে না। যা গেছে, তা গেছে চিরদিনেরই মতন।

অবনীবাবুরা ফিরে এল। ড্রাইভারও। বোধহয় সিগারেট খাচ্ছিল গাড়ির পেছনে গিয়ে। সুভাষবাবু গাড়ি অবধি এসে বিদায় জানালেন। দুটি গন্ধরাজ লেবু দিলেন তটিনীর হাতে। বললেন, আমার বাগানের। ওখানে লেবু পাওয়া যায় না। তাই দিলাম। ভুটানঘাট বাংলোর চৌকিদার মানবাহাদুর খুব ভাল মসুর ডাল রাঁধে। মসুর ডালের সঙ্গে খাইবেন ভাত দিয়া।

তটিনী মুখে ধন্যবাদ না দিয়ে, হাসল একটু। ধন্যবাদ বা "থ্যাঙ্ক উ্য" সব জায়গাতে বলা যায় না। বলা উচিতও নয়। গাছ থেকে ছিঁড়ে আনা পাতাসুদ্ধ দুটি গন্ধরাজ লেবুও যে এক মস্ত উপহার হতে পারে একথা কলকাতাতে বসে ভাবা পর্যন্ত যায় না।

গাড়ি ছেড়ে দিল। একটু এগিয়ে গিয়েই গাড়িটা বাঁদিকে মোড় নিল। পথে একটি চেকনাকা ছিল বনবিভাগের। সেটি পেরিয়ে, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল গাড়ি।

হাতি। হাতি। ঐ যে।

বলে, চেঁচিয়ে উঠল তটিনী।

আকাতরু হাসল। বলল, না।

হাতি না?

হাতি হইব না ক্যান। হাতি নিশ্চয়ই!

তবে?

হাতি দেখে উত্তেজিত গলাতে বলল তটিনী, ছোট্ট মেয়ের মতো।

হাতি নিশ্চই। কিন্তু জংলা হাতি না।

তবে? জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, আর জংলা হাতি নয় কেমন?

আপনেও ত জঙ্গলেই আইছেন। তাই বইল্যা আপনেও কি জঙ্গলি? কী যে কন!

অবনী আকার কথাতে হেসে ফেলল।

আকা আবার বলল, ঐ হাতিটা মাইয়া হাতি।

মানে? হস্তিনী?

হ। হেইটার নাম হইল গিয়া প্রমীলা।

তাই?

হ। ফরেস্ট ডিপার্টের হাতি। অনেকদিন আগে চান করণের সময়ে পায়ের ছিকলখান খুইল্যা দিছিল ওর মাহুতে। জঙ্গলের মধ্যের ঝোড়াতে চান করতাছিল প্রমীলা। হেই সময়েই সে পেরথমবার জঙ্গলে পলাইয়া যায়।

তার এক প্রেমিক আছে।

অবনী বলল।

তারপর বলল, একই প্রেমিক। প্রকাণ্ড দাঁতাল। অল্প কদিন আগেই একবার রাতের বেলায় পালিয়ে গেছিল। বারবার পালায় জঙ্গলে কিন্তু প্রেমিক বদলায় না। খুব ভালবাসা দুজনের।

তটিনী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাই?

হ। হাতিটা সুভাষদারই সম্পত্তি কইতে পারেন। ময়নাবাড়ির বীটের এই সম্পত্তি।

কী করেন সুভাষবাবু হাতি দিয়ে?

তটিনী বলল।

কী করেন না তাই কন?

আকাতরু বলল।

ডুয়ার্স আর আসামের জঙ্গলে হাতি, ওড়িশার জঙ্গলে মোষ, উত্তর প্রদেশের ড্রাই ইলাকায় উট কত কত কাজেই যে লাগে তা কহনের নয়।

তাই?

বলল তটিনী।

৮

মসুর ডাল, কাঁচালংকা কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে রাঁধা, কড়কড়ে করে আলু ভাজা, এঁচড়ের তরকারি, খুব বড় বড় পিস করে কাটা তেলওয়ালা পাকা রুইয়ের ঝোল, ভেটকি মাছের কাঁটা-চচ্চরি দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে ঘুম লাগিয়েছিল তটিনী। এত ঘুম যে কোথায় কী করে জমে ছিল তা তটিনী ভেবেই পাচ্ছে না। শরীর এবং মনও যেন ছেড়ে দিয়েছে একেবারে। এলিয়ে দিয়েছে। 'আনওয়াইন্ডিং প্রসেস' শুরু হয়েছিল রাজভাতখাওয়াতেই। তা গতিজাড্য পেয়েছিল জয়ন্তীতে এসে। আর ভুটানঘাটে এসে সেই চড়াই যেন শেষ হলো আপাতত।

ভারী সুন্দর বাংলোটি ভুটানঘাটের। কাঠের দোতলা বাংলো। চওড়া বারান্দা ও বসবার ঘর আছে দোতলাতে। একতলাতেও বারান্দা আছে। বাংলোর কিছুটা দূর দিয়েই ওপারের ভুটানের উত্তুঙ্গ পাহাড়শ্রেণীর পা ছুঁয়ে আর গভীর বনরাজির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে রায়ডাক নদী। ঝরঝর শব্দ করে। কাছেই বোধহয় জলের মধ্যে একাধিক প্রপাত আছে। একই ডেসিবেল-এ জোরে জল পড়ার শব্দ। হয়েই যাচ্ছে অবিরাম। শব্দটি হয়ত একই থাকবে কিন্তু রাতের বেলা যখন বন-বাংলো সংলগ্ন পরিবেশ অনেক বেশি শান্ত হবে, বনবাণীও নিথর হবে তখন এই শব্দকেই নিশ্চয়ই আর অনেক জোর বলে মনে হবে।

নদীতে যাওয়ার পথ করা আছে একটা। নদীর কাছেই পাম্প-হাউস। আর

আছে একটি বানানো "নুনী"। SALT-LICK। রাজভাতখাওয়া-জয়ন্তী রোডের উপরের টাওয়ারের কাছে যেমন আছে, সাংহাই রোডের মোড়ে, এখানেও বস্তা বস্তা নুন ফেলে রেখেছেন বনবিভাগ বাংলোর কাছেই। সেখানে ভর দুপুরেও চিত্রল হরিণেরা নুন চাটতে এসেছে। গভীর হরজাই জঙ্গলের মধ্যে সেই নুনী। রায়ডাক নদী, নদীর ওপাড়ের ভুটানের আকাশছোঁয়া পাহাড় এবং তারও উপরে নির্মেঘ কলুষহীন সুনীল আকাশ মিলেমিশে মনে হচ্ছে একটি ফ্রেমে-বাঁধানো ছবি।

আকাতরু আর অবনীবাবু বলেছিলেন বিকেলে নদীতে বেড়াতে নিয়ে যাবেন বাংলোর সামনের পথ দিয়ে হাঁটিয়ে। তারপর নদীর বিস্তীর্ণ বালি আর নুড়িময় বুক ধরে হেঁটে ফিরে আসবে বাংলোতে।

ঘুম থেকে উঠে ও দোতলার বাংলোতে বারান্দার ডান কোণে চেয়ার পেতে নদীর দিকে চেয়ে বসেছিল। ওরা দুজনে নিজের ঘরে উঠেছেন একই সঙ্গে ওঁরাও বারান্দাতে বসে কথা বলছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন ওর পাশে বসেই কথা বলছেন ওঁরা। এমন নিস্তব্ধ পুরো অঞ্চল। বাংলোর পেছন দিকে বাবুর্চিখানা। কে যেন বালতি নামাল সিমেন্ট-বাঁধানো চবুতরাতে। তাতেই কত শব্দ হলো। তবে হাওয়া আছে জোর। নদীর উপর দিয়ে বসে আসছে সে হাওয়া। বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া। এখনই শীত শীত করছে। রাতে কম্বল গায়ে দিয়ে শুতে হবে সব দরজা-জানালা বন্ধ করে।

কথা আছে বিকেল চারটেতে চা নিয়ে আসবে চৌকিদার মানবাহাদুরের হেল্পার। তারপর ওরা হেঁটে বেরোবে যাতে দিনের আলো থাকতে থাকতে বাংলোতে ফিরে আসতে পারে। এই সব অঞ্চলের জঙ্গল এমনই নিশ্ছিদ্র যে ভিতরে চোখ যায় না। দু'পাশ থেকে জঙ্গল ঝুঁকে পড়েছে পথের উপরে। ভয় করে দেখে। তাছাড়া এই সব জঙ্গলে বাঘ তো আছেই, কিন্তু বাঘের থেকে যত না ভয় তার চেয়ে অনেকই বেশি ভয় সাপের এবং হাতির।

নিচ থেকে অবনীবাবু বললেন, লুঙ্গি-টুঙ্গি ছেড়ে তৈরি হয়ে নে আকা। সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। চারটেতে চা খেয়ে না বেরোলে আলো থাকতে থাকতে ফিরে আসা যাবে না।

হ।

আকা বলল।

তারপর বলল, আমার কিছুই ভাল লাগতাছে না রে অবু।

বুঝেছি।

কী বুঝছস? আমি এহনে কি করুম তাই ক!

মরেছিস তুই। আমি কিছুই করতে বলি না।

তার মানেডা কি? তুই আমার বন্ধু কি বন্ধু না?

বন্ধু বলেই তো বলছি। সারাটা জীবন তুই উল্টোপাল্টা কাজ করে এলি। কলেজপাড়ার নমিতা তোকে এত ভালবাসে। পাল্টি ঘর। কত গুণের মেয়ে। এত করে বললাম তোকে। মাসিমারও ভীষণই পছন্দ অথচ তোর...

হঃ। কার সঙ্গে কার তুলনা!

তটিনীকে নিয়ে তুই কি করতে চাস?

সকলেই যা করে। বাড়ির বউ। তুই নলিনীকে নিয়ে যা করছস। সকলেই যা করে।

তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

তটিনী কত ঘাটের জল খাওয়া মেয়ে সে সম্বন্ধে তোর কোনো ধারণা আছে?

আস্তে কথা ক। শুইন্যা ফেলাইলে বেচারী মনে দুঃখ পাইবনে।

দুঃখ পাবার তো কিছু নেই। তটিনী কি নিজে জানে না এ কথা!

তাছাড়া আমি তো তাকে শোনাবার বা আঘাত দেবার জন্যে এ কথা বলছি না। বলছি, তোরই ভালর জন্যে। ওর ঘর তো দোতলার বাঁদিকে। এই দিকের কথা শুনতে পাবে না। তাছাড়া সে তো এখনও ঘুমাচ্ছে। মানবাহাদুরকে বলা আছে চারটের সময়ে চা নিয়ে গিয়ে দরজাতে ধাক্কা দেবে।

তবু। তুই আস্তে আস্তে কথা ক।

অবনী আকাতরুর কথার কোনো উত্তর দিল না।

আকা বলল, কথা কইস না ক্যান?

কোনো কথা নেই আমার। তোর মাথাটা গেছে।

হয়ত। অবশ্য আমি কি আর বুঝি না যে আমার কুনোই যুগ্যতা নাই তারে পাওনের। আমার ভালবাসাই হইব আমার সব যুগ্যতা। আমি বাকি জীবন তার চাকর হইয়া থাকুম।

তোকে সে চাকর রাখলে তো! যাদের সকাল বিকেল চাকর পাল্টানো অভ্যেস তাদের তোর মতো গোঁয়ার-গোবিন্দ বাঙাল চাকরের প্রয়োজন নেই। তাদের প্রয়োজন টাকার। তোর ভালবাসাতে তাদের কোনো প্রয়োজন নেই। বারো বছর বয়স থেকে তারা ভালবাসা ছেনে-ছিঁড়ে ভালবাসার উপরে বিরক্ত হয়ে গেছে। পুরুষের ভালবাসা আর মুসলমানের মুরগীপোষা যে একই গোত্রীয়

তা তারা ভাল করেই জানে। ভালবাসার কথা বললে, তারা হাসবে।

হাসব? কইস কি রে? এমন বুকা মাইয়াও আছে না কি এই পৃথিবীতে যে ভালবাসা বুঝে না! বিশেষ কইর‍্যা যে কুখনো পেরকৃত ভালবাসা কারে কয় তাই জানে নাই।

অবনী হেসে উঠল আকাতরুর কথাতে।

হাসলি ক্যান? ইডিয়ট!

হাসলাম এই জন্যে যে, তোর পেরকৃত ভালবাসা তটিনীর চোখে বিকৃত ভালবাসা বলে ঠকবে। ও যাত্রার নায়িকা তুই ওর সঙ্গে যাত্রার ডায়লগ দিয়ে পারবি? তুই একটা ছাগল।

মুখ সামলাইয়া কথা কইস য্যান।

না হলে কি করবি?

তোর মাথা ফাটাইয়া দিমু।

হ্যাঁ। জানিস তো ঐ গুণ্ডাগিরি। তুই একটা ঘটোৎকচ। তোর মতন একটা গ্রস, দুর্গন্ধ বাঙালকে কলকাতার তটিনীর ভাল লাগবে কেন তার একটা কারণ আমাকে দেখাতে পারিস? জাস্ট একটা?

ক্যান পারুম না। আমার মতন শুদ্ধ ভালবাসা অরে আর জীবনে আর কেউই বাসে নাই যে এইটাই হইল গিয়া যথেষ্ট কারণ। ও মাইয়ার মগজ বইল্যা কিছু যদি থাইক্যা থাকে ত সে নিশ্চয়ই বুঝবো আনে। সে তোর মতন ছাগল না কি?

অবনী বল, ঘটোৎকচ!

তারপরই বলল, তোর যা ইচ্ছে হয় তাই কর। তোর এলেম থাকে তুই ভালবাস, তুই তার সঙ্গে শুয়ে পড়, বিয়ে কর, যা খুশি তাই কর। কিন্তু সবই করতে হবে নিজের এলেমে। আমার বিন্দুমাত্র সাহায্য তুমি পাবে না তা বলে দিলাম। জীইয়ে রাখা কইমাছের মতন নমিতাকে আমি আর মাসিমা জিইয়ে রেখেছি তোর জন্যে। তুই জানিস কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এসেছিল মেয়েটার, আমরা সে সব সাবোটাজ করেছি দিনের পর দিন। তুই হলি গিয়া ধাঙ্গড় বস্তির শুয়োর। ময়লা খাওয়াই তোর অদৃষ্ট। ফলমূল তোর ভোগে লাগবে কেন?

আকাতরু কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করে রইল। তারপর বলল, ঠিক আছে। আজ চা খাওনের পর তর আর যাইতে হইব না। আমি একাই তটিনীরে লইয়া যামু নদীতে।

মাথা খারাপ! তোর এখন যা অবস্থা! তোর সঙ্গে একা তটিনীকে ছেড়ে দেবার মতন দায়িত্বজ্ঞানহীন আমি নই। আমার নিজের দায়িত্বে তাকে এই

জঙ্গলে এনেছিলাম। তাও মৃদুলবাবু সঙ্গে থাকলে আমার দায়িত্ব অনেক কম থাকত। কাল রাতে উনি চলে যাওয়াতে আমার দায়িত্ব বেড়ে গেছে অনেক। অমন কাঁচা কাজ আমার দ্বারা হবে না। তুই যদি স্বাভাবিক থাকতিস তাহলেও অন্য কথা ছিল। তুই তো এখন ক্ষ্যাপা কুকুর। কামড়াবি না আঁচড়াবি ওকে একা পেলে তা ঈশ্বরই জানেন!

আকাতরু আহত হয়ে চুপ করে গেল।

একটু পরে বলল, অরে পীপিং-এ লইয়া যাবি না?

যাব। কাল সকালে।

হুঁ।

পীপিং-এ গিয়ে কিই বা দেখবে।

ক্যান? ওয়াঞ্চু নদী কেমন কইর‍্যা ভুটানের দুই পাহাড়ের চিপা থিক্যা বারাইয়া হঠাৎ ছড়াইয়া গেছে সমতলে তা কি দেখার নয় না কি? তর চক্ষু কখনও আছিল যে তুই দেখতে পাইবি। হঃ।

তাও শীতকাল হলে হতো। ভুটান থেকে কমলালেবু এসে পীপিং-এর হাটে কমলালেবুর পাহাড় জমত তখন। এই ন্যাড়া পীপিং দেখে কি হবে?

স্যা তর বোঝনের কাম নাই। যার চক্ষু আছে স্যা ন্যাড়া মাথাতেও চুল দেইখ্যা লয়। অ্যারে কয় ইমাজিনেশান। বুঝলি কিনা মাস্টের। ইম্যাজিনেশান! তুই ইসবের কী বোঝস?

৯

চা খাওয়ার পর ওরা তিনজনে বেরিয়ে পড়ল।

গাড়ি নেবেন না?

তটিনী বলল।

নিতে পারেন। ড্রাইভার তো বসেই আছে। কিন্তু হেঁটে গেলে পথটাকে অনেক ভাল করে দেখতে পেতেন। তাছাড়া, আকার মতন গাইড তো আর রোজ রোজ পাবেন না। সে তো এখান প্রতিটা গাছ, ফুল, লতা, পাতা সবই চেনে। চিনতে চিনতে, পথ চলতে পারবেন।

হাতি বা বাঘ যদি বেরিয়ে পড়ে!

বাঘ বেরোবে না। এখানে বাঘেরা সব অসূর্যম্পশ্যা। যদিও নাম 'টাইগার প্রজেক্ট", কেউই এ অঞ্চলে বাঘ দেখতে পান না। বাঘেরা শহুরে কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-বাদকদের মতন 'এগবিশিনাস্টি' প্রাণী নয়। অন্তর্মুখিনতা শব্দটার মানে যে কি তা বাঘদের দেখে শিখতে হয়। "আমাকে দেখো", "আমাকে দেখো" এই সস্তা শ্লোগান নেই তাদের। তবে বাঘ যে আছে, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। আর হাতি যদি বেরোয় তবেও ভয়ের কিছু নেই। আমার বন্ধু আকাতরু নিজেই সাক্ষাৎ গণপতি। চেহারা দেখে কি আপনার ওকে হাতি নয় বলে মনে হয়। হাতি বটে, তবে মাকনা। দাঁত নেই।

তারপর একটু চুপ করে থেকে অবনী বলল, আকাতরুর নিজের ধড়ে প্রাণ

থাকতে আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি কোনো মানুষ কী জানোয়ারই করতে যে পারবে না তা কি গত রাতে বোঝেননি?

তটিনী আকার দিকে মুখ তুলে হাসল একফালি। অমন সুন্দর বৈশাখী বিকেলে অমন ফুল-ফুলন্ত বনে, অমন সুন্দর অথচ বিবাগী নদীতটে, অমন মৌনী, আকাশচুম্বী পাহাড়শ্রেণীর পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না তটিনীর। ও ভাবছিল, মানুষ বড় বেশি কথা বলে!

অবনীর মন বলল, গেল। গেল। ছেলেটার সর্বনাশের যা বাকি ছিল তা সম্পূর্ণ হলো। এমন মার সে সইবে কি করে যখন অভিজ্ঞ অবনীর বুকের মধ্যেটাও তটিনীর মরা আলোর মতন সুন্দর, আশ্চর্য সেই হাসির ছোঁয়া লেগে ধড়াস ধড়াস করতে লেগেছে?

সকালে পরা শাড়ি-জামা ছেড়ে একটি চাঁপারঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে। তটিনী। লাল ব্লাউজ।

কে দেখবে, কে জানে।

মেয়েরা বোধহয় কারোকে দেখাবার জন্যে সাজগোজ যতটা করে তার চেয়ে বেশি করে, নিজেদের মধ্যে নিজেকে স্বীকৃত করার যে জন্মগত তাগিদ আছে, সেই তাগিদেই। নইলে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গাতে ঘন ঘন পোশাক বদলাবার কি আছে! অবনী আর আকাতরু তো মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়।

হাতে পরেছে প্লাস্টিকের লালরঙা চুড়ি অনেকগুলো করে। দু হাতেই। লাল প্লাস্টিকের বড় বড় গোল বলের মালা পরেছে গলাতে। কানে লাল প্লাস্টিকের দুল। কাজলও পরেছে। ঐ চোখ কাজল লাগালে যে দু চোখের কণীনিকার পটভূমিতে চোখ দুটির মণিতে, আঁখিপল্লবে, উড়ে যাওয়া কালো পাখির ডানার মতন ভুরুতে অতলান্ত হয়ে ওঠে সে কথা কি তটিনী নিজে জানে! হয়তো জানে। জানে বলেই হয়তো ইচ্ছে করে বধ্যভূমিতে আকর্ষণ করে বোকা পুরুষদের!

এটা কি বাঁশ?

তটিনী বলল, আঙুল তুলে দেখিয়ে।

বলল, এর আগে কোথাওই দেখিনি তো!

"আগে কখনও" দেখেননি এমন জিনিস এই "পুরনো" পৃথিবীর আনাচে কানাচে পাবেন। মৃদুলবাবুর মতন যাঁরা বলেন যে, এই পৃথিবীটা বড়ই পুরনো হয়ে গেছে, তাঁরা বোধহয় কখনওই দু চোখ মেলে এই সুন্দর পৃথিবীর দিকে একবারও তাকানইনি!

ঐ বাঁশের নাম মাকলা বাঁশ।

আকা বলল।

বাঁশ অনেকরকম হয় বুঝি?

হয় না ত কি?

তটিনীর আকার কথা শুনে মজা লাগল খুব। সবসময়েই সে ধমকে ধমকে কথা বলে। যেন কোনো অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে অনুক্ষণ লড়াই করছে সে।

আর কি কি বাঁশ হয় এই সব অঞ্চলে?

মাকলা ছাড়াও হয় দাওয়া বাঁশ, লাঠি বাঁশ, তামা অথবা ছোয়া বাঁশ।

লাঠি বাঁশ দিয়ে কি লাঠি হয়?

হয় তো।

বাঃ। আমাকে জোগাড় করে দেবেন তো একটা। বেশি মোটাও নয়, বেশি সরুও নয়।

কাকে মারবেন লাঠি দিয়ে?

অবনী হেসে বলল।

কত লোক আছে মারার। চোর-ছ্যাঁচরের তো অভাব নেই। তাছাড়া মাঝে মাঝে নিজেকে মারার কথাও মনে হয়। নিজের মধ্যেও তো খারাপত্ব কম নেই!

বাঃ। সুন্দর বলেছেন।

অবনী বলল।

তারপর বলল, আপনি এমন কথা বলেন তটিনী দেবী যে মনে হয় সবসময়েই যাত্রার ডায়ালগ বলছেন। তবে ডায়ালগ কোনো গ্রাম্য যাত্রা নয়, যেন ভীষণ সফিস্টিকেটেড কোনো অডিয়েন্সের জন্যে বিশেষভাবে পরিকল্পিত কোনো সফিস্টিকেটেড যাত্রা।

হঠাৎ আকা বলল আঙুল তুলে, ঐ দ্যাখেন। লজ্জাবতী লতা।

কই? কই?

ঐ যে। চান? আগে দ্যাখেন নাই কুখনো?

নাঃ।

ঐগুলির ইংরাজি নাম হইল গিয়া মিমোসা পুডিকা।

বাবাঃ। আপনার কি বটানি ছিল না কি? কলেজে?

আকা উত্তর দিল না।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি ল্যাখাপড়া তেমন শিখি নাই। মাঝে মাঝে মনে হয়, না শিখ্যা দুষ করি নাই কুনো। শিখলে হয়ত মৃদুলবাবু হইয়া

যাইতাম!

তটিনী চুপ করে থাকল।

অবনী বলল, থাক, ঐ অপ্রিয় প্রসঙ্গ থাক।

মানুষটা কোথায় চলে গেল বলুন তো? ঐ চানুবাবুরা তাকে মেরেটেরে ফেলবে না তো! হয়তো শুকনো নদীর বেড-এ কোথাও ডেডবডি ফেলে রাখল।

তারপরই বলল, আচ্ছা, বৈশাখের একেবারে গোড়াতেই এখানের সব নদীর এমন শুকনো অবস্থা কেন? অন্য সব জায়গাতে তো বৈশাখের শেষে অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসেই নদী শুকোয় দেখেছি।

তারপরে একটু থেমে বলল, অবশ্য আমি আর কত জায়গাতেই বা গেছি!

অবনী বলল, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এসব তো ভাব্বার অঞ্চল।

ভাব্বার মানে?

এই সব অঞ্চলের এই বিশেষত্ব। হিমালয়ের পাদদেশে দু'রকমের জঙ্গল দেখা যায়। ভাব্বার আর তেরাই। ভাব্বার জঙ্গলের বিশেষত্ব হচ্ছে এই অঞ্চলের নদীগুলো পাহাড় থেকে সমতলে নেমে কিছুদূর যাবার পরই ডুব-সাঁতার দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আকা বলল, মানে অন্তঃসলিলা হইয়া যায় আর কী!

অবনী বলল, সেই কারণেই এখানকার সব গাছগাছালির শিকড় মাটির নিচে অনেকদূর অবধি নেমে যায় জলের সন্ধানে। এই শিকড়গুলোর নাম ট্যাপ রুটস।

নদীগুলো কি আর মাথা তোলে না?

তোলে বইকি। বেশ কিছুদূর ডুবসাঁতারে গিয়ে মাথা তোলে। এই কারণেই ভাব্বার অঞ্চলে নানা গাছগাছালি দেখা যায়, যা অন্যান্য অঞ্চলে দেখা যায় না।

একবার সুন্দরবনে গেছিলাম। সেখানে দেখেছিলাম গাছেদের শিকড়গুলো সব দাঁত বের করে থাকে ভাঁটার সময়ে।

তাই তো। সেই শিকড়দের নাম এরিয়্যাল রুটস। তারা দিনের মধ্যে দুবার মাথা উঁচিয়ে বারো ঘন্টা না থাকতে পারলে তো পচেই যেত।

অবনী বলল।

সত্যি! প্রকৃতির মধ্যে কত যে রহস্য। আমার জঙ্গলে আসতে ভারী ভাল লাগে। ভাল লাগে বলেই তো আলিপুরদুয়ারে যাত্রা শেষ হতেই আপনাদের জ্বালিয়ে দিয়ে এখানে এলাম।

আকাতরু বলল, আমরা দাহ্য পদার্থ না। আমরা নিজেরা যদি নিজেদের

ইচ্ছাতে না জ্বলি তবে অন্যর সাধ্য কি আমাগো জ্বালায়! কী বল অবনী?

ঠিক।

অবনী বলল।

ওরা পাটকিলেরঙা ধুলোর পথ বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীর কাছে পৌঁছে গেল। বাঁদিকে পথ চলে গেছে পীপিংএ।

নদী এখানে অনেকই চওড়া। পথের দিকে বিস্তীর্ণ চর। তার উপরে নুড়ি বিছানো। পথের ধুলোতে ট্রাকের চাকার দাগ দেখল। তটিনী বলল, বাঃ কি সুন্দর! কিন্তু ট্রাক এখানে কী করতে আসে?

কী করতে আর? নুড়ি-পাথর বয়ে নিয়ে যায়।

ঈসস। নদীর বুক যে ফাঁকা হয়ে যাবে।

তটিনী চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বলল।

নদীর বুক নারীর বুক নয়। অত সহজে তা শূন্য হয় না। যা হারায় নদী, তা পরের বছরই পুরিয়ে নেয়। রবীন্দ্রনাথের সেই গানটার মতন।

কী গান?

তটিনী শুধোল।

"আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনি লীলা তব
ফুরায়ে দিয়ে আবার ভরেছ জীবন নব নব।"

অবনী বলল।

বাঃ।

তটিনী স্বগতোক্তি করল।

এমন সময়ে হঠাৎই কী মনে পড়াতে অবনী বলল, আমার একবার বাংলোতে ফিরে যেতে হবে।

ক্যান?

আকাতরু শুধোল।

রাতে কি রান্না হবে তাই বলে আসতে ভুলে গেছি মানবাহাদুরকে। তাছাড়া আগামীকাল একটা পাঁঠা কিনতে বলেছিলাম। সে জন্যে আজই টাকা দিয়ে কারোকে পাঠাতে হবে ময়নাগুড়িতে সুভাষদার কাছে। রেঞ্জার সাহেবের জীপ আসবে কী যেন কাজে একটু পরেই। ড্রাইভারের হাতে টাকাটা পাঠাতে হবে। নইলে সকালে পাঁঠা কিনে তা কেটেকুটে ভুটানঘাটে পাঠাতে পারবেন না সুভাষদা। সাইকেল নিয়ে লোক আসবে ময়নাগুড়ি থেকে রোদ চড়া হবার আগে আগে।

কাল সকালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলে হতো না? আমাদের ড্রাইভারও তো পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে।

তটিনী বলল।

তা হবে না। আমরা কাল চা খেয়েই চলে যাব পীপিং।

পীপিং শুদামুদা যাইয়া কি অইব? এখন তো কমলার সময় নয়। কমলার সময়ে পীপিং-এ যখন কমলার পাহাড় লাগে তখন যাইলেই না মজা!

আকাতরু বলল।

সবসময়ই মজা। ওয়াঞ্চু নদী হ্যাঙ্গিং ব্রিজ-এর নিচ দিয়ে বয়ে এসে যখন সমতলে ছড়িয়ে গেল তখনকার দৃশ্যই আলাদা।

ঋষিকেশ-এর গঙ্গার মতন?

হ্যাঁ। প্রায় সেরকমই।

বলেই বলল, না। আর সময় নষ্ট করলে অন্ধকার হয়ে যাবে। অন্ধকারে এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া সেফ হবে না। সঙ্গে টর্চ পর্যন্ত নেই একটা। কিন্তু তোরাই বা ফিরবি কি করে? তোদের সঙ্গেও তো টর্চ নেই।

আমরা নদীর বুকে বুকে ফিরব ত, জলের উপর আলো থাক অনেকক্ষণ। তর যদি যাইতেই হয় ত আর দেরি কইর‍্যা কাম নাই। চইল্যাই যা তুই।

হ্যাঁ। তাই যাই।

অবনী বলল।

তারপর বলল, আপনাদের জন্যে চায়ের জল বসিয়ে, পেঁয়াজি বেসনে ডুবিয়ে রাখতে বলব, যাতে গিয়ে পৌঁছলেই গরম গরম পেঁয়াজির সঙ্গে চা খেতে পারেন। আমি চলি। তোরা সাবধানে আসিস আকা। এই সময়ে নদীতে সব জানোয়ার জল খেতে যাবে। নজর রেখে চলিস। বাংলোর কাছে অনেকখানি জায়গাতে সাপের আড্ডা নদীর বুকের ভেজা পাথরে। সেই জায়গাতে পৌঁছতে পৌঁছতে তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে। নাঃ। আমরা বড্ড দেরি করে বেরোলাম বাংলো থেকে। কী করবি? আমার সঙ্গেই ফিরে যাবি?

আকাতরুর মুখটি যেন শুকিয়ে গেল।

তটিনী বলল, এমন এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতে চাই না আমি। ভুটান পাহাড়ের পায়ের কাছ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর পাশে পাশে এই আশ্চর্য সুন্দর নুড়িময় নদীরেখা ধরে হেঁটে যাওয়ার সুযোগ কি জীবনে আর আসবে! আপনি যান অবনীবাবু। এমন জায়গাতে এসে এমন অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতে চাই না আমি।

বেশ। তবে আমি যাই।

বলে, অবনী বড় বড় পা ফেলে যে পথে এসেছিল সেই পথেই ফিরে গেল।

অবনী ঘন বনের মধ্যের পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতেই আকা বলল, আসেন। আমরা আউগ্যাইয়া যাই।

চলুন।

তটিনী বলল, স্বপ্নাদিষ্টর মতন।

পায়ে পায়ে ওরা দুজনে বালি পেরিয়ে নদীর নুড়িময় বুকে এসে দাঁড়াল। রায়ডাক নদীটা একটু এগিয়েই সুন্দর একটা বাঁক নিয়ে মিলেয়ে গেছে বনের মধ্যে। পীপিং-এর দিকে গেছে নদী। ওরা আরও কিছুটা গিয়ে জলের পাশে দাঁড়াল। তারপরই সেই সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে গিয়ে বোবা হয়ে গেল তটিনী। ঠিক এইরকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর সামনে এর আগে কখনওই দাঁড়ায়নি সে।

বেলা পড়ে এসেছে। হালকা কমলারঙা আলোয় হাসছে যেন সাদা নুড়িময় তটভূমি, দ্রুতবেগে ধাবমানা নদী, পেছনের গভীর জঙ্গলাবৃত উঁচু পাহাড়শ্রেণী, ভুটান হিমালয়ের। আর ওদের পেছনেও গভীর জঙ্গল, হরজাই গাছের। গভীর বললেও সব বলা হয় না। বলতে হয় নিশ্ছিদ্র। কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু জলের শব্দ আর জলের উপরে হাওয়ার শব্দ ছাড়া। পীপিং-এর দিক থেকে হাওয়াতে সাদা সাদা কী যেন উড়ে আসছে আলতো হয়ে। তারপর নদীর জলে এসে পড়ছে। তারপর নদী তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দ্রুতবেগে। নদীতে, ভাঁটিতে দু-তিনটি ছোট্ট প্রপাত, এই এক কোমর বা এক মানুষ মতন হবে। তাতেই প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। কাছে গেলে, ভাল করে দেখা যাবে। শব্দও নিশ্চয়ই আরও অনেক জোর হবে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতন দাঁড়িয়ে রইল তটিনী সেই ভুটান-কন্যা ত্রস্ত তটিনীর দিকে চেয়ে। তার নিজের শরীরে মনেও এমন আগলখোলা বিবসনা হয়ে দৌড়ে যাবার এক তাগিদ অনুভব করল যেন ও। তার পাশেই দাঁড়িয়ে শালপ্রাংশু এক আদিম পুরুষ। ভান-ভণ্ডামিহীন, তথাকথিত শিক্ষাহীন। খাঁটি, ভণ্ডামিহীন একজন মানুষ। "আদিম"-এর মতন আদিম। সেই মানুষটা তাকে ভালবাসে। খুবই ভালবাসে। জানে তটিনী। তার আদম-এর পাশে দাঁড়িয়ে তারও "ঈভ" হয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। আদম আর ঈভ-এর মতন নগ্ন হয়ে এই সমুখের বয়ে যাওয়া নৃত্যরতা আদিম তটিনীর মধ্যে অবগাহন স্নান করতে ইচ্ছে করছিল খুব। ইচ্ছে করছিল, এই পাহাড়ের মতন বিরাট এবং পাহাড়ের মতন বিরাট এবং পাহাড়ের মতন সরল, মহীরুহর মতন নীরব আকাতরুকে সমর্পণ করে দেয়

নিজেকে। সে নিজে প্রকৃতি বলেই পুরুষের মধ্যে, যথার্থ পুরুষের মধ্যে লীন হয়ে যেতে, এই পরম লগ্নে এই গোধূলি লগনে ভারী ইচ্ছা করল ওর।

শব্দটি বোধ হয় ইচ্ছে নয়। তার চেয়েও তীব্রতর, তীব্রতম কিছু। একেই কি কাম বলে? কে জানে! ঋতুমতী হবার পর থেকে পুরুষের কাম-এর শিকার হয়েছে ও ঠিকই কিন্তু নিজের ভিতরের কাম-এর উপস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণই অনবহিত ছিল এতগুলো বছর। অন্য দশজন মেয়ের মতন সেই শালীন, সভ্য এবং চাপা ছিল তার শরীরী অভিব্যক্তিতে। তার ভিতরে এই অনুভূতিও যে এমন তীব্রভাবে উপস্থিত ছিল তা এই মুহূর্তের আগে ও জানেনি।

আকাতরু কোনো আদিম আদিবাসী শিমুলের মতন তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। না। বহমান রায়ডাকের দিকে চেয়ে নয়। বহমান ভুটান-দুহিতার দিকে চেয়ে নয়, অনড় দাঁড়িয়ে থাকা, কনে-দেখা আলোর মধ্যে চাঁপারঙা শাড়ি আর লালরঙা ব্লাউজ-পরা তটিনীর দিকে, সেই আশ্চর্য অবিশ্বাস্য সুন্দর পটভূমিতে। কম-কথা-বলা আকাতরু যেন না বলে বলছিল, চলেন। জামাকাপড় সব খুইল্যা ফ্যালাইয়া আমরা দুজনে এই নদীতে চান করি। এখানে আমাগো দ্যাখনের কেউই নেই। আকাশ আর বাতাস আর পাহাড় আর জঙ্গল আর নদী ছাড়া আমাদের দেখার মতন কোনো নোংরা চোখই নাই। আইস্যেন! আইস্যেন!

তটিনী চুপ করেই ছিল। যেমন আকাতরুও। কিন্তু মুখে চুপ করে থাকলে কী হয়! প্রত্যেক মানুষই সারা জীবনে মুখ দিয়ে আর কটি কথা বলে! যত কথা, তার অধিকাংশই তো বলে চোখ দিয়ে নয়ত মনে মনে। এই সরল সত্যটি বোঝেন কজনে?

অনেকক্ষণ পরে তটিনী বলল, এগুলো কি?

কোন গুলান?

ঐ যে উড়ে উড়ে আসছে হাওয়ায় ভেসে, সাদা প্রজাপতির মতন? জলে গিয়ে পড়ে ভেসে যাচ্ছে। ওগুলো কি প্রজাপতি?

না। তবে ঐরকমই। ওগুলান শিমুল তুলা। বীজ ফাইট্যা বাহির হইয়াই হাওয়ায় ভাইস্যা আসতেছে।

বাঃ।

বলে উঠল তটিনী।

শিমুল তুলোর লেপ তোষক বালিশ সে ব্যবহার করেছে কিন্তু কখনও বীজ-ফাটা তুলো দেখেনি। কী সুন্দর! ওর ইচ্ছে করল ও নিজের ভিতরের বীজ থেকে ফুটে, ফেটে বেরিয়ে এমন হাওয়াতে ভেসে ভেসে কোনো দ্রুতধাবমনা

নদীতে আছড়ে পড়ে ভেসে যায়, নদী যেদিকে নিয়ে যায় সেই দিকে।

ইচ্ছা করল। ইচ্ছেই। জীবনে কত কীই তো ইচ্ছে করল এ পর্যন্ত কিন্তু কটি ইচ্ছেই বা পূরিত হলো? হবে? পরক্ষণেই ভাবল, ওর একারই এমন দুঃখ নয়, হয়ত সব মানুষেরই এমনই মনে হয়। এক মানুষের বুকের কষ্ট অন্য মানুষ বোঝে কই? কজন বোঝে?

আকাতরুর চোখে তাকিয়ে তটিনী বুঝতে পারল ওর বুকের মধ্যে কি হচ্ছে এখন, কী বলতে চাইছে ও তটিনীকে। কিন্তু ও তো কথার কারিগর নয়। কথা দিয়ে যে চতুরেরা কথার মালা গাঁথে, আকাতরু তো সেই মৃদুলদের মতন কথাসার মানুষ নয়। সে যে খাঁটি। সে যে সরল। তার দুঃখর কথা সে নিজমুখে প্রকাশ করতে পারবে না কোনোদিনই। কিন্তু তটিনী বুঝেছে তার কথা।

কিন্তু বুঝলে কি হবে? যা কিছুই জীবনে চাওয়া যায় তাই কি পাওয়া যায়? যা চাওয়া যায় তার কতটুকু পাওয়া যায়? ওরা গুহাবাসী মানুষ হলে, ভাল্লুক-ভাল্লুকী হলে আকাতরু যা চায় তা দিয়ে এই পাহাড়েরই কোনো গুহাতে বা প্রস্তরাশ্রয়ে আদিম অনাবৃত মানুষের মতন বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু অনাবৃত মানুষ তার শরীরকে পরতে পরতে অন্তর্বাস-এ আর নানা পোশাকে আবৃত করার সঙ্গে সঙ্গে তার আগলমুক্ত মনকেও যে আগল-তোলা ঘরে ঢুকিয়েছে। তার শরীরের পোশাকের ভারের চেয়ে তার মনের ভূষণের ভার কিছু কম নয়। আধুনিক মানুষ বা মানুষী যেমন এই উন্মুক্ত জায়গাতে সহজে তার শরীরকে অনাবৃত করতে পারে না, তেমনই পারে না তার মনকে নিবারণ করতে কোথাওই। সভ্যতা, এই লক্ষ লক্ষ বছরের অভ্যেস তাকে শরীরে মনে বড়ই ভারী করে তুলেছে, যাত্রাদলের নায়ক-নায়িকাদের মতন অনেক রাংতা আর জরি আর গর্জন তেল-এর ভারে সে নুব্জ হয়ে গেছে শরীরে মনে। আলোয় ফেরা, সারল্যে ফেরা তার পক্ষে ভারী কঠিন। আকাকে তার এই জন্যে এত ভাল লেগেছে। সে এই আধুনিক মানসিকতার মানুষদের থেকে এখনও বহু দূরে আছে। আকাশ, মাটি, নদী, পাহাড়ের খুবই কাছাকাছি। যত কাছাকাছি বহু শত মাইল পেছনে হেঁটেও তটিনী পৌঁছতে পারবে না।

আকাতরু হঠাৎ তটিনীর স্বপ্নভঙ্গ তার নিথর ভাবনার জাল ছিঁড়ে দিয়ে বলল, চলেন। আউগ্যাই গিয়া। অন্ধকার হইলে ত অনেকেই বিপদ।

তটিনী অস্ফুটে বলল, হুঁ।

মনে মনে বলল, এখনই বা বিপদ কম কি? মানুষের নিজের কাছ থেকে যত বিপদ, তত বিপদ কোনোদিনও অন্যের কাছ থেকে আশংকার ছিল না।

এটা কি?

একটু এগিয়েই তটিনী বলল বালির দিকে তাকিয়ে। আকাতরু ঝুঁকে পড়ে দেখল এক সেকেন্ড। তারপর বলল, চলেন। ইটা কিছু না। বাঘ জল খাইয়া ফিইর‍্যা গেছে জঙ্গলে।

বাঘ! তবু কিছু না?

অবাক হলো তটিনী।

বলল, কতক্ষণ আগে গেছে?

দু-তিন দিন আগের দাগ। ছাঁচ ভাইঙ্গা গেছে গিয়া।

বাঘ না বাঘিনী?

খাড়ান এক সেকেন্ড।

তারপরে ভাল করে দেখে বলল, বাঘিনী। আমাগো পেছনের জঙ্গল থিক্যাই আইছিল আবার সিখানেই ফিরৎ গ্যাছে গিয়া। সামনের পাহাড়টা যেমন খাড়া উঠছে, কোনো জানোয়ার তেমন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া খামাখা উঁটায় উঠব নামব বইল্যা মনে হয় না।

আলো ক্রমশই কমে আসছে এবং খুবই তাড়াতাড়ি। এমন সময়ে ওদের বাঁ পাশ থেকে, পাহাড়ের গা থেকে হাতির বৃংহণ ভেসে এল। চমকে উঠল ভয়ে, তটিনী।

আকাতরু বলল, ও কিছু না। জলে নামব ওরা।

একজোড়া মস্ত বড় সাদা-কালো হাঁস উড়ে আসছিল সামনে থেকে। পীপিং-এর দিকে উড়ে যাচ্ছে ওরা।

এত বড় আর এত সুন্দর কী হাঁস এগুলো? তটিনী শুধোল, চোখ দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সোনালি বিধুর আলোতে ওদের মসৃণ ছন্দোবদ্ধ ডানার কাঁপান দেখা যায়, ততক্ষণ তা দেখে।

এগুলান সাধারণ হাঁস না যে। এগুলান হইল গিয়া ভারী দুইস্প্রাপ্য হাঁস। উড-ডাক। এই হাঁস রাতের বেলা ত বটেই, দিনের বেলাতেও ইচ্ছা হইলে গাছে চইড়া বইস্যা থাকে। সচরাচর জলের পাখি জঙ্গলের মধ্যের গাছে বসে না, এক পানকৌড়ি-মানকৌড়ি ছাড়া। তাও সি সব পাখিও জলের আনাচ কানাচেই থাকে। আপনার ভাগ্য ভাল যে, উড-ডাক-এর দর্শন পাইল্যেন।

পাখিরা অদৃশ্য হলে ওরা আবার পা বাড়াল। আর ক'পা গিয়েই আবার বালির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল তটিনী।

বলল, এটা কিসের পায়ের ছাপ?

কোনটা? অ। ইটা? ইটা চিতাবাঘের। ঐ জল খাইতে আইছিল। ওঃ। এ ব্যাটা মিনিট পনেরো আগেই ফিরছে জল খাইয়া। দ্যাখতাছেন না বালি এখনও ভিজা।

বলেই, আকাতরু নদীর বুকে হাঁটু গেড়ে বসে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখল দাগটাকে, বোঝার জন্যে যে, কতখানি আগে গেছে সে চিতাবাঘ। এবারে ওরা সেই প্রপাত দুটোর কাছে চলে এসেছে। এত যে আওয়াজ তা দূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল না। হাওয়াটাও যেন সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে আরও জোর হয়েছে। অন্ধকারও হয়ে আসছে দ্রুত। ভুটানঘাটের বাংলো তো এখনও অনেক দূরে। এই নদীর প্রপাতের পাশে দাঁড়িয়ে তড়িদাহত হওয়ারই মতন প্রকৃতিহত হয়ে গেল তটিনী। এতো মুগ্ধ সে কোনো কিছু দেখেই এর আগে হয়নি আর ওর জীবনে।

আকাতরু ওর চার হাত দূরে দাঁড়িয়ে ওকে কি যেন বলল। বারেবারে বলল। প্রপাতের আওয়াজ আর হাওয়ার বেগ উড়িয়ে নিল সেই কথাকে। শুনতে পেল না তটিনী।

আকাতরু আবারও বলল, এবার দৃশ্যত গলা তুলে। কিন্তু দৃশ্যতই। কানে তার কথা সেবারেও শোনা গেল না।

তটিনীর মনে হলো আকাতরুর কথাগুলোও বীজ-ফাটা শিমুল তুলোরই মতন উড়ে গিয়ে নদীতে পড়ে ভেসে গেল। আর তাদের ফেরানো যাবে না।

তটিনী পা দুটি শক্ত করে নুড়ি আর বালির মধ্যে পুঁতে দিয়ে গলা তুলে চেঁচিয়ে বলল, যা বলার তা কাছে এসে বলুন।

হাওয়া ওর চুলগুলো, ওর বুকের আঁচল, ওর শাড়ির পায়ের দিকে উথাল-পাথাল করছিল। ওর বুকের মধ্যেও প্রপাত ঝরছিল।

তটিনী বলল, কাছে আসুন। কাছে এসো। আরও কাছে। আমার আকাতরু, প্রাচীন, আদিম, অকৃত্রিম আকাতরু। তুমি কি চাও তা আমি জানি। বারেবার চেয়ে নিজেকে ছোট করার দরকার নেই। তুমি আমাকে চিরদিনের করে পাবে না। পাওয়া সম্ভব নয় বলে। এই নির্জনতা, এই সৌন্দর্য যে আমার জন্যে নয়। চড়া মেক-আপ নিয়ে অনেক হাজার ওয়াটের আলো মুখে নিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাজার পুরুষের মনোরঞ্জনই যে আমার জীবন। সেই উচ্চরবের তীব্র আলোর জীবন যে আমার ধমনীতে মিশে গেছে আকা। সেই জীবনে তুমি সম্পূর্ণ বেমানান হবে। এই উড-ডাক হাঁসেদেরই মতন। বন্যেরা বনেই সুন্দর। তোমাকে যা দিতে পারব না তা চেয়ে নিজেকে ছোট কোরো না। যা দিতে পারি, তা দিতে কার্পণ্য করব না। নাও নাও, তুমি আমাকে নাও। এই নদীচরে, এই নির্জনে,

ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে। তোমরা পুরুষেরা, যা মেয়েদের সবচেয়ে দামী বলে মনে করো তাই তোমাকে দেব আজ। তোমরা সকলেই এ বাবদে সমান। কী মৃদুলবাবু, কী চানু রায় আর কী তুমি। আমাদের কাছে কিসের দাম সবচেয়ে বেশি তা তোমরা কেউই বুঝলে না কোনোদিনও। বুঝবেও না।

তারপর, মনে মনে বলল, হয়ত বোঝে, বুঝবে কেউ কেউ। বুঝবে কেউ। সে যতদিন না আসে আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে তার জন্যে আকাতরু। যা পেলে তুমি খুশি হও, তাই নাও। এই বালিশয্যায়, আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে, নদীর গান শুনতে শুনতে তুমি আমাকে নিঃশেষে পাও যে "নিঃশেষে" তোমাদের বিশ্বাস। সেই মিথ্যে বিশ্বাসের কথা মনে করে আমি বড় বড় নিঃশ্বাস নেবো। নাও আকা, তুমি নাও, আমাকে চেটেপুটে খাও। এই একটি সন্ধ্যের জন্যে, একটিবারের জন্যে আমি তোমার। কিন্তু এরপর, অন্য দশজন মানুষেরই মতন একবার বিস্কুট খেতে দিয়ে লোভী-করে-তোলা নেড়ি কুত্তার মতন আমার পিছনে পিছনে ঘুরো না। তুমি অন্যরকম হয়ো আকাতরু। তুমি তুমিই। তুমি আকাতরু। মহীরূহ। তুমি ঝোপঝাড় বিচুটি হয়ো না।

আমাদের মত লজ্জাবতীরা চিরদিনই আকাতরুদের দিকেই চেয়ে থেকে জীবন কাটিয়েছে। তাদের জীবনে পাক আর নাই পাক।

এসো, আকাতরু, এসো। আমাকে গ্রহণ করো। এই নদীতীরে, আমার এই অপবিত্র শরীরকে তুমি মন্দিরের মতো পবিত্র করে দাও। দাও, দাও, তোমার অকলুষ পরশে।

প্রত্যানীত

তামা নদীটা যেখানে গঙ্গাধর নদীর বুকে এসে পড়েছে, আর ফাল্গুনের শুখা তাকে দয়িতের সঙ্গে মিলতে না দিয়ে একটি দহ মতন সৃষ্টি করে তাকে বিরহ যাতনাতে ক্লিষ্ট করেছে, ঠিক সেইখানেই দাঁড়িয়েছিল দীপ। তামা নদীর বিরহর জ্বালাই যেন রাশ রাশ মাদার ফুল হয়ে নদীপারের পাতা-ঝরা হরজাই বনে ফুটে রয়েছে। এখন থাকবে কিছুদিন। মাঝে মাঝে বাঁশবন। গরু চরছে একরামুদ্দিন মিঞার। গোয়ালে ফেরার সময় হলো তাদের।

একটা একলা গো-বক তার খয়েরি-রঙা ডানা মেলে কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করতে না পেরে গঁক-গঁক-গঁক শব্দ করে মোনো-সীলেবল-এ তার বুকের কষ্টটা তামা নদীর বুকের কষ্টের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে।

ধু ধু চর ফেলা এবং একটি মস্ত বাঁক নেওয়া গঙ্গাধর নদীর পারের মস্ত বটগাছের তলায় বসে রাখাল-বাগাল গোয়ালপাড়িয়া গান গাইছে। গান গাইছে তার প্রেমিকার কথা মনে করে, গলা ছেড়ে।

কে জানে।

দীপের মতন তার কোনো প্রেমিকা আদৌ আছে কি না। এই সন্ধ্যেই হয়তো তার প্রেমিকা। প্রতি দিন-রাতের অনেকই মুহূর্ত থাকে যখন প্রত্যেক একলা নারী এবং পুরুষের মনই বিবাগী হয়ে যায়। এই বৈরাগ্য কিন্তু দূরে যাবার জন্যে নয়, কারো কাছে আসারই জন্যে। বুকের কাছে, খুবই কাছে।

সে গান গাইছে তো গাইছেই। বড়ই লম্বা গান। তবে ছাওয়ালের গলাখানা ফাস-কেলাস। কিন্তু এ গান শুনে মন যেন গঙ্গাধরের চরেরই মতন বিবাগী হয়ে

ওঠে। রাখাল গাইলে, সে জায়গা ছেড়ে পা আর নড়ে না কারোই।

"প্রেম জানে না রসিক কালাচান্দ
কালা ঝুরিয়া থাকে মন
আর কতদিনে হব বন্ধু দরিশন, বন্ধুরে।

অ বন্ধুরে তোমার বাড়ি আমার বাড়ি
যাওয়া আইসা অনেক দেরি
যাব কি রব কি সগায় করে মানা
হাটিয়া গেইতে নদীর পানি
খাপলাং কী খুপলুং
কী খালাউ খালাউ করে রে
হায় হায় পরাণের বন্ধুরে।

অ বন্ধুরে তোমার আশায় বসিয়া আছং
বটবৃক্ষের তলে।
ভাদর মাসিয়া দেওরার ঝরি
টিপ্পিস কি টাপ্পাস
কী ঝম ঝমেয়া পড়ে রে
হায় হায় পরাণের বন্ধুরে।

অ বন্ধুরে একলা ঘরে শুইয়া থাকং
পালঙ্গের উপরে
মন মোর উরাং বহিরার করে
কট ঘুরিতে মরার পালং
কেরবেত কী কুবরুত
কি কাবাও কাবাও করে রে
হায় হায় পরাণের বন্ধুরে।।"

গান শেষ হলে দীপও পা বাড়াল বাড়ির দিকে। সে যে কেন এমন উদ্দেশ্যহীনভাবে নদীপারে এসেছিল এই ফাল্গুনের রুখু-লাগা বিকেলে, তা ও নিজেও জানে না। সেও যদি রাখালের মতন গান গেয়ে নিজের কথা আকাশকে, বাতাসকে, নদীকে বলে মনের ভার একটু হালকা করতে পারত।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। গঙ্গাধর নদীর উপরের আকাশে গেরুয়া রঙ লেগেছে। বৈষ্ণব-গেরুয়া। এক ঝাঁক পরিযায়ী হাঁস ডিঙ্গডিঙ্গার মরনাই চা-বাগানের দিক থেকে উড়ে আসছে দুলতে দুলতে মালার মতন। হয়তো তারা ওমা রেঞ্জের গভীরের কোনো জলাভূমি থেকে আসছে। ঠিক জানে না দীপ। তারা চর-ফেলা আঁকাবাঁকা নদীর বিধুর আঁচলের বুক তাদের ডানার সপাসপ শব্দে চমকে দিয়ে শিমুল বনের দিকে উড়ে গেলো।

মাদারের বনে ফুল এসেছে। তিব্বতী লামাদের বসনের রঙের মতন লাল ফুল ভরে গেছে গাছে গাছে। এই মাদারের ফুলেরাও একধরনের আকাশমণি বা সূর্যমুখী। এরা এদের মুখ আদৌ আনত করে না পৃথিবীর দিকে। ঋজু, আকাশমুখো হয়ে, আদ্যিকালের প্রতিষ্ঠান মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে হেলায় যেন অপ্রমাণ করে এরা।

ভাল লাগে দীপের।

নদীপারের হরজাই বনে একটা হাওয়া ওঠে। তার পায়ে পায়ে, নূপুরের মতনই, কিন্তু তাতে ঝুনুঝুনু নয়, ঝুরুঝুরু শব্দ ওঠে একটা। নারীর চুলের মতন বিস্রস্ত হয়ে যায় ঘন-বুনোটের বন।

পরমুহূর্তেই হাওয়াটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চাপা স্বগতোক্তি করেই কোনো ভিখিরি বুড়ির মতনই মরে যায়। গাছেরা টানটান হয়ে দাঁড়ায়, যেন অ্যাটেনশানেই; কোনো অদৃশ্য সেনানায়কের নির্দেশের অপেক্ষায়।

একটু পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। আজ ঈদ। শুক্লপক্ষ। একুশে ফেব্রুয়ারি। এখনই না উঠলে অন্ধকারে বাড়ি পৌঁছতে অসুবিধে হবে। ভাবল দীপ।

এমনিতে কোনো অসুবিধে নেই। কিন্তু গরম পড়ছে। সাপকোপ-এর ভয় আছে। যদিও দীপ মিত্রর জীবনের দাম বিশেষ নেই, অন্যের কাছে বা তার নিজের কাছেও, তবুও হয়তো নিছক অভ্যেসবশেই মাঝে মাঝে বড় বাঁচতে ইচ্ছে করে। এই বাঁচার ইচ্ছেটা, ওর মতন সর্বার্থে এক অপদার্থের পক্ষে বড়ই হাস্যকর যে, তা ও জানে। কিন্তু বাঁচার ইচ্ছা যতই হাস্যকর হোক না কেন, সব মানুষই এই দুর্মর রোগে ভোগে।

দীপ, নানা কারণে ঘেন্না করে নিজেকে, আবার ভালও বাসে। যদিও জানে যে, এই ঘৃণাটা করা উচিত সমাজকে, সমাজব্যবস্থাকে, যারা এবং যে-ব্যবস্থা ওর মতন নির্বিরোধী, টগবগে, উচ্চাশাসম্পন্ন একজন যুবকের মনের মধ্যে এমন অস্থিরতা এবং অবসাদ এনেছে। কিন্তু এই সমাজ, এই ব্যবস্থাটা তো কোনো মানুষ বা প্রাণী নয়, এমনকি একটা গাছও নয় যে, ও ইচ্ছে করলেই ওর একক

চেষ্টাতে কেটে ফেলবে কুড়ুল দিয়ে।

তামাহাটে ওদের বাড়ির দিকে আসতে আসতে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাতে শিক্ষিত না হলেও উচ্চশিক্ষিত এবং চিন্তাভাবনাতে অত্যাধুনিক দীপ ভাবছিল যে ওর বাবার কথা শুনে, চাষ-বাস করলেই হয়তো ভাল করত। জমি-জমা ওদের নেহাৎ কম নেই। তাছাড়া, এখানের অনেকেই তো, পাটের ব্যবসা উঠে যাওয়ার পরে চাষবাস নিয়েই সংসার চালিয়ে নেন। সচ্ছল না হলেও অভাবও নেই কোনো তাদের।

কেন যে ও গৌরীপুরে পড়াশুনো করতে গেলো! আর কেনই যে সাহিত্য পড়তে গেলো! কেন যে মাদারকে এমন করে ভালবাসল! সমস্ত জীবনটাই দীপের ভুলে ভরা। মাদারের গর্বের রঙ ঐ মাদার ফুলেরই মতন। ও জানে যে কোনোদিনও পাবে না মাদারকে। তবু...

ভুল, ভুল, সবই ভুল!

নদীপারের তিনকড়ি মিত্র হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল-এর পাশের পায়ে-হাঁটা পথ বেয়ে তামাহাটের মোড়ে এসে পৌঁছে দোকানঘরগুলোর আলোতে চোখ যেন আরওই ধেঁধে গেলো।

এমন সময়ে অন্ধকারে প্রায় মাটি ফুঁড়ে উঠে হামিদ ওর হাত ধরে বলল, কী রে! তোর হইছেটা কি ক' ত? আলি না ক্যান রে? আম্মা তর লাইগ্যা বইস্যা আছে। চল চল।

লজ্জিত হলো দীপ। সত্যিই তো! হামিদের আম্মা ফতিমা বিবি, দীপ-এর মাসিমাকে তো ও নিজেই বলেছিল। মাসিমা ওকে ঈদের দিনে লংক্লথের পায়জামা-পাঞ্জাবিও দেন প্রতি বছর। ওর লজ্জা করে। বদলে কিছুই তো ও দিতে পারে না! এবারেও সেই আন্তরিক দাওয়াতের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। অথচ কী যে হয়ে যায় দীপের আজকাল। মাদারের বিরক্ত মুখটার কথা বারবারই মনে পড়ে যায়।

হামিদ বলল, তগো বাড়ি গিয়া মাসিমাকে জিগাইলাম। তা তিনি ত কইবার পারলেন না তুই কোন চুলায় গ্যাছস। তবে আমি ঠিকই বুঝছিলাম কোথায় গ্যাছস।

কোথায়? আর কী করে? বুঝলি কী করে?

মাদার বনে। মাদারের ফুল ফুটছে, যা না! ঈরে! ইনসাল্লা। এরশাদ। এরশাদ। চাইরধারে চোখ চাওন যায় নারে হালা। আহা! মন কয়, যেন জন্নাত নাইম্যা আইছে নিচোত।

কোন জন্নাত? তোদের স্বর্গের, মানে, জন্নাতের আবার অনেক রকম হয়তো।

হয়ইতো!

বলেই বলল, জন্নাতুল ফিরদৌস, জন্নাতুল মোয়াল্লা, জন্নাতুল নাঈম, জন্নাতুল মাবা।

বলেই বলল, আরও আছে। বোধ করি, আম্মী কইবার পারে সবগুলানের নাম। তবে মাদারের মতন জন্নাত আর নাই। যাই ক' তুই দীপ। ভাব ভাব মাদারের ফুল।

দীপের মনটা ভাল নেই। ভাল থাকে না আজকাল। অন্যসময় হলে প্রতিবাদ করত হয়তো। হয়তো ঝগড়াও হয়ে যেত। কিন্তু এখন উচ্চবাচ্য করল না। তাছাড়া আজকে ঈদের দিন। ভালোবাসার দিন। ঝগড়ার নয়।

প্রতিবাদী হতেও যতটুকু জোরের, মনোবলের এবং উদ্যোগের প্রয়োজন হয় তা জড়ো করার মতন জোর এই বসন্তকে পথ-দেখানো সন্ধ্যেতে দীপ নিজের মধ্যে জড়ো করে উঠতে পারল না। তাছাড়া, হামিদ তার বন্ধুই শুধু নয়, তার হিতার্থীও। ডিঙ্গিডিঙ্গার মাদার নাম্নী মেয়েটিকে যে দীপ ভালবেসে ফেলেছে তা হামিদ বিলক্ষণই জানে। যদিও দীপের সেই বিফল ভালবাসাতে হামিদ কোনো মদতও দেয় না আবার তার সক্রিয় বিরোধিতাও করে না। দীপের মনে হয়, হামিদের স্বভাবটা যেন অনেকটা তামাহাটের এই গঙ্গাধর নদীরই মতন। নিজের মনেই সে বয়ে চলে। তার দু'পারের কোনো ঘটনার ঘনঘটাই তাকে ছোঁয় না। আলোড়িত করে না। অথচ হামিদের মধ্যে নদীরই মতন একটা অঘটন-ঘটন-পটিয়সী ক্ষমতা আছে।

হামিদের পূর্বপুরুষেরা চরুয়া ছিল। এই অঞ্চলের মানুষেরা যাদের বলেন, ভাটিয়া মুসলমান। তাই ওর রক্তে প্রচণ্ড রাগ যেমন আছে, রক্তের মধ্যে চর-ফেলা নদীর খামখেয়ালিপনাবাহী জলও বোধহয় কিছু মিশে আছে। কখন যে হামিদ কোন দিকে বাঁক নেয়, কোথায় চর ফেলে আর কোথায় পাড় ভাঙে, তা সে নিজেও জানে না। সে-কারণেই হামিদ ওর বন্ধু হলেও, ওর হিতার্থী হলেও, দীপ ওকে সমীহ করে চলে। সম্ভবত ভয়ও পায়। যদিও সেই ভয়ের কথা কখনও মুখে বা চোখে প্রকাশ করে না বা করেনি হামিদের কাছে।

হামিদের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দীপ বলল, তুই আউগাইয়া যা। আমি হাত-মুখ ধুইয়া আর মা'রে একবার কয়্যাই আসতাছি।

ক্যান? আমাগো বাড়ি কি ইন্দারা নাই নাহি? না একখান গামছাও নাই তর

হাত মুখ পোছনের লইগ্যা?

না রে। হে কথা নয়। মা'রে কইয়াই আসুমানে। দেখিস। দৌড়াইয়া যাম্যু আর আম্যু। দেইখ্যা লইস। জানিসই ত! মায়ে আমার নাই-চিন্তার রানী!

তা ত আইবই। ছোট্ট পোলা যে তুই! আমাগো আট ভাইয়ের মধ্যে কারে কুমীরে লইল আর কারে বাঘে খাইল হে লইয়া আমার আম্মার কুনোই মাথাব্যথা নাই।

হ। তাই ত! নিমকহারাম আছস তুই বড়। মাসিমা সর্বদাই হামিদ হামিদ করেন আমি দেখি নাই য্যান। থো তোর মিথ্যাকাহন।

দীপ আর কথা না বাড়িয়ে বলল, যা তুই আউগাইয়া যা। আমি যাম্যু আর আম্যু।

হামিদ এবারে এগিয়ে গেলো। শুক্লপক্ষের সন্ধ্যায় ডিঙ্গডিঙ্গার পথে যেন মুছে গেলো সে অকস্মাৎ।

হাটের পাশ দিয়ে গিয়ে দীপ গদিঘরের পাশের চ্যাগারের ছোট দরজা দিয়ে ঘুরে গদিঘরের পাশ দিয়ে ভিতর-বাড়িতে ঢুকল।

সন্ধ্যের পরে পরেই এই ফাল্গুনে গাছগাছালিরা কেমন যেন গন্ধ ছাড়ে একটা তাদের গা-মাথা, হাত-পা, পাতা-পুতা থেকে। একটা মিশ্র গন্ধ। সকলে সে গন্ধ পায় কি-না তা দীপ বলতে পারবে না। কিন্তু সে পায়। যেমন পায়, মাদারের গা থেকে, বগলতলি থেকে। ও একটা গন্ধ-গোকুল। গন্ধময় ওর জগৎ, শব্দময়ও বটে। আর বর্ণময় তো অবশ্যই!

কামরাঙা গাছটা মস্ত বড় হয়ে গেছে। জলপাই গাছটাও। কৃষ্ণপক্ষের রাতেই যেন তাদের এই কিশোরী শরীরের বাড়ের মতন বাড়টা তারকাখচিত আকাশের পটভূমিতে বেশি করে চেখে পড়ে। কেন, জানে না দীপ।

নীহার শিবমন্দিরের মধ্যে মূর্তির সামনে বসেছিলেন। সামনে গৌরীপুরের কাছের আশারিকান্দি থেকে ফরমাশ দিয়ে বানানো মস্ত পিদিমদানে রেড়ির তেলের পিদিম জ্বলছে বারোটি। শীর্ণ কিন্তু জ্যোতির্ময়ী কটি উজ্জ্বল দীপশিখারই মতন দেখাচ্ছে দীপের মা নীহারকে।

মাকে আড়াল থেকে দেখতে ভারী ভালবাসে দীপ কিন্তু মা ঠিকই বুঝে ফেলেন যে দীপ তাঁকে দেখছে।

কে জানে! হয়তো সব নারীরাই বোঝেন।

কিন্তু যখন পুজোতে বসেন নীহার তখন তাঁর কোনোই বাহ্যজ্ঞান থাকে না। অনেকক্ষণ ধরে দীপ পিদিমদানের বারো পিদিম-এর উজ্জ্বল আলোর

পটভূমিতে তার বৃদ্ধা মায়ের নিষ্কম্প শিল্যুটটি দেখল। বাইরে এমন উথাল-পাথাল হাওয়া অথচ আশ্চর্য, এই ছোট্ট শিবমন্দিরের অভ্যন্তরে হাওয়ার রেশমাত্র নেই।

হঠাৎ নীহার মুখ না ঘুরিয়েই বললেন, দীপ এলি?

হ্যাঁ, মা।

কোথায় থাকিস যে সারাদিন! চানু এসেছিল। চখা নাকি আসছে কলকাতা থেকে। আগামীকাল নাকি ধুবড়িতে প্রথম বইমেলা হবে। তাই উদ্বোধন করতে আসছে চখা অন্য আরেকজন লেখকের সঙ্গে।

অন্য লেখক কে?

তা জানি না। আমাদের জেনে লাভই বা কি! তবে চানু বলছিল যে দু-তিন জনের আসার কথা আছে।

আসছে কোথা থেকে? ধুবড়ি?

আরে না না। কলকাতা থেকে আসছে প্লেনে। বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিয়ে মেলা কর্তৃপক্ষই ওকে তামাহাটেই পৌঁছে দেবেন। তারপর আগামীকাল আবার বিকেলে এসে নিয়ে যাবেন ধুবড়ি। বইমেলা তো ধুবড়িতেই! এই নাকি প্রথম হচ্ছে বইমেলা ধুবড়িতে। শুধু বাংলা বইয়েরই মেলা নয় রে, বাংলা, অসমিয়া এবং ইংরেজি বইও থাকবে। তবে আমার মনে হয়, মেলার নাম দেওয়া উচিত ছিল গ্রন্থমেলা। অসমিয়া ভাষাতে "বই" বলে তো কোনো শব্দ নেই।

ভাল। ধুবড়িতে যে কত শিক্ষিত বাঙালি ও অহমিয়ারা থাকেন, তাঁদের খোঁজ আর কে রাখেন। কলকাতার খবরের কাগজগুলো তো মাঝে মাঝে ব্রহ্মপুত্রে বন্যার খবর ছেপেই ধন্য করে ধুবড়ি শহরকে। আর কী!

তা ঠিক। কাগজগুলোর এমনই রকম। যেন ধুবড়ি বলে কোনো জায়গার অস্তিত্বই নেই।

তারপরেই কথা ঘুরিয়ে বলল, চখাদা সত্যিই এখানে আসবেন? বল কি মা? কতদিন পরে আসবেন?

তা প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর হবে। তোর জন্মের বছর পনেরো আগে শেষ এসেছিল। তখন কড়ি ছিল এখানে। ঝন্টু আর বাপ্পুও এসেছিল কুচবিহারের হোস্টেল থেকে ছুটিতে। তখন তোর বাবা তো বটেই জ্যাঠাবাবুও বেঁচে। যাই হোক, এখন চখার নাম-ডাক হয়েছে। চখা চক্রবর্তী বললেই চোখা-চোখা মানুষও এক ডাকে চেনে। সে যে অতীতকে ভুলে যায়নি, তার এই প্রাচীন

পিসিমার কাছে এক রাতের জন্যে হলেও যে, তামাহাটে সে আসছে, এটাই আনন্দের কথা।

তা আসছেনই যদি তো এত দেরি করে খবর পাঠালেন কেন?

তারপর নীহার বললেন, চখার নাকি আসার ঠিক ছিল না। ব্যাঙ্গালোর না ম্যাড্রাস কোথায় যেন গেছিল। শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলেই খবর দিতে এত দেরি হলো।

তোমাকে খবর দিল কে?

চানু।

চানুদাকেই বা এ খবর দিল কে? মিথ্যে খবর নয় তো?

মিথ্যে খবর দিয়ে কার লাভ? তোর যত উদ্ভট চিন্তা। উদ্যোক্তারা ধুবড়িতে রাজাদের ছাতিয়ানতলার বাড়িতে ফোনে খবর দিয়েছেন। রাজাই ধুবড়ি থেকে এখানে মুংগিলালের কাছে ফোন করে দিয়েছিল। চখা বলেই দিয়েছে যে, রাগডোগরাতে নেমে সে তামাহাটেই আসবে। ফোন যখন আসে, চানু তখন সেখানেই বসে গল্প করছিল। দাতুও ছিল। ওরা দুজনে দৌড়ে খবর দিতে এসেছিল। একজনকে পাঠালাম ঘোষের দোকান থেকে গরম রসগোল্লা আনতে, যদি পায়, চখা খুব ভালবাসত।

চখাদা যখন শেষবারে এসেছিল তখনও কি ঘোষের দোকান ছিল?

থাকবে না কেন? গদাই ঘোষের বাবা নিমাই ঘোষ তখন বসত দোকানে। সেও তো ফওত হয়ে গেছে তোর জন্মেরও আগে। বড় ভাল রাবড়ি বানাত নিমাই ঘোষ। আর রসমালাইও। ফকিরাগ্রাম, গোঁসাইগঞ্জ, বক্সির হাট, পাগলা হাট হয়ে মটরঝার, কচুগাঁও থেকেও মানুষে সেই সব কিনতে আসত। রাবড়ি খাওয়ার যম ছিল তোর জ্যাঠাবাবুর বন্ধু রতুবাবু।

মানে, পচার দাদু?

হ্যাঁরে। উনি খুব বড় শিকারীও ছিলেন। টি মডেল ফোর্ড গাড়ি ছিল তাঁর একটা। তোরা সে সব গাড়ি চোখে দেখিসনি। পথেও চলত, মাঠেও চলত। উনি তো হিরো ছিলেন এই অঞ্চলের। আর ছিল আবু ছাত্তার।

আবু ছাত্তারের কথা শুনেছি। শুধু বাঘই মারেনি এন্তার, একদিনে এগারো জন মানুষও মেরেছিল নাকি?

হ্যাঁ। তা মেরেছিল। ফাঁসি হয়ে গেছে মানুষটার। বদরাগী ছিল ঠিকই কিন্তু মানুষ ভাল ছিল। ভালমানুষদের রাগই প্রকাশ পায়। যারা রাগ প্রকাশ করে না, তাদের থেকে দূরে থাকবি।

ঘোষের দোকানে কাকে পাঠিয়েছ?

কথা ঘুরিয়ে বলল দীপ।

নীহার বললেন, দাতুকে।

নীহারের আজকাল এরকমই হয়েছে। এক কথা বারবার বলেন। স্মৃতিশক্তিও চলে গেছে। বয়সও তো প্রায় আশি হলো। তারপর পাঁচ বছরের ব্যবধানে দুই পুত্র বিয়োগে তাঁর মাথাটা সম্ভবত কাজই করে না আর।

আর চানুদাকে?

ডিম যোগাড় করে আনতে। আজ ঈদের দিন। মিঞাদের দোকানপাট সবই তো বন্ধ। তাদের বাড়িতেও কি আর কিছু বাকি আছে! চানু বলল, ওদের বাড়ির এক হাঁসীর নাকি ডিম পাড়ার কথা আজ। দেখুক, যদি থাকে চখার কপালে ডিম খাওয়া।

হেসে ফেলল দীপ সে কথা শুনে। বলল, বাবাঃ! কবে তাদের বাড়ির কোন হাঁসী ডিম পাড়বে সে খবরও রাখে নাকি চানুদা?

তারপরই বলল, শুধুই ডিমের ঝোল খাওয়াবে মা? চখাদাকে?

না রে? ফেনাভাত খাওয়াব। চখা তামাহাটের ফেনাভাতের খুব ভক্ত ছিল। ফেনাভাত, মধ্যে সিম, বাঁধাকপি আর পালংশাক সেদ্ধ। এবং হাঁসের ডিম সেদ্ধ। সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা।

হাঁসের ডিম-এ ক্লোরোস্টাল বাড়ে। বাত হয়।

দীপ বলল।

ছাড়তো! হোক গিয়ে। একদিন খেলে হার্ট-অ্যাটাক হবে না। তোর বাবা নেই, জ্যাঠা নেই, জেঠিমা নেই, যাঁরা সবচেয়ে বেশি আদর করতেন তারাই নেই, আমি অন্তত যেটুকু পারি করব তো! তাছাড়া ছেলেটা থাকবে তো মোটে চব্বিশ ঘণ্টারও কম!

দীপ মনে মনে বলল, ছেলেটাই বটে! বাঙালি মা-মাসি-পিসির চোখে ঘাটের মড়াও ছেলেমানুষ।

নীহার পূজোর আসন থেকে উঠে, আসনটি ভাঁজ করে তুলে রেখে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে বাইরে আসতে আসতেই চানুদা আর দাতু দুজনেই এসে হাজির। চানুদার এক হাতে সার্ফ-এর বাক্সে ডিম আর অন্য হাতে একটা পাথরের বাটি। আর দাতুর হাতে রসগোল্লার হাঁড়ি।

বাটিতে কি আনলি?

নীহার বললেন।

আজ চুমকির জন্মদিন ছিল। পায়েস রান্না হইছিল বেশি কইর‍্যা। বৌদি কইলো, পাথরবাটিতে জমানোই আছে, লইয়া যা চখার লইগ্যা। ও খুবই ভাল পাইত মায়ের হাতের পায়েস খাইতে। মা ত নাই! তার আর কি করণ যাইব? আমি যে মনে রাখছি ও কী ভাল পাইত না পাইত সে কথা জাইন্যাও ত চখাদার ভাল লাগব অনে।

কোন ঘরে শুতে দিই ওকে? কলকাতাইয়া বাবু। ওদের তো আবার অ্যাটাচ্‌ড্ বাথ ছাড়া শোওয়ার অভ্যেস নেই। আমার ঘরেই ওকে থাকতে দেব। তাছাড়া কমোডতো ঐ....

স্বগতোক্তি করলেন নীহার।

আর তুমি?

দীপ বলল। অবাক হয়ে।

এক রাত তোর সঙ্গেই শুয়ে যাব।

আর রাতে বাথরুম পেলে?

মধ্যের দরজাটা খুলে রাখলেই হবে'খন। নয়তো বাথরুমের উঠোনের দিকের দরজাটা খুলে রাখতে বলব ওকে। প্রয়োজন হলে উঠোন দিয়েই যাব।

বলেই বললেন, তুই যা দীপ। বাপোই আর বউকে খবর দে গিয়ে। আর মণিকাটা কোথায় গেলো? নিশ্চয়ই টি. ভি.-র সামনে বসে আছে। ডাকতো ওকে। ঘর-বাড়ি সাফ-সুতরো করতে হবে। আমার ভাইপো আসছে এত যুগ পরে। কেউ-কেটা ভাইপো।

দীপ জিজ্ঞেস করল চানুকে, বাগডোগরা থেকে তামাহাটে এসে পৌঁছতে কতক্ষণ সময় লাগবে? ধুবড়ি হয়ে আসবে কি?

না। তা কেন! সোজা এসে ঢুকে পড়বে বাঁয়ে। তারপর পাগলা হাট, কুমারগঞ্জ হয়ে আসবে।

শিলিগুড়ি আর জলপাইগুড়ি পেরোতেই তো লেগে যাবে অনেক সময়।

চানু বলল, কেন? থোড়াই আসবে সে শহরের মধ্যে দিয়ে। সেভক রোড ধরে বেরিয়ে এসে বাইপাস দিয়ে এসে তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে হাইওয়ে ধরে নেবে। এন. জি. পি.-তেও ঢুকবে না।

তাই? তবু ক'টা নাগাদ এসে পৌঁছবে?

তামাহাটের কুপমণ্ডুক দীপ বোকার মতন বলল।

ভাবছিল ও যে, ওর জগৎটা বড়ই ছোট। ওর দৌড় এদিকে ডিঙ্গডিঙ্গা আর অন্যদিকে কুমারগঞ্জ-গৌরীপুর হয়ে ধুবড়ি। ব্যাসস।

চানুদা বলল, তা ঠিক বলা যায় না। এখন তো শুনতে পাই ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স ছাড়াও অন্য প্রাইভেট-এর ফ্লাইটও আসে বাগডোগরাতে। প্লেন যদি লেট না করে তাহলে এখান থেকে ঘণ্টা পাঁচেক লাগার কথা। তার মানে, আটটা নাগাদ পৌঁছবে হয়তো।

নীহার যেন হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন, সময় একেবারেই নেই। মণিকা! এই মণিকা, মণিকা! কোথায় যে যায় মেয়েটা!

মণিকাকে ডাকতে ডাকতে ভিতর-বাড়িতে গেলেন তিনি।

চানুদা আর দাতু বলল, আমরাও যাই এখন। গিয়া আটটা নাগাদ আবার আসুমানে। বলিস কাকিমারে। সকলকেই খবরটা দিতে ত লাগে। কী কইস? চখাদা এত বছর পরে আসতাছে তামাহাটে। ওয়েলকাম করন লাগে ত।

দীপ বলল, আমি তো তাঁকে দেখেছি মাত্র একবার। পুঁচকির বিয়েতে যখন কলকাতায় গেছিলাম তখন। এসে পড়লে তো চিনতেই পারব না।

চেনবার দরকারটাই বা কি? তামাহাটে কি আমাগো বা তগো বাড়িত্ গণ্ডা গণ্ডা গাড়িওয়ালা অতিথি আসতাছে রোজ রোজ? গাড়ি আইস্যা থামলেই বুঝবি যে চখা আইল।

চখাদার তো লম্বা-চওড়া চেহারা। শুনেছি ইদানীং মোটাও হয়েছে খুব। মাথার চুলও পাতলা হয়ে গেছে।

মনে আছে এখনও, মাঝে মাঝেই বাঁ হাত দিয়ে মাথার চুল আঁচড়াইবার বাতিক ছিল। এখনও আছে কি নাই কে কইতে পারে?

মোটা হয়েছে কেন?

মোটা হইব না ত কি? মায়ে মোটা ছিলেন, বাবাও মোটা, মোটারই ধাত অগো। জল খাইয়া থাকলেও মোটা হইয়া যাইব। গড়ন বইল্যা কথা।

দীপ বলল না কিন্তু কথাটা মুখে এসে গেছিল। ও শুনেছে লোকমুখে যে, শুধু জলই নয়, লাল জলও নাকি খায় চখাদা প্রায়ই।

তারপর বলল, এদিকে বলছ চুলই নেই, তার আঁচড়াবেটা আর কি?

আরে যাদের চুল থাকে না তারাই দেহিস সব সময়েই পকেটে একখান চিরুনি লইয়া ঘোরতাছে।

ওরা হেসে উঠল।

দাতু বলল, সত্যি বলছি। কিন্তু কেন ঘোরে, তা বলতে পারব না।

তারপর দাতু আর চানুদা চলে গেলো যার যার বাড়ি।

এমন সময়ে দীপের মনে পড়ল হামিদের কথা। বাড়ির ভিতরে দৌড়ে গিয়ে

বলল, যাঃ! একদম ভুলে গেছিলাম মা। ফতিমা মাসির বাড়ি আজ ঈদের নেমন্তন্ন ছিল যে! পায়জামা-পাঞ্জাবি নিয়ে, বিরিয়ানি নিয়ে মাসি বসে আছে। হামিদ পাকড়াও করেছিল হাটের মোড়ে। তাকে কথা দিয়ে এসেছি, না গেলে খুবই খারাপ হবে।

দাওয়াতই যদি ছিল তবে ঈদের নমাজের পরেই গেলি না কেন? ঈদগা থেকে ওরা আসার পরপরই? ফতিমা তো তোকে এই প্রথমবার দাওয়াত খাওয়াচ্ছে না? এটা কী ধরনের অসভ্যতা? এমনটা কোন শিক্ষিত মানুষের কাছে আশা করার নয়। এখন কি করবি? এদিকে চখাও কত দূর থেকে আসছে আমাদের সঙ্গে মাত্র ক'টি ঘণ্টা কাটাবে বলে আর তুই ঠিক এখনই চলে যাবি? বাগডোগরাতে কখন প্লেন নামবে তা তো আমরা জানি না। ও তো আগেও চলে আসতে পারে! তুই ফিরে আসার আগেই যদি সে এসে পৌঁছে যায়? কী লজ্জার কথা হবে। এখন ওর পিসির বাড়ি বলতে তো তুই আর আমি। অন্যেরা তো কেউই নেই এখানে। তোর দাদারা তো একজন রায়গঞ্জে, একজন ধানবাদ আর হাজারিবাগের ঘেটো টাঁড়ের মধ্যে মাকুর মতন যাওয়া-আসা করছে আর অন্যেরা কলকাতাতে। আগে দোল-দুর্গোৎসবে একসঙ্গে হতো সবাই। এখন আর কে এই নিম্ন আসামের গোয়ালপাড়ার ধ্যাড়ধেড়ে তামাহাটে আসে! ডিশ অ্যান্টেনা নেই, কেব্‌ল টি. ভি. নেই, বার নেই, এয়ার-কন্ডিশনড সেলুন নেই, সিনেমা হলও নেই, এখানে শহুরেরা কিসের জন্যে আসতে যাবে? মোটে আসেই না কেউ, তার থাকা! এই কারণেই আমার ভীষণই আনন্দ হচ্ছে চখা আসছে বলে। দ্যাখ ছেলেটার কত ভালোবাসা আছে আজও তামাহাট-গৌরীপুর-ধুবড়ির জন্যে।

বলেই বললেন, অতখানি রাস্তা। ভালয় ভালয় এসে পৌঁছকই আগে।

ছেলেটা ছেলেটা কোরো না তো মা। আজ বাদে কাল চিতায় উঠবে। এই বাঙালি মা-পিসিদের কাছে বুড়োরাও চিরদিন খোকা আর খোকন হয়েই থাকে। সাধে কি জাতের এই হাল!

এমন সময় বাইরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ানোর শব্দ হলো। তামাহাটের পথে বাস-ট্রাকের যাতায়াত আছে মাঝে-মধ্যে কিন্তু গাড়ি দিনে হয়তো চার-পাঁচটি ডিঙ্গডিঙ্গার দিকে যায় এবং ধুবড়ির দিকেও।

তুমি ভেতরে যাও মা। আমি দেখছি।

দীপ বাইরে বেরিয়েই দেখে একটা মস্ত গাড়ি। সাদা-রঙা। ঠিক এমন গাড়ি আগে দেখেনি কখনও।

গাড়ির সামনের বাঁ দিকের দরজা খুলে নামল দীপের ছোড়দা, ঝণ্টু।

তুমি! চখাদা নাকি আসবে আজই। একটু আগেই চানুদা খবর দিয়েছে এসে মাকে। ধুবড়ি থেকে রাজাদা মুংগিলালের গদিতে ফোন করেছিল।

জানি, ঝন্টু বলল। আমিও তো তাই এই সময়েই এলাম। নইলে, পরের সপ্তাহে আসতাম।

ততক্ষণে ছোটবৌদি আর ছোটবৌদির দাদা-বৌদিও নামলেন। ছোড়দার ড্রাইভার-কাম-কম্বাইন্ড হ্যান্ড পান্ডেও নামল ড্রাইভিং সিট থেকে। ভিতর থেকে নীহারের সঙ্গে মণিকাও গদিঘরে এলেন।

কুশল জিজ্ঞাসাবাদ করে নীহার বললেন, বাঁচালি ঝণ্টু, তুই এসে পড়ে। কি টেনশনে যে ছিলাম।

ঝন্টু বলল, টেনশন-এর কি আছে? চখাদা তো আর বাইরের লোক নয়।

এটা কি গাড়ি নিলি? মারুতি ভ্যানটা নেই?

সেটাও আছে মা তোমার আশীর্বাদে। এটা টাটা মোবিল।

বাঃ! ভারি সুন্দর তো গাড়িটা।

চখাদা বইমেলা উদ্বোধন করতে আসছে ধুবড়িতে, তুমি যাবে তো? তাইতো নতুন বড় গাড়ি নিয়ে এলাম যাতে তোমার কোনো কষ্ট না হয়।

তাই? তা ভালো। তবে বড়লোক না হয়ে বড় মানুষ হও, এই আশীর্বাদ করি। চিরদিন তাই চেয়েছি।

দীপ বলল, ছোড়দা এসে গেছে, আমি হাত-মুখটা ধুয়েই একটু ঘুরে আসি হামিদদের বাড়ি থেকে। তোমার টর্চটা নিয়ে যাচ্ছি মা।

বলেই ছুটে ভিতর-বাড়িতে গেলো।

২

এটা কি নদী পার হলাম?

চখা টাইয়ের নটটা একটু ঢিলে করে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, যে ছেলেটি তাকে নিয়ে এসেছিল বাগডোগরা থেকে, তাকে।

কে জানে!

নদীর নাম জান না?

কী হইব জাইন্যা?

চখা চুপ করেই রইল।

ভাবছিল, এই আমাদের বিশেষত্ব। এখানে শিক্ষিত মানুষদের কাছেও কোনো গাছ শুধুমাত্রই গাছই। কোনো পাখিও শুধু পাখি। নদী, নদী। জন্মাবধি গাছ, পাখি, নদীর প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও এদের কারোকেই জানার একটুকু আগ্রহ নেই অধিকাংশ মানুষেরই।

ভাবলেও খারাপ লাগে ওর।

পাইলট, অর্থাৎ ড্রাইভার খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। কোনো মদের কোম্পানির ফ্রি-গিফ্‌ট দেওয়া একটা গল্ফ-ক্যাপ মাথায় চড়িয়ে। ভাড়ার গাড়ি। গাড়ির মালিকও গাড়ির সামনের সিটে বসেছিল।

কতক্ষণ লাগবে তামাহাটে পৌঁছতে?

চখা আবার প্রশ্ন করল।

দেখা যাউক। রাস্তা এতই খারাপ যে কহনযোগ্য নয়।

কিছুক্ষণ পরেই একটি পেট্রল পাম্প-এ পাইলট গাড়িটাকে ঢোকাল। পাইলট বলেই সম্বোধন করছিল চখা তাকে। তাতে সেও খুশি হচ্ছিল। তাকে নিতে-আসা ছেলেটিও নামল। তার নাম প্রান্তিক। তারপর পেট্রল যখন নেওয়া হচ্ছে তখন ফিরে এসে জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে লজ্জামাখা হাসি হেসে বলল, একশত টাকার একখান নোট হইব কি? টাকা কম পইড়্যা গেছে গিয়া।

চখা বলল, হবে।

টাকাটা নিতে নিতে ভদ্র ও অপ্রস্তুত ছেলেটি আরও লজ্জিত হয়ে বলল, খারাপ পাইলেন না ত?

না না। খারাপ পাইব ক্যান? ওরকম তো হতেই পারে। নিজে গাড়ি না চালালে বা নিয়মিত যাওয়া-আসা না করলে কত তেলে কত কিমি যাবে, কত ধানে কত চাল—এরই মতন, জানা থাকবে কী করে! এই নাও।

বলে, টাকাটা বের করে দিল পার্স থেকে।

একটু পরেই সন্ধ্যে হয়ে যাবে। ঠাণ্ডা নেই কিন্তু হাওয়ার ছুঁচোলো মুখে ঠাণ্ডার তীর আছে। ফাল্গুনের উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের আর নিম্ন আসামের প্রকৃতি, ঘরবাড়ি, এমনকি কথ্য ভাষাতেও বিশেষ তফাৎ নেই। পথের দু-পাশেই চষা ক্ষেত। মাঝে মাঝে পাট লেগেছে, সর্ষে, শিমুল গাছে ফুল এসেছে গোলাপি ও লাল, বৈষ্ণব ও শাক্তদের পোশাকের রঙের মতন। মাদার গাছে আর অশোক গাছেও ফুল এসেছে বৌদ্ধ ও তিব্বতী লামাদের পোশাকের রঙের। হিন্দিতে এইসব লালকেই মিলিয়ে মিশিয়ে বলে 'ভগুয়া'। অর্থাৎ গেরুয়া। রাগ-রাগিণীর রঙ বিচারে ভাগুয়া চার রকমের হয় : বৈষ্ণব, শাক্ত, বৌদ্ধবাদী ও তিব্বতী লামার পোশাকের রঙ। বেগম আখতার সম্বন্ধে ঋতা গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি লেখা পড়ে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে সাম্প্রতিক অতীতে সচেতন হয়েছে চখা।

ভাবছিল চখা যে, চোখে আমরা কত কীই দেখি, কিন্তু ঠাহর করা আর দেখা, দেখার মতন দেখাতে কতই না তফাৎ। গেরুয়ার এই শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে ও অবশ্যই অবহিত ছিল অবচেতন মনে কিন্তু সচেতন আদৌ ছিল না। দেখার চোখের এই তফাৎটুকুতেই একজন মানুষের, বিশেষ করে লেখকের সঙ্গে অন্য মানুষ বা লেখকের পার্থক্য।

তেল নিয়ে গাড়ি স্টার্ট করার পরেই পাইলট একটা মস্ত হাই তুলল।

চখা বলল, ব্যাপারটা কি পাইলট? সিগারেট খাও নাকি? খেলে খাও।

আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে তো আমারই চিরঘুম হয়ে যাবে।

পাইলট সে-কথার উত্তর না দিয়ে বলল, ক্ষুধা লাগছে বড়।

তাই?

অবাক হয়ে বলল চখা।

তারপর বলল, খিদে পেয়েছে তো কিছু খেয়ে নাও।

সকাল ত্ ছটার সময় বারাইছিলাম দুগা মুড়ি আর চা খাওনের পর। আপনার প্লেন আইব তিনটায়, ওদিকে এয়ারপোর্টে গাড়ি লইয়া আইস্যা পৌঁছাইছিলাম প্রায় দুইটায়। খামু কখনে? আর খামুই বা কুথায়?

কেন? এয়ারপোর্টেই তো রেস্তোরাঁ ছিল।

কয়েন কি স্যার? সিখানে কি আমাগো মতন মাইনষে খাইবার পারে নাকি? দাম শুইন্যাই ত হার্ট-ফেইল হবার লাগে।

তাহলে, দাঁড়াও এখন, কোথাও ধাবা-টাবাতে। না খেলে, এত পথ গাড়ি চালাবে কি করে? সকলেই অভুক্ত আছ? চমৎকার! টাকাও নেই বুঝি?

থাউক। খাওনের দরকার নাই। অনেকই দেরি হইয়া যাইবনে আপনের।

হলে হবে। দাঁড়াও কোথাও।

ড্রাইভার ও মালিক মুখচাওয়াচাওয়ি করল। চখাকে নিতে-আসা ছেলেটি, যার নাম প্রান্তিক, চাপা হাসি হাসল। তারপর বলল, আপনের দেরি হইয়া গ্যালে শ্যাষে আমাগো গালাইয়েন না য্যান।

চখা হাসল কথা শুনে।

তারপর হেসেই বলল, না, না, গালাইম্যু না তোমাগো। নারে বাবা, না! আমি কিছুই বলব না। তোমাদের সারাদিন অভুক্ত রাখিয়ে কি মহাপাতক হব?

গাড়িটা ধাবাতে দাঁড় করিয়ে চখা ওদের তিনজনকে ভাল করে খাওয়াল। নিজে প্লেনে লাঞ্চ করেছিল বলে চা ছাড়া আর কিছুই খেল না। পাইলটের জন্যে সিগারেটও কিনল এক প্যাকেট। চার্মস ছাড়া আর কিছুই ছিল না সেই ধু-ধু প্রান্তরের মাঝের ধাবা-সংলগ্ন দোকানে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে হতে অন্ধকার হয়ে গেল প্রায়। এক ঝাঁক কমোন ইগ্রেট গেরুয়া আকাশের পটভূমিতে উড়ে যাচ্ছিল ঘনসন্নিবিষ্ট বাঁশঝাড়ের উপর দিয়ে।

কলকাতা কী যে দরিদ্র! একটা বাঁশঝাড় পর্যন্ত নেই সেখানে। ফাগুন-চৈত্রের

হাওয়ায় পর্ণমোচী বনে পাতা-খসার মিষ্টি মুচমুচে আওয়াজটুকু পর্যন্ত শোনা যায় না। হাওয়া সেখানে জমাদারের মতন ঝাঁট দিয়ে নিয়ে যায় না গা-শিরশির করা শব্দে সেই পাতার রাশকে।

কলকাতা ছেড়ে বাইরে এলেই কলকাতার বহুতল বাড়িময় ইট-কংক্রিট আর পিচ-এর কদর্যতা যেন বেশি করে প্রতিভাত হয় ওর কাছে। কলকাতার প্রশ্বাসে বিষ। আওয়াজে কানের সমস্ত কোমল পর্দাগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। মনে হয় চখা বোধহয় আর কোনো দিন কড়িমা বা কোমল রেখাবের মাধুর্যে মুগ্ধ হতে পারবে না। বাড়ির পাশের মাড়োয়ারীদের বহু কোটি টাকা খরচ করে তৈরি মন্দিরে ঘ্যাসঘেসে গলায় গগননিনাদী ভজন হয় রোজ সন্ধ্যেতে অ্যাম্পলিফায়ারে। শুনতেই হয়। বাধ্যতামূলকভাবে ভোর চারটেতে বিজাতীয় ভাষাতে 'অ্যাম্পলিফায়ারে' শোনা ঘুমভাঙানো আজানের আওয়াজেরই মতন। খালি গলাতে শোনা ভজন অথবা আজান দুই-ই কিন্তু সুন্দর।

তার বাড়ির পাশের মন্দিরের পণ্ডিত পুরোহিতদের গলাতেও তেমন লালিত্য বলতে কিছুমাত্রই নেই। মাঝে মাঝেই একথা ভেবে মনে মনে হাসে চখা যে, দেবী লক্ষ্মী এবং দেবতা গণেশ দু-হাত উপুড় করে মাড়োয়ারীদের সবকিছুই ঢেলে দিয়েছেন বটে, সরস্বতীও হয়তো কিছু দিয়েছেন তাদের কারো কারোকে কিন্তু তাদের গলাতে সুর একটুও তো দেননি। যুগ-যুগান্ত ধরে শেয়ার বাজারে চাল-ডাল আলুপটলের দর-দাম করে করে তাদের গলাগুলি বোধহয় চিরতরে চিরেই গেছে। দু-হাতে তাদের সবকিছু অঢেল দেওয়া সত্ত্বেও ন্যূনতম সুরজ্ঞান থেকে বঞ্চিত করেছেন মা সরস্বতী, লক্ষ্মী এবং গণেশের পর্য্যাপ্ত ও বেহিসাবী দানের সঙ্গে সমতা রাখতেই বোধহয়।

পাইলট, প্রান্তিক এবং গাড়ির মালিক খাওয়া-দাওয়া করার পর যখন গাড়ি ছাড়ল আবার, তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছিল। ধাবার হাতাতে যে মস্ত সজনেগাছটা থেকে ফিনফিনে 'ক্ষুদে' 'ক্ষুদে' পাতা ঝরছিল ফাগুনের শেষ বিকেলের হাওয়াতে বসন্তের আগমনী গানের বাণী বহন করে, সেই পাতাগুলোকে এখন দেখা যাবে না। হেড-লাইটের আলো সামনে যতদূর যায় তাতে ক্ষত-বিক্ষত পিচ রাস্তার আর নিচের পথ পাশের পাটকিলে-রঙা ধুলোর ডাঙা আর ড্যাশবোর্ডের নানা মিটারের লাল-সবুজ আলোগুলো ছাড়া পৃথিবী সম্পূর্ণই মসীলিপ্ত।

কলকাতা থেকে গরম স্যুট পরে এসে এতক্ষণ অস্বস্তি বোধ করছিল কিন্তু

এখন আরামই বোধ করছে। পায়জামা-পাঞ্জাবি পরেই আসত কিন্তু মনু বলল, উত্তরবঙ্গে এখন দারুণ ঠাণ্ডা, তার কোনো এক ছাত্রী নাকি শিলিগুড়ি থেকে ফোন করেছিল। কিন্তু বাগডোগরাতে নেমেই বুঝতে পেরেছিল যে মনুর ছাত্রীর সাবধানবাণী মিথ্যে BOMBSCARE-এর মতনই একটি HOAX। কিন্তু তখন কী আর করা যাবে। কোট-টাই না-হয় খুলে ফেলতে পারত কিন্তু পেন্টুলুন তো আর খুলতে পারত না।

এখন চুপচাপ। বাইরে এবং গাড়ির ভিতরেও। স্প্রিং-এর সংকোচন-প্রসারণ ক্ষমতা বলতে গাড়িটার পেছনের সিটের স্প্রিং-এ কিছুমাত্রই নেই। চখার মনে হচ্ছে শালকাঠের তক্তার ওপরে বসেই চলেছে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে। রাস্তা যতই খারাপতর হচ্ছে ততই ঘনঘন বিনা-নোটিসের HUMP আসছে আর মনে হচ্ছে তার টেইল-বোন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

তবে এইসব অসুবিধে, সামনের মোড়ে গিয়ে পাইলট কোন পথ ধরবে, কোন দিকে গেলে পথ অপেক্ষাকৃত ভাল পাবে এবং দূরত্বও কম হবে, এই সব আলোচনাতে যখন ওর সহযাত্রীরা ব্যস্ত তখন চখা বহুযুগ আগে শেষ বার যাওয়া ধুবড়ি-তামাহাটের স্মৃতিতে বিভোর হয়ে গেল।

অতীতের স্মৃতিমাত্রই মধুর। তিক্ততা যদি কিছুমাত্র থেকেও থাকে, সময়, বনমধ্যের ঝরনাতলায় ঝুড়িতে করে রেখে-দেওয়া বনফুল, থাম আলুর তিক্ততারই মতন তা অবলীলায় ধুয়ে দিয়ে যায়। সময়ের মতন দুঃখহারী এবং তিক্ততাহারী উপাদান আর কিছুই নেই। কিছু মানুষ অবশ্য সংসারে চিরদিনই থাকেন যাঁরা তিক্ততাকে জিইয়ে রাখতে ভালবাসেন, কোনো সৌন্দর্যের, কোনো মাধুর্যের সঙ্গেই তাঁদের সহবাস নেই। সেইসব মন্দভাগ্য নষ্ট মানুষদের কথা স্বতন্ত্র।

অনেকই বছর আগে ব্রহ্মপুত্রের তীরের যে ধুবড়ি শহরকে দেখেছিল, এতদিনে তার বোধহয় আমূল বদল হয়ে গেছে। ভাবছিল চখা। নেতা-ধোপানির ঘাট, ম্যাচ-ফ্যাক্টরি, উইমকো কোম্পানির, স্টিমারঘাট, ছাতিয়ানতলাতে তার পিসেমশাই-এর দাদা পূর্ণ পিসেমশাই-এর নদীপারের বাড়ি। পিসেমশাই-এর দাদাদের মধ্যে একমাত্র পূর্ণ পিসেমশাই-এর গায়ের রঙই ছিল ফর্সা। ঝন্টুরা সবাই ওঁকে ডাকত ধলাকাকা বলে। তাঁর দাদা সুরেন মিত্র। তাঁদের একজনের আট মেয়ে এক ছেলে, অন্য জনের আট ছেলে এক মেয়ে। তখনকার দিনে অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারেই আট-দশ সন্তান স্বাভাবিক ছিল।

তামাহাট থেকে ধুবড়ি যেতে গৌরীপুর পড়ত পথে। কুমারগঞ্জ। কুমারগঞ্জের প্রায় উল্টোদিকে আলোকঝারি, রাঙ্গামাটি পাহাড়, পর্বতজুয়ার।

আলোকঝারি নামটি উচ্চারিত হলেই যেন মনের চোখের সামনে অদেখা ঝরনার এক চিত্রগল্প ফুটে উঠত। আলোকঝারি পাহাড়ে প্রতি বছরই সাতই বোশেখে সাতবোশেখির মেলা বসত। এই নিম্ন আসামের বৈশাখ মাসের বন-পাহাড়ের রূপের কথা ভাবলে চখা এখনও আচ্ছন্ন বোধ করে। পর্ণমোচী গাছেদের পত্রশূন্য ডালে ডালে বসন্তের শিমুলগাছের ফুলের মতন সোনালি লাল মুরগী ফুটে থাকত। কালো প্রস্তরাকীর্ণ পাহাড়ি ঝরনার শুকনো সাদা বুকে কবুতর বলি দিয়ে ডিঙ্গডিঙ্গার মরনাই চা-বাগানের সাঁওতাল কুলি-কামিনেরা বনদেওতাকে পুজো দিত। গোঁসাইগঞ্জ, ফকিরা গাঁও, মটরঝাড়, গোলোকগঞ্জ, গৌরীপুর, বক্সির হাট, ডিঙ্গডিঙ্গা এবং তামাহাট থেকে তো অবশ্যই, মেয়ে-পুরুষ গরুর গাড়িতে করে পাহাড়ি পথ বেয়ে এই জঙ্গলের গভীরের মেলাতে আসতেন। পেছন পেছন আসত সাদা কালো বাদামি গৃহপালিত কুকুরেরা।

মেলা ভাঙতে ভাঙতে রাত নামত। প্রজাপতি উড়ত নানা-রঙা। ঝাঁকে ঝাঁকে। কোনো কিশোরীর গায়ে বসলে অন্যরা চেঁচিয়ে উঠত, 'এবার তর বিয়া হইব রে।'

বিয়ে ব্যাপারটা যে কী তা না জেনেই উত্তেজনা আর লজ্জাতে সেই কিশোরীর গাল আর কান লাল হয়ে যেত।

শুক্লপক্ষের ফুটফুটে জ্যোৎস্না মাড়িয়ে, চাকায় চাকায়, পায়ে পায়ে আমাদের এই বড় সুন্দর দেশের মিষ্টি-গন্ধ উড়িয়ে বলদেরা গাড়িগুলো টেনে ফিরে যেত যার যার গন্তব্যে। ঐ ডাইনী জ্যোৎস্নায় যেন ছাইওয়ালা গাড়িগুলো ভেসে ভেসে চলত। বলদদের পাগুলো যেন শূন্যেই পড়ত মনে হতো।

মরনাই চা-বাগানের ম্যানেজারের, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের, এঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী ও মেয়েরা চাঁদের বনে 'আজ জ্যোস্না রাতে সবাই গেছে বনে' কোরাসে গাইতে গাইতে হেলা-দোলা গরুর গাড়ির ছইয়ের নিচে পোয়ালের উপরে শতরঞ্চি বিছোনো নরম গদিতে বসে বাড়ি ফিরতেন। গরুর গাড়ির মাথার উপরে ধরধবে সাদা লক্ষ্মী পেঁচা ঘুরে ঘুরে উড়তে উড়তে কিছু পথ গিয়ে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে-ওঠা পর্ণমোচী বনের গভীরে অদৃশ্য হয়ে যেত।

মেয়েরা কলকল করে উঠত, 'দেখেছিস? দেখেছিস? আমি দেখেছি।'

কেউ বলত, 'ইসস্, আমি দেখতে পেলাম না যে!'

এইসব ভাবতে ভাবতে ঘোর লেগে গেছিল চখার। কত যে ছবির পরে ছবি, একের পর এক মনের পর্দাতে ফুটে উঠেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছিল।

গৌরীপুরের বড়ুয়া রাজারা ছিলেন বিখ্যাত। প্রমথেশ বড়ুয়া সেই পরিবারের। তাঁর ছোট ভাই প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া, ডাকনাম লালজী, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাতি-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। শোনপুরের মেলাতে যেবারে উনি যেতেন, লালজীকে না দেখিয়ে কেউই হাতি কিনতেন না। হাতির মুখ-চোখ, দাঁত, পায়ের নখ, শুঁড়, লেজ দেখে, আগেকার দিনের শাশুড়ী ঠাকরুণরা যেমন করে পুত্রবধূ নির্বাচন করতেন, প্রায় সেই প্রক্রিয়াতেই হাতি নির্বাচন করে দিতেন চেনা-জানা হাতির খরিদ্দারদের।

সকলেই তাঁকে বলতেন "রাজা" অথবা "বাবা"। যৌবনে অত্যন্ত ভাল শিকারীও ছিলেন তিনি। পরবর্তী জীবনে শিকার আর করতেন না। খেদা করে হাতি ধরতেন। শেষ জীবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে তিস্তা উপত্যকায়, ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গাতে ক্যাম্প করে থাকতেন তাঁর নিজের শিক্ষিত মস্ত এক 'গণেশ' এবং এক কুনকি নিয়ে। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে গরুমারার অভয়ারণ্যের কাছের মূতী নদীর বিট-অফিসারের বাংলোতে তাঁর সঙ্গে শেষবার দেখা হয়েছিল চখার। ভারী জিন্দা-দিল, রসিক এবং মন-মৌজী মানুষ ছিলেন তিনি। চোদ্দটি ভাষা জানতেন।

বড়ুয়া পরিবারের SUMMER PALACE ছিল মাটিয়াবাগ। গৌরীপুরেই। একটি টিলার উপরে। মাটিয়াবাগ প্যালেসেরই সামনে প্রমথেশ এবং লালজীর প্রিয় হাতি প্রতাপ সিং-এর কবর আছে। ANTHRAX রোগে মারা গেছিল প্রতাপ সিং। আগের প্রজন্মের যেসব মানুষ প্রমথেশ বড়ুয়ার 'মুক্তি' ছবিটি দেখেছিলেন, তাঁরা জানেন প্রমথেশ বড়ুয়া, অমর মল্লিক, কাননবালা, পঙ্কজকুমার মল্লিক ছিলেন সেই ছবিতে। কাননদেবী ও পঙ্কজবাবুর গানও ছিল—"দিনের শেষে ঘুমের দেশে ঘোমটা পরা ঐ ছায়া।" তখনও নায়ক-নায়িকারা নিজেরাই গাইতেন। তাঁরা সেই ছবিতে জং বাহাদুর হাতিকেও অবশ্যই দেখে থাকবেন। ঐ পাহাড়ের মতন হাতিটিই প্রতাপ সিং।

গৌরীপুরে চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে রাণু-বৌদির হাতে বানানো কাঁচা আমপোড়া শরবত খেয়েছিল চখা, কাগজি-লেবু গাছের পাতা ও পোড়া শুকনো লংকা দেওয়া। আহা। সেই স্বাদ যেন মুখে লেগে আছে। অথচ রাণু-বৌদি যে কার স্ত্রী, তাঁদের বাড়িটা যে গৌরীপুরের ঠিক কোথায় ছিল এবং কার সঙ্গে যে

গেছিল সেখানে ও, সে-কথাটাই আজ আর মনে নেই। কিন্তু চমৎকার ফিগারের কুচকুচে কালো অসাধারণ দুটি চোখসম্পন্ন কাল-কেউটের মতন এক বিনুনী-করা একটি সাদা ব্লাউজের সঙ্গে সাদা-কালো খড়কে ডুরে শাড়ি-পরা, এবং গলাতে মটর-মালা পরা রাণু-বৌদিকে চখা আজও এক হাজার নারীর মধ্যে থেকে খুঁজে বের করতে পারবে। সুযোগ পেলে।

হাতঘড়িটা দেশলাই জ্বেলে দেখে প্রান্তিক স্বগতোক্তি করল, তামাহাটে পৌঁছাইতে পৌঁছাইতে নয়টা বাজব অনে।

কইস কি তুই!

গাড়ির মালিক বললেন।

তার আগেই পৌঁছাইয়া যামুনে।

তর মাথাডা গ্যাছে এক্কেরে। এখনও ত কুচবিহারই আস্যে নাই।

তাই ত! আমি ঘুমাইয়া পড়ছিলাম। খাওয়াডা একটু বেশি হইয়া গেছিল শ্যাষ বেলায়।

তারপরই বলল, তবে আর কি। কমপক্ষে এগারোটা বাজব।

ঘোর ভেঙে, সুন্দর স্বপ্ন-রাজ্য ছেড়ে চখা বলল, বলেন কি? আমার আশি বছরের বৃদ্ধা পিসীমা অপেক্ষা করে থাকবেন আমার জন্যে। আরও অনেকেই। এগারোটা তো গ্রাম-গঞ্জে অনেকই রাত।

হে ত ঠিকই কথা।

তবে?

কী করন যাইব কয়েন। আপনে ট্রেনে আইলে সকালে নিউ কুচবিহারে নাইম্যা ভাত খাওনের আগেই তামাহাট পৌঁছাইয়া যাইতে পারতেন।

হ। তরে কইছে!

পাইলট বলল।

ক্যান?

কুন গ্যারান্টিডা আছে টেরেনের? কাইলই ত আট ঘণ্টা ল্যাট আসছে।

আট ঘণ্টা! কইস কি তুই! ওরে ফফাদার!

ঠিকই কইতাছি।

চখা বলল, কী প্রান্তিক? পথের বাঁ দিকে যে শ'য়ে শ'য়ে ট্রাক দাঁড়ানো লাইন করে। ব্যাপারটা কি?

বর্ডার না! বাংলাদ্যাশে যাইব ঐসব ট্রাকগুলান। তাই খাড়াইয়া আছে। শ'য়ে

শ'য়ে কী কন স্যার, হাজারেরও বেশি হইব।

তাহলে এদিক দিয়ে এলে কেন?

রাস্তাডা ভাল। হেইর লইগ্যা। অন্য রাস্তাত্ গ্যালে আপনার পিছনের হাড্ডিগুলান একখানও আস্ত থাকনের কথা আছিল না।

চখা বিরক্ত গলাতে বলল, যেন এই রাস্তাতে এসেও আস্ত আছে! একে সরু রাস্তা; তায় একটা পাশ তো ট্রাকের লাইনেই ভর্তি, বাকি পথ দিয়ে কি আপ-ডাউনের ট্রাক-বাস চলতে পারে?

সে আর কি হইব। আমাগো আসামের কথাডা ভাবে কেডায়? উলফাদের মতন আমাগোও একটা দল করন লাগব। অনুনয়, বিনয়, কোর্ট-কাছারি কইর‍্যা, ভোট দিয়া কিসস্যুই হইল না। হে মাও ডে জং-এ কইছিল না? সমস্ত শক্তির উৎসই হইতাছে বন্দুকের নল। ঠিকোই কথা!

চখা মুখে চুপ করে থাকলেও মনে মনে ভাবল যে, কথাটা বোধহয় ঠিকই। কোনো ব্যাপারেই আর কিছুতেই কিছু হবার নয়। দেশের সামনে বড়ই দুর্দিন।

তারপর নিজের হাতঘড়ির রেডিয়াম-দেওয়া কাঁটার দিকে চেয়ে ভাবল, এখন মোটে সাতটা। বাগডোগরা থেকে চার ঘণ্টা হলো বেরিয়েছে। আরও চার ঘণ্টা!

আবারও চোখ বন্ধ করে চখা বহুবছর পেছনে ফিরে গেল।

গঞ্জের নাম তামাহাট তামা নদীরই জন্যে। নদীটা হেজে-মজে গেছে অনেকেই দিন হলো। এসে পড়েছে গঙ্গাধরে। গঙ্গাধর নদী আসলে সংকোশ। ভুটানের হিমালয় থেকে বেরিয়েছে। ভুটান, আসাম আর পশ্চিমবঙ্গের সীমানাতে যমদুয়ার বলে একটা জায়গা আছে। চখা গেছিলও সেখানে একবার পিসেমশাই আর রতু জ্যেঠুর সঙ্গে রতু জ্যেঠুর টি মডেল ফোর্ড গাড়ি চড়ে। কী নিশ্ছিদ্র বন! কী সব শাল গাছ! পাঁচ-সাত জন প্রমাণ সাইজের মানুষও বেড় দিতে পারবে না তাদের গুঁড়ির—দুহাত প্রসারিত করেও। এমনই মোটা গুঁড়ি। প্রথম শাখাই বেরিয়েছে পাঁচ-ছ'হাত বা আরও উপর থেকে। দোতলা কাঠের বাংলো ছিল বনবিভাগের। উত্তর বাংলা ও আসামের বন-বাংলোই দোতলা। হাতিরই কারণে।

যমদুয়ার-এর বন-বাংলোর সামনে দিয়ে বয়ে গেছে সংকোশ নদী। মানাস অভয়ারণ্যর মানাস নদীর মতন অত বড় আর সুন্দর না হলেও সংকোশ রূপসী অবশ্যই। আর কোন জানোয়ার না ছিল সেখানে! হাতি, বাঘ, বুনো মোষ, চিতা,

হরিণ, কতরকমের পাখি। 'ঘরেয়া' নামের একরকমের মাছ পাওয়া যেত এই নদীতে। নাকি শুধুমাত্র এই নদীতেই! ছোট মাছ। মানে, খুব বড় হলে সোয়া কেজি মতন। কালো রঙ। কিন্তু কী তেল তাতে! অমন স্বাদু মাছ বড় একটা খায়নি চখা। ধুবড়িতে ব্রহ্মপুত্রের চিতল আর মহাশোলও খেয়েছে। কী পেটি! আধ হাত চওড়া। আর মুইঠ্যাও।

ভুটান থেকে তখন শীতকালে কমলালেবু আসত ঝুড়ি ঝুড়ি। তখন তো সর্বত্রই পথ আর যানবাহন মানুষের অগ্রগতির নামে তার শান্তিকে এমন বিঘ্নিত করেনি। কমলালেবু ঝুড়িতে করে নিয়ে আসত ভুটানি মেয়েরা। তারপর গরুর গাড়িতে করে আসত তামাহাটে। তামাহাটে কী না পাওয়া যেত তখন!

গঙ্গাধর নদী গিয়ে পড়েছে বাংলাদেশের সিরাজগঞ্জে। সেখানে অন্য নাম হয়েছে কিনা বলতে পারবে না। সিরাজগঞ্জ থেকে দেশভাগের আগে বড় বড় মহাজনী নৌকা করে পাট আসত। পাটের জন্যেই তামাহাটের রমরমা ছিল। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির বার-বাড়িতে একটি করে গদিঘর, তার পেছনে গুদামঘর, তারও পরে নিভৃতিতে ভিতর-বাড়ি। অর্থাৎ অন্দরমহল। পাট কাচা হয়ে গেলে পাট গাঁট বেঁধে তোলা থাকত গদিঘরে। ব্লন্ড, ব্রুনেট, কতরকমের মেমসাহেবদের চুলের মতন সেইসব পাটের রঙ ছিল। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরোত। গুদামঘরের পাশ দিয়ে যাতায়াতের সময়ে ঐ গন্ধ নাকে আসতই।

অনেক উদবেড়াল ছিল গঙ্গাধর নদীতে। কড়িদা আর আবু ছাত্তারের সঙ্গে চখা শিকারে যেত চখা চক্রবর্তী, পূর্ণ জ্যেঠার বন্দুক নিয়ে? আর সারা দুপুর উদবেড়ালদের খেলা দেখত। নদীর পাড়-এর অনেক উপর থেকে জলে ঝাঁপ দিত তারা তাদের পাড়ের বালির মধ্যের বাসা থেকে। তারপর কখনও মুখে মাছ নিয়ে, কখনও-বা খালি মুখে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতাতে জল ছেড়ে ভিজে, মসৃণ চকচকে শরীর নিয়ে উঠে যেত তাদের ঘরের দিকে খাড়া পাড় বেয়ে।

সোনালি চখা-চখী ডাকত গম্ভীর স্বরে লম্বা গলা তুলে কোঁয়াক কোঁয়াক করে নিস্তব্ধ দুপুরে। জলের উপরে তাদের ডাক দৌড়ে যেত অনেকদূর। বালির সঙ্গে হাওয়া খেলা করত সহস্র হাতে। বালুবেলাতে শিশুরা যেমন খেলে। বালির উপরে কত কী গড়ে তুলতে সেই সৃজনশীল এবং খামখেয়ালি হাওয়া। পরমুহূর্তে ভেঙেও ফেলত। কত আঁকুবুকি, ডিজাইন বালির উপরে। শুশুক ভেসে উঠত নৌকার পাসে হুসস করে। জলের ফোয়ারা তুলে শ্বাস নিয়ে আবার ডুবে যেত। নানা-রঙা মাছরাঙারা যেন কী সর্বনাশ হলো তাদের, এমন করে

বুকে চমক-তোলা ডাক ডেকে জলের সাদা, বালির সাদা, রোদের হলুদ এবং তাদের রঙ্গিবিরঙ্গি কর্বুর ডানাতে রঙ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে একাকার করে দিত। মাঝিরা দাঁড় ফেলত আর দাঁড় ওঠাত। ছপছপ শব্দ হতো বিলম্বিত লয়ে। একই ছন্দে। ক্যাঁচোর-ক্যাঁচোর শব্দের পরেই একবার ঘটাং করে শব্দ হতো। ঠোকাঠুকি হতো নৌকার সঙ্গে দাঁড়ের কাঠের। বুড়ো মাঝি দু-হাতে হুঁকো ধরে বসে থাকত হাল পা দিয়ে ধরে। নৌকা চলত কোনো বিশেষ গন্তব্যহীন জলপথে, শীতের মিষ্টি দুপুরে।

কী নিস্তরঙ্গ, শ্লথগতি, লোভ আর জাগতিক উচ্চাশাহীন ছিল সেই সব দিন। মানুষ বড়লোক ছিল না কিন্তু সুখী ছিল। কত সামান্যতেই যে পরম সুখে হেসে-খেলে একটি জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, তখন তা জানত গ্রাম-গঞ্জের মানুষ, তামাহাটের, ডিঙ্গডিঙ্গার, কুমারগঞ্জের, পাগলাহাটের, গৌরীপুরের এবং ধুবড়িরও। সত্যিই জানত।

টি. ভি. ছিল না, লাগাতার বিজ্ঞাপন সব মানুষেরই মনে হাজারো মিথ্যা প্রয়োজনের বোধ জন্মে দিয়ে তার মনের শান্তি এমন করে পুরোপুরি নষ্ট করেনি। আত্মীয় বা প্রতিবেশীর ভালতে তখন মানুষ খুশি হতো, মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দর বোধ ছিল। ঈশ্বর নামক কোনো এক আপাত-অলীক শক্তির অস্তিত্ব তাদের প্রত্যেককেই সততা এবং ন্যায়ের পথে চালিত করত।

কে জানে! অনেকগুলো বছর পরে তামাহাটে, ডিঙ্গডিঙ্গায়, কুমারগঞ্জে, গৌরীপুরে অথবা ধুবড়িতে গিয়ে কি দেখবে চখা?

ধুবড়ির বইমেলা উদ্বোধন করতে এসে ও কি ভুল করল?

ভাবছিল ও।

৩

ঘুম ভাঙল হাঁসা-হাঁসির প্যাঁকপ্যাঁকানিতে। কানের কাছে যেন তাদের নিশ্বাসও শুনতে পেল চখা। কত যুগ পরে।

মনে পড়ে গেল, সে নিজে যখন শিশু ছিল এবং রংপুরের পাঠশালাতে পড়ত, সেই সব দিনে ঘরের টিনের দেওয়ালের ফুটো-ফাটা দিয়ে সকালের আলোর রেশ আসামাত্রই চখা ঘরের দরজা খুলে দৌড়ে গিয়ে হাঁসেদের ঘরের দরজা খুলে দিত। তারপর চোখ-মুখ না ধুয়েই হাঁসেদের পেছন পেছন হরিসভার পুকুর অবধি দৌড়ে যেত।

হাঁসেদের মতন সমস্ত শরীরে আন্দোলন তুলে কোনো পাখি বা প্রাণীই চলে না। তাদের দুই পা, পেট, পিঠ, বুক, গলা, ঠোঁট সবই যেন ওদের হেলতে-দুলতে দৌড়ে যাওয়াতে পুরোপুরি সামিল হয়ে যায়।

হরিসভার পুকুরপাড়ে পৌঁছে ওরা যখন এক এক করে উড়ে গিয়ে পুকুরের মধ্যে ঝপাং ঝপাং করে পড়ত চারদিকে জল-উপছিয়ে দিয়ে, তখন ভারি মজা পেত চখা। জলের গন্ধ, পুকুরের চারপাশ থেকে ঝুঁকে পড়ে পুকুরে মুখ-দেখা নানান গাছ-গাছালির গায়ের প্রভাতী গন্ধ, শিশিরের গন্ধ, শামুক আর টাকা-কেন্নোর গায়ের গন্ধ, ঘাসফুলের গন্ধ, হাঁসেদের গায়ের আঁশটে গন্ধর সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যেত তখন। মুগ্ধ চোখে, মুগ্ধ কানে এবং মুগ্ধ নাকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত চখা হাঁসেদের দিকে চেয়ে।

হাঁসেরা মাটির উপরে দৌড়ে যাওয়ার সময়ে তাদের দৌড়ের রকম এক

আর তারা যখন জলে চলে তখন একেবারেই অন্য। হীরে যেমন করে কাচ কাটে, হাঁসও তেমন করে জলের নিস্তরঙ্গ কাচ কেটে দু-টুকরো করে। তাদের দু-পাশে দুটি ঢেউ উঠে ক্রমশই ছড়িয়ে যেতে থাকে পেছনে আর তারা নিষ্কম্প শরীরে গ্রীবা তুলে যেন মন্ত্রবলে অবহেলে এগিয়ে যায় জলের মধ্যে। তাদের শরীর দেখে বোঝা পর্যন্ত যায় না যে, তাদের পা দুটি জলের নিচে আন্দোলিত হচ্ছে। তাদের সাঁতার কেটে এগিয়ে যাওয়া দেখে ছেলেবেলা থেকে 'অবলীলায়' শব্দটির মানে প্রাঞ্জল হয়েছে চখার কাছে।

পিসীমা ঘরে এলেন।

বললেন, এলি কখন কাল? আমি ত ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

ভালই করেছিলেন। এগারোটাতে।

রাতে খেলি কি?

কিছুই খাইনি। ঝন্টু আর কসমিক এবং ঝন্টুর শালা শক্তি আর শালাজ দেবীও অনেক সাধাসাধি করেছিল। কিন্তু অত রাতে কিছু খেতে ইচ্ছে করেনি।

পিসীমাকে আর বলল না যে, কুচবিহার শহরে একবার থেমেছিল পথে পাঁচ মিনিটের জন্যে। চখার প্রথম যৌবনের প্রিয়পাত্রী শেলী যে শহরে থাকে। যাকে সে শেষবার দেখেছিল অনেকই বছর আগে এবং যাকে এ-জীবনে আর কখনও দেখতে চায় না। দেখতে এই জন্যেই চায় না যে, মনের চোখে ও মস্তিষ্কের মধ্যে গন্ধরাজ আর রঙ্গনের ঝড়ের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা বারো বছরের ছিপছিপে, কালো, লজ্জারাঙা শেলীর স্থিরচিত্রটি অস্থির হয়ে যাবে যে শুধু তাই নয়, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। টুকরো হয়ে গেলে আজকের কোনো অ্যারলডাইট দিয়েই সেই ছবিকে যে আর জোড়া দেওয়া যাবে না। তাই।

অনেক কষ্ট থাকে, যা গভীর আনন্দর উৎস হয়ে আজীবন কোনো মানুষের বুকের মধ্যে ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরার ঝাড় হয়ে ফুটে থাকে।

না। কুচবিহার শহরে থেমেছিল কিছু খাবার জন্যে নয়। দীর্ঘ যাত্রার শারীরিক ক্লান্তি, অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষাজনিত এবং তামাহাটে অনেকই বছর পরে প্রত্যাগমনের উত্তেজনাতে অস্থির হয়ে একটি রয়্যাল-চ্যালেঞ্জের বোতল কিনে মিনারাল ওয়াটারের বোতলে মিশিয়ে খেতে খেতে এসেছিল পথে, নিজেকে উজ্জীবিত করার জন্যে। সঙ্গীদেরও দিয়েছিল। স্বার্থপর নয় সে। তাছাড়া এক যাত্রায় পৃথক ফলে বিশ্বাসও করেনি কোনোদিন।

রাতে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। লেপ গায়ে শুয়ে বেশ আরামই লেগেছিল।

দু-কাপ চা খাওয়ার পরে বিছানাতে শুয়ে একটু আলসেমি করল।

শুনতে পেল, পাকঘরের বারান্দাতে কলকণ্ঠের কনফারেন্স বসেছে, কী দিয়ে এবং কেমন করে চখার এত বছর পরে তামাহাটে আসাটাকে খাওয়ার মাধ্যমে স্মরণীয় করে রাখা যায়?

পিসিমা বললেন, ফেনাভাত খাবি তো?

চখার মনে পড়ে গেল রংপুরে তো ব্রেকফাস্ট বলতে ফেনাভাতই বোঝাত। নিজেদের ক্ষেতের চালের সুগন্ধি ভাত। নানা তরকারি সেদ্ধ দিয়ে আর হাঁসের ডিম সেদ্ধ। কলকাতাতে চাইলেও ফেনাভাত এখন পায় কোথায়? কলকাতা তো এখন অ্যামেরিকা হয়ে গেছে। ব্রেকফাস্ট মানেই সীরিয়ালস আর ফ্যাট-ফ্রি স্কিমড-মিল্ক। সেই সীরিয়ালস-এর মধ্যে আবার মুড়ি-চিঁড়ে পড়ে না। দুর্মূল্য প্যাক-এ বিদেশী কোলাবরেশানে তৈরি হওয়া নামী-দামী কোম্পানির সীরিয়ালস। গরম দুধে খই কী মুড়ি বা চিঁড়ে-কলা দিয়ে মেখে খাওয়ার গভীর দিশি আনন্দ থেকে অধুনা কলকাতার ইংরেজ-তাড়ানোর পরে সাহেব-হওয়া বাঙালিরা পুরোপুরিই বঞ্চিত হয়েছে।

চখা বলল, তাই খাব। ফেনাভাত।

তারপর চান করে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল। বাথরুমে বাল্টি করে গরম জল দিয়েছিল ঝন্টুর ভার্সেটাইল বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ড্রাইভার পান্ডে।

চখা তামাহাটে আসবে আসবে বলে ভয় দেখাচ্ছিল বহুবছর হলো, তাই ঝন্টু বছর পাঁচেক আগেই একটি বাথরুমে কমোড লাগিয়েছিল। যদিও কোনো প্রয়োজন ছিল না তার।

অনেক সাহেব-সুবোর সঙ্গে অদ্যাবধি মিশেও চখা এখনও আদৌ সাহেব হয়ে উঠতে পারেনি। কলকাতার প্রচুর পাতি-বাঙালিদের সাহেব হয়ে ওঠার চেষ্টাতে নিরন্তর প্রাণপণ দাঁত-কড়মড় প্রতিযোগিতাতে লিপ্ত দেখে নিজে সাহেব হওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনাই আর পোষণ করে না ও। কারণ ও জানে, পাতিহাঁসেরা পাতিহাঁসই থাকে। কখনওই রাজহাঁস হয়ে ওঠে না তারা।

সকলে রোদে পাশাপাশি বসে বাড়ির গরুর গাওয়া-ঘি দিয়ে পালংশাক, সিম ও আলুসেদ্ধ দেওয়া ফেনাভাত, গোটা চারেক হাঁসের ডিম সেদ্ধ দিয়ে জম্পেস করে সকালের খাওয়া সারার পরে ঝন্টু বলল, চল চখাদা, কোথায় যাবে? বিকেলে তো আবার ধুবড়ি থেকে বর নিতে আসবেন ওঁরা। সাতটার সময়ে।

ওঁরা মানে?

'সবুজের আসরের' উদ্যোক্তারা—যাঁরা প্রথম বইমেলা করছেন। তুমি তো তাঁদেরই নিমন্ত্রণে আর খরচে এসেছ। না, কি?

আর কাকে কাকে বলেছেন ওঁরা? মানে, কবি-সাহিত্যিক?

চখা জিজ্ঞেস করল।

ঝন্টু বলল, শুনেছিলাম অমিয়ভূষণ মজুমদারকে বলেছিলেন। তবে তিনি নাকি শারীরিক কারণে আসতে পারছেন না। নিমাই ভট্টাচার্যকেও নাকি বলেছেন।

তুই জানলি কি করে?

ধুবড়ির ছাতিয়ানতলার বাড়িতে ফোন করেছিলাম। আমার জ্যাঠতুতো ভাই রাজার স্ত্রী রুবী বলল।

করে কি রাজা?

স্টেট ব্যাঙ্কে কাজ করে।

বাবাঃ। রাজারও বউ। কত ছোট ছিল।

তা কি হবে। রাজারই যদি রাণী না থাকে তো, থাকবে কার?

ঝন্টু বলল।

তা ঠিক।

চখা বলল।

চখা তারপরে বলল, এইরকম স্ট্র্যাটেজিক ভুল কেউ করে। ধুবড়ির "সবুজের আসরের" কর্তাদের যদি বুদ্ধি থাকত তবে আমার আর নিমাইদার মতন ফালতু লেখককে ওঁরা নেমন্তন্ন করতেন না।

'ফালতু' বলছ কেন?

বড় কাগজে যাঁরা চাকরি না করেন বা যাঁরা তাঁদের পেটোয়া নন, সেই সব লেখক, গায়ক শিল্পী, খেলোয়াড় সকলেই তো ফালতু।

তাই কি হয় নাকি?

এমন সময় দাতু, চানু আর চোগা এসে হাজির। দাতু বলল, মায়ে পাঠাইয়া দিল, আমাগো বাসায় চলো আগে।

চল। নিশ্চয়ই যাব।

চখা বলল।

দাতু, বৈদ্যকাকুর ছেলে। বৈদ্য দত্ত। মাতৃপিতৃহীন স্বল্পবিত্ত সদাহাস্যময় পুরুষ ছিলেন। পরোপকারী, দাবিদাওয়াহীন। শত অপমানেও নিরুত্তর। এক

আশ্চর্য চরিত্র ছিলেন তিনি। কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। বড় বড় লাল চোখ। অথচ নেশা-ভাং করতেন না। কাটা-কাটা চোখ-মুখ।

সেই চখা-প্রিয় বৈদ্যকাকুর সঙ্গেই বিয়ে হলো রংপুরের রাজপিসির বা অনু বোস-এর। দেশভাগের বছরই। রংপুরে হলো বিয়ে। আর বিয়ের পরদিনই রংপুর থেকে তামাহাটে এসে বর কনের ফুলশয্যা হলো। গোলাপের পাপড়ি ছাড়িয়ে দিয়েছিল ছবিদিরা ফুল-লতাপাতা-তোলা রেশমী বেডশীটের উপরে। পরিষ্কার মনে আছে চখার। রাঙাপিসির মতন সরল ভালমানুষ প্যাঁচঘোঁচহীন গ্রাম্য মেয়েও তখনকার দিনে কমই ছিল।

আজ বৈদ্যকাকু নেই। অনেকেই নেই, যাঁরা তখন ছিলেন। মনে মনে নিজেকে অভিসম্পাত দিচ্ছিলেন চখা এত বছর পরে তামাহাটে আসাতে। কোনো জায়গাতেই এত বছর পরে আর কখনওই ফিরে যেতে নেই বোধহয়।

একবার ওর মনে হলো, এসে আদৌ ভাল করেনি এখানে এবং মনে হলো ধুবড়িতে গিয়েও বোধহয় ঠিক এমনই মনে হবে।

পায়ে হেঁটেই গেল দাতুর সঙ্গে বৈদ্যকাকুর বাড়িতে।

রাঙাপিসির চুল পেকে গেছে, দাঁত পড়ে গেছে। যে জমিতে একটি মাত্র ঘর ছিল আর একটু দূরে রান্নাঘর, সেইখানেই অনেক ঘর হয়েছে। মাঝে উঠোন। পাশেই হাস্কিং মেশিন চলছে। তার পুপ পুপ পুপ পুপ শব্দ উঠছে গভীর রাতের খাপু পাখির ডাকের মতন অবিরাম। দাতুর বড়দিদি বুড়ুর বিয়ে হয়েছিল ধুবড়িতে। তার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল চখার কলকাতাতেই, ঢাকুরিয়ার বিভাপিসির ছেলের বিয়েতে।

তোর বর কোথায়?

একাই সেই বিয়ের রাতে বুড়ুকে জিজ্ঞেস করাতে বুড়ু দার্শনিকের মতন বলেছিল, "ওমা! তুমি শোনো নাই নাকি। সে ত কবেই পটল তুলছে।"

বাক্যটি মনে গেঁথেছিল। কুড়ির কোঠার কোনো মেয়ে স্বামীবিয়োগ যে সে এমন ফিলসফিকালি নিতে পারে, তা জেনে বুড়ুর প্রতি একধরনের শ্রদ্ধা জন্মে গেছিল চখার।

চখা ভাবছিল যে, প্রত্যেক মানুষের জন্মের মুহূর্তের মধ্যেই তার মৃত্যুও অবিসংবাদী হয়ে নিহিত থাকে। আমরা শুধু জানি না সেই মুহূর্ত কখন আসবে। অথচ সেই বিদায়ক্ষণ নিয়ে চখার মতন সাধারণ মানুষদের কম নাটুকেপনা নেই। সেই ক্ষণকে বিলম্বিত করার লজ্জাকর চেষ্টারও কোনো বিরাম নেই। চখার মতন

মানুষের এবং অতি সাধারণ সব পশু-পাখি কীট-পতঙ্গেরই মতন বেশিদিন বাঁচার ইচ্ছার এই লজ্জাকর মানসিকতা ওকে সত্যিই পীড়িত করে। জন্মেরই মতন সহজে মৃত্যুকে নিতে যে পারে না কেন মানুষে, সেকথা ভেবে আশ্চর্য হয় ও।

দাতুর বৌ কলকাতার মেয়ে। এখানে এই গণ্ডগ্রামে থাকতে চায় না। দাতু, হাতে চামড়ার একটা ছোট্ট ব্যাগ নিয়ে ঘুরে ঠিকাদারী করে এখানে-ওখানে। দাতুর পরের ভাই, তার নাম ভুলে গেছে চখা, কুড়ির কোঠাতে থাকতেই বেশি পরিমাণে দিশী মদ খেয়ে সুন্দরী বৌকে বিধবা করে পরপারে চলে গেছে।

বৌটিকে ভাল লাগল চখার।

রাঙাপিসি বললেন, আরে মাইনষে খায়, খায়, একটু মাইপ্যা-জুইপ্যা খা। তা নয়। বৌটারে ভাসাইয়া থুইয়া গেল।

বৌ ডানাকাটা পরী নয় কিন্তু এক বিষাদমলিন সৌন্দর্য আছে তার। তাছাড়া, যৌবনে সব মানুষই সুন্দর। যৌবন চলে গেলে, এই দুঃখময় সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করে দুঃখ পেতে হয়।

চোখ দিয়ে কথা বলে সে মেয়ে। মুখে নীরব।

উঠোনের মস্ত কাঁঠালি চাঁপা গাছের নিচে তার হলুদ-কালো ডুরে শাড়ি-পরা চেহারাটি অনেকদিন চখার মনের চোখে ধরা থাকবে। সেই বৌটি প্রাইমারী স্কুলে পড়ায়। তার একটিই ছেলে। ভাল শিক্ষা দিয়েছে মনে হলো ছেলেটিকে। সভ্য-ভব্য। বিধবা মায়ের ভবিষ্যৎ।

কিন্তু এই বয়সের সুন্দরী বিধবা যে কেন আবারও বিয়ে করে, যে জীবন তার কোনোরকম দোষ ব্যাতিরেকেই উৎপাটিত হয়েছে, তাকে নতুন করে অন্য কোনো মাটিতে রোপণ করে নতুন করে বাঁচবে না তা চখা বুঝতে পারে না। অবশ্য সেই ইচ্ছা যদি তার থাকে।

এদেশে আজও অনেকই বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন আছে।

মনে হলো চখার।

আরও এক ছেলে আছে রাঙাপিসীর। সেও ঠিকাদারী করে। তারই হাস্কিং-মেশিন। তাকে দেখে মনে হয় ম্যাটার অফ-ফ্যাক্ট। এ যুগের উপযুক্ত। তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো না। হয়তো বাড়িতে ছিল না।

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই তার চরিত্রে পরিণতি আসার পরে রক্তের আত্মীয়তার থেকে আত্মার আত্মীয়তাই বড় হয়ে ওঠে। এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই। যার মানসিক উন্নতির উচ্চতা যত বেশি, সেই অনুপাতে অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই, অত্যন্ত উচ্চশিক্ষিত এবং সমমনস্ক মানুষেরা ছাড়া তার অন্যান্য রক্তের আত্মীয়রা যতই দিন যায়, ততই দূরে সরে যেতে থাকে। এর চেয়ে বড় দুঃখময় সত্য মানুষের জীবনে হয়তো সত্যিই বেশি নেই। যারা তথাকথিত "পর" তারাই দেখা যায় ধীরে ধীরে "আপন" হয়ে ওঠে আর আপনেরাই পর।

ঝন্টু বলল, এবারে যাবে নাকি বরবাধায়?

বরবাধার জঙ্গলে?

হ্যাঁ।

চল।

কিন্তু যাওয়ার আগে স্কুলে একটু ঘুরে যেতে হবে।

স্কুলে?

হ্যাঁ।

কেন?

তারপর সেই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা না করেই চখা বলল, বাচ্চুদের আর চানুদের বাড়ি একবার গেলে হতো না?

বাচ্চুরা তো ধুবড়িতেই থাকে।

ওর বৌ? পাণ্ড? সেই যে গান গাইত না একটা? "যেন কার অভিশাপ লেগেছে মোর জীবনে।"

গানটার কথা আজও মনে আছে তোমার?

চখা বলল, আছে রে আছে। কিন্তু গান, কিছু কথা, মনের জমি যখন নরম থাকে তখন তাতে চেপে বসে যায়। সারাজীবন বসে থাকে।

ঝন্টু বলল, ওরা সকলেই ধুবড়িতেই থাকে। ওদের মেয়ে টুলটুলও থাকে। মেয়েটা সুন্দরী হয়েছে। সাজেও সুন্দর। টুলটুল খুব ভাল নাচে। সুন্দর ফিগার। ওদের এক কন্যা। জামাইও নানারকম বাজনা বাজায়। অর্কেস্ট্রা কনডাক্ট করে। ভাল ছেলে—স্বাস্থ্যবানও। দুজনের মধ্যে খুব ভাব-ভালোবাসা। দারুণ হ্যাপিলি ম্যারেড ওরা।

বাবাঃ! তুই তো অনেক বুঝিস আজকাল!

চখা বলল।

ঝন্টু বলল, বুঝি ঠিক না। তবে দাম্পত্যর রকম কি আর বাইরে থেকে বোঝা যায় বল? একের চোখে অন্যের দাম্পত্য হচ্ছে চিড়িয়াখানার খাঁচার মধ্যে শুয়ে-থাকা বাঘ। খাঁচার বাইরে বেরুলে তার কী রূপ সে শুধু SPOUSE-ই

জানে একমাত্র।

ঝন্টু আরও বলল, দেখা হবে ওদের সকলেরই সঙ্গে ধুবড়ি গেলে। আর চানু মিঠু তো আসবেই দুপুরবেলাতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে। আরও কত জনে আসবে। দেখো, ভেঙে পড়বে তামাহাট।

তাই? তবে তো চিন্তার কথা হলো।

কেন?

আমি যে ইতিমধ্যেই আধভাঙ্গা হয়ে গেছি। বাগডোগরা থেকে আসার পথেই আমার মেরুদণ্ড গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। পরীক্ষা করালে কী যে বলবেন ডাক্তারেরা কে বলতে পারে।

ঝন্টু বলল, কলকাতার ডাক্তারদের কথা ছাড়ো। তাদের অধিকাংশরই উচিত ছিল নরকঙ্কালের ব্যবসা করে বড়লোক হওয়া। অধিকাংশই টাকা ছাড়া কিছুই বোঝে না। আমার পতু মামাকে কী করে মারল তারা!

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, নকশালদের আসার সময় আবার। ওঁরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। গুলি করে মারা দরকার ওঁদের অনেককেই। এমনই বিবেকহীন অর্থগৃধ্নু হয়ে গেছেন অধিকাংশ ডাক্তারই।

কথাটা মিথ্যে বলিসনি। তবে ব্যতিক্রম এখনও আছে। ভাগ্যিস।

সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। এবারে চলো চখাদা। দুপুরে খেয়ে একটু জিরোবে তো? রাতে তো ঘুম হয়নি নতুন জায়গাতে।

তা ঘুমোব। তবে জায়গা তো নতুন নয়। কিন্তু বহু পরিচিত জায়গাতেও বহুদিন পরে এলে তা নতুন মনে হয় বৈকি। দূর দেশে থাকার পর ফিরে এসে নিজের বৌকেও নতুন বলে মনে হয়। আর তামাহাটিকে তো নতুন মনে হবেই।

তারপরে চখা বলল, নদীর ধারেও একবার নিয়ে যাবি না? কাল আসবার সময়ে গঙ্গাধর নদীর কথাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম চোখ বুজে। সব কি খুব বদলে গেছে? আগের মতন কি কিছুই নেই?

চলো যাই। নিজের চোখেই দেখবে।

বাড়িতে ছোট শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে ঝন্টু প্রতি বছরই শিবরাত্রির সময়ে নাকি আসে তামাহাটে। সে ধানবাদেই থাকুক, কী ঘেটো-টাড়ে, কী কলকাতার বরানগরে। পিসীমা থাকাকালীন অবশ্যই আসবে। পরের কথা শুধু ভবিষ্যৎই জানে! শহরে যে একবার সেঁধিয়েছে সে আর গ্রামে ফিরতেই চায় না। অথচ কেন যে, তা ভেবেই পায় না চখা।

নদীর পারে যেতে নৃপেন্দ্রমোহন মিত্র প্রাইমারী স্কুল এবং তিনকড়ি মিত্র হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলও পড়বে। স্কুলের মাস্টারমশাইরা ঈদের ছুটি থাকা সত্ত্বেও তুমি এসেছে শুনে স্কুলে অপেক্ষা করছেন তোমারই জন্যে স্কুল খুলে।

ঝন্টু বলল।

তাই?

হ্যাঁ।

দুটি স্কুলেই গেল ওরা। গাড়িতেই গেল। চখার পিসীমা প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি দান করেছেন এই দুই স্কুলের জন্যে। খেলার মাঠও। তবে গঙ্গাধর প্রতি বছরেই খেলার মাঠকে খাবলে খাবলে খেয়ে যাচ্ছে অনেকখানি করে। নদী যদি গতি না বদলায় তবে বছর পঁচিশের মধ্যে সেকেন্ডারী স্কুলটি নদীর গর্ভে চলে যাবে।

হেডমাস্টারমশাই-এর ঘরে বসে নদী দেখতে পাচ্ছিল চখা। তবে নদীকে চেনা যায় না। এদিকেই চর ফেলেছে। বিস্তীর্ণ। এতদিন পরে এলে কোনো নদী বা নারীকে চিনতে না পারাটাই যে স্বাভাবিক সেকথা অবশ্য বোঝে চখা। অনেকই দিন পরে কোনো প্রিয় নদী অথবা নারীর কাছে যদি না এসে পারা যায়, তবে না আসাই ভাল। দুজনের পক্ষেই ভাল। সময়, সময়ে সময়ে আনন্দ যেমন দেয়, সময়ে সময়ে দুঃখও কম দেয় না।

রতু জ্যেঠুর ছোট ছেলের স্ত্রী সেকেন্ডারী স্কুলের শিক্ষিকা। সে আবার কবিও। কবি অবশ্য আজ হয়নি। যখন ক্লাস নাইনে পড়ে, তখনই ১৯৭৫-এ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নাম নীলিমা। আগে সাহা ছিল, এখন বিশ্বাস হয়েছে। তারপরে প্রেম করে বিয়ে। এবং তার পরে সাধারণতঃ যা হয়, কবিতার ভরা নদীতে ভাঁটা পড়ে। তবে নীলিমার স্রোত এখনও আছে। তবে কোন দিকে চর ফেলেছে আর কোন দিকে ভাঁটা, এখনই বলা মুশকিল। তার বয়সও তো বেশি না। তিরতির করে জল বয় এখনও সেই কাব্যি-নদীতে। ভারী উচ্ছল মেয়ে নীলিমা। তার একখানি বই, "বাস্তবের দর্পণ" দিল চখাকে মতামতের জন্যে। এবং লিখিত মতামতের জন্যে।

বিপদে পড়ল চখা। প্রথমত ও কবি নয় বলে। দ্বিতীয়ত প্রতিদিন অপরিচিত এত কবি ও লেখক তাঁদের বই পাঠিয়ে মতামত চান যে, সময় করে ওঠা সত্যিই অসম্ভব। আরও বিপদ যে, ও মিথ্যাচারী নয়।

নীলিমা যেদিন নামী কবি হবে সেদিন এই কথা নিজেও বুঝবে। তাছাড়া, চখা চক্রবর্তী যেহেতু কবি নয়, কবিতা সম্বন্ধে মত সে দেবেই বা কেমন করে!

নীলিমা মতামত চাইল বারংবার তার বইটি দিয়ে, চখার কাছ থেকে।

একটু ভেবে, চখা তাকে কবি দিব্যেন্দু পালিতের ঠিকানা দিয়ে দিল এবং তাঁর মতামতের জন্যে কাব্যসংকলনটির একটি কপিও পাঠিয়ে দিতে বলল কলকাতাতে। তিনি যদি তাঁর মূল্যবান মতামত দেন তাহলে এই তরুণী কবি বিশেষ উপকৃত হবে। সে এই কথা লিখতে বলল চিঠিতে।

তিনি কি খুব বড় কবি?

আমি নিজে তো কবি নই। কি করে বলি বল? তবে বড় কবিদের সঙ্গেই ওর ওঠা-বসা। তাছাড়া দিব্যেন্দু পালিতের কবিতার বই যখন আনন্দ পাবলিশার্স ও দে'জ পাবলিশিং থেকে বেরোয় তখন তিনি যে মস্ত কবি, সে-বিষয়ে কারোই কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়।

উনি যদি উত্তর না দেন?

ন্যায্য প্রশ্ন করল নীলিমা।

না-দেওয়াটাই স্বাভাবিক। বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিকেরা প্রতি দিনে এত চিঠি ও বই পান যে, তাঁদের সকলেরই চিঠির উত্তর বা বইয়ের সম্বন্ধে মতামত দিতে হলে তাঁদের নিজেদের আর কোনো কাজই করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বিখ্যাতরাই জানেন একমাত্র তাঁদের সমস্যার কথা, অপারগতার কথা এবং দুঃখের কথা। তবে অমন ব্যস্ততার মধ্যেও কেউকেউ দেনও উত্তর মাঝে মাঝে। সব চিঠির না হলেও কিছু চিঠির উত্তর অত্যন্ত কষ্ট করেও দেন।

দিব্যেন্দু পালিত তো শুধু কবি নন, তিনি তো গদ্যকারও।

প্রাণেশ বলল। চানুর বন্ধু।

অবশ্যই। এবং শুধু গদ্যকারই নন, তাঁর ছোট গল্প বিখ্যাত পত্রিকাতে আমরা প্রথম পড়েছি, যখন কলেজে পড়ি, তখন।

বাবাঃ! এতো তো জানতাম না। ওঁর বয়স কত হবে? পঁচাত্তর?

নীলিমা বলল।

হেসে ফেলল চখা।

বলল, দিব্যেন্দু নিজে বলেন পঞ্চাশ। আমার মনে হয় আরও কম। দিব্যেন্দু পালিতও আনন্দবাজারের মস্ত অফিসার। উনি কাজ করেননি এমন খবরের কাগজ ও বিজ্ঞাপন কোম্পানি কলকাতায় খুব বেশি নেই। খুব ভাবনা-চিন্তাও করেন। রীতিমতো চিন্তাবিদ্ বিদগ্ধ মানুষ। তাঁর হাঁটা-চলা, কথা বলা, দাঁড়ানো সবকিছুর মধ্যেই এই বৈদগ্ধ ফুটে ওঠে। নিজের ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্তই সচেতন।

উনি আর কারো মতনই লেখেন না বাংলা। ওঁর বাংলা সম্পূর্ণ নিজস্ব।

তাই?

শ্রদ্ধামিশ্রিত বিস্ময়ের সঙ্গে বলল নীলিমা।

তারপরই বলল, চিন্তা যে করেন তা তাঁর টাক দেখলেই বোঝা যায়। মাথায় একটিও চুল নেই।

চিন্তাবিদদের মধ্যে অধিকাংশরাই টেকো হন। রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, সত্যেন বোস আর শরৎবাবুরা যদিও একসেপশান।

হেডমাস্টারমশাই বললেন।

চানুর বন্ধু প্রাণেশ বলল, সে কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছে ক'দিনের জন্যে, ছিঃ ছিঃ, কার সঙ্গে কার তুলনা মাস্টারমশাই! দিব্যেন্দু পালিতের নামের সঙ্গে শরৎবাবুর নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করলেন। ভাগলপুরে থাকতেন বলেই কি দুজনে সমান হলেন! আপনি আর কারো সামনে একথা বলবেন না মাস্টারমশাই! দিব্যেন্দু একজন জ্যোতিরিন্দু ইনটেলেকচুয়াল। লেখা নিয়ে উনি কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন সবসময়ে। ভাষা সম্বন্ধে কত সচেতন উনি। তুলনামূলক সাহিত্যের এম.এ.। বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্তদের মতো দিকপালদের কাছে বাংলা এবং পৃথিবীর সাহিত্য পড়েছেন। ওঁর সঙ্গে ডিগ্রীহীন শরৎ চ্যাটার্জির তুলনা যিনি করেন তিনি আকাট আনকালচারড! একটি স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে আপনি এ কথা কী করে বললেন? ছিঃ! শরৎবাবু আবার কোনো লেখক নাকি? ছ্যা! ছ্যা! আর শরৎবাবু তো মেয়েদের লেখক। ওঁর লেখা তো সেন্টিমেন্টাল। ট্র্যাশ।

ঝন্টু এবারে হাঁফ ধরে যাওয়াতে বলল, এ সবকিছুই কিন্তু আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি মিস্ত্রী মানুষ। এবারে ওঠো চখাদা। সব বিষয়ই কি সকলের হজম হয়। তুমি এর পরের বারে হাতে সময় নিয়ে এসো। তখন এইসব আলোচনা কোরো প্রাণেশের সঙ্গে, মাস্টারমশায়দের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। এবারে ক্ষ্যামা দাও। সকালের ফেনাভাতই আমার হজম হয়ে গেল।

আমি তো কিছুই বলিনি। আলোচনা তো করছিলেন হেডমাস্টারমশাই আর প্রাণেশ। আমিও কি লেখক নাকি! এসব আলোচনা করার এক্তিয়ারই নেই আমার। আমি ভাল করেই জানি আমার বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড়।

নীলিমা ওদের উঠতে দেখে বলল, আচ্ছা চখাদা, দিব্যেন্দু পালিত কি বুদ্ধদেবের ভাই?

কোন বুদ্ধদেব? সরোদিয়া বুদ্ধদেব-এর কথা বলছ কি? এখন তো

বঙ্গভূমে বুদ্ধদেবের ছড়াছড়ি। মন্ত্রী, দাশগুপ্ত-স্কোয়ার, গঙ্গোপাধ্যায়, আরও কত।

চানু বলল, না, না, ফিল্ম ডিরেক্টর। সরোদিয়া বুদ্ধদেববাবুর মাথার চুলে তো চিরুনি চালালে চিরুনি ভেঙে যাবে। শুনছ না? হচ্ছে টাকের কথা! উইথ রেফারেন্স টু দ্যা কনটেক্সট কথা বল।

বলেই, হো হো করে হেসে উঠে বলল, বলেছ ঠিক। তবে, দুজনের—দিব্যেন্দু পালিত এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের চেহারার মধ্যে আশ্চর্য মিল আছে। তবে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দু পালিতের মতন মোটা ফ্রেমের চশমা পরেন না আর বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর টাকটি দিব্যেন্দুবাবুর টাকের মতন অত চকচকেও নয়।

ইংরেজির মাস্টারমশায় তাঁর নিজের টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, টাক চকচকে কি করে করা যায় বলুন তো? আমার টাকটা বড়ই ম্যাড়ম্যাড়ে।

চানুর সবজান্তা বন্ধু প্রাণেশ বলল, 'MIN' নামের একটি Polish পাওয়া যায়। সপ্তাহে দু দিন লাগিয়ে শ্যাময় লেদার দিয়ে ঘষবেন, দেখবেন টাক একেবারে ঝিকমিক করবে।

আর দাড়ি চকচকে করতে হলে কী করতে হয়? মানে, জেল্লা আনতে?

ইতিহাসের মাস্টারমশায় বললেন।

দাড়ি চকচকে করতে হলে কি করতে হয়?

আবারও প্রশ্ন হলো।

স্কুলের সামনের বাগানের মধ্যে বিচরণরত একটি স্মার্ট এবং ইন্টেলিজেন্ট দাড়িওয়ালা পাঁঠার দিকে চেয়ে এবং নিজের দাড়িতে আদরে হাত বুলিয়ে এবারে প্রশ্ন করলেন, ভূগোলের সুগোল শিক্ষক।

চানু বলল, দাড়ি চকচকে করার মতন সোজা কাজ আর কিছুই নেই।

কী রকম?

সপ্তাহে তিন দিন বৈদ্যনাথের চ্যবনপ্রাশ লাগাতে হবে মাত্র এক চামচ করে, সঙ্গে চার ফোঁটা রেড়ির তেল।

বোগাস।

রতু জ্যেঠুর ছোট ছেলে বাবলা বলল এবারে।

চখা লক্ষ্য করল দীপ আগাগোড়া চুপ করেই রইল। ও শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চখাকে দেখে যাচ্ছে। চখা যেন চিড়িয়াখানাতে নতুন-আসা কোনো দুষ্প্রাপ্য জন্তু।

ঝন্টু দাঁড়িয়ে উঠে ঈষৎ বিরক্ত গলাতে বলল, চখাদা, তোমাকে নিতে কিন্তু ওঁরা সাতটার আগেই ধুবড়ি থেকে এসে হাজির হবেন। এদিকে সাড়ে এগারোটা

বেজে গেল। বরবাধা থেকে ফিরতে ফিরতে দেড়টা-দুটো হয়েই যাবে। তারপর খাবে-দাবে। অনেকে আসবে তোমার সঙ্গে দেখা করতেও। কাল তাঁরা রাত দশটা অবধি অপেক্ষা করে চলে গেছেন। তুমি তো এলেই রাত সোয়া এগারোটা বাজিয়ে। তার উপর মরনাই চাবাগানেও তো যাবে একবার ব্যানার্জি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। কি যাবে না?

ভেবেছিলাম।

তো চলো। আর দেরি করলে আমার টেনশান হয়ে যাচ্ছে। বর নিতে এসে কি তাঁরা বসে থাকবেন?

বর নিতে এলে কি হবে? নীতবর ছাড়া তো বর যাবে না! তুই পারফ্যুম-টারফ্যুম এনেছিস তো? ঘেমো-গন্ধ নীতবরকে নিয়ে আমি বিয়ে করতে যাব না কিন্তু।

দীপ, চানু, প্রাণেশ এবং স্কুলের সব মাস্টারমশাইয়েরাই হেসে উঠলেন একসঙ্গে চখার কথা শুনে।

ঝন্টুর সাদা টাটা মোবিল গাড়িটা সেকেন্ডারী স্কুল এবং প্রাইমারী স্কুল পেরিয়ে তামাহাট-এর হাট-এর সামনে এসে ডিঙ্গডিঙ্গার দিকে রওয়ানা হলো।

চখা, পাণ্ডে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছিল সামনে। এই পথ দিয়ে কতবার কত জায়গাতে যাবার স্মৃতি শীতে গ্রীষ্মে বর্ষাতে যে আছে, তা মনে পড়ে গেল। চখার বাবা, রতুজ্যাঠা, বৈদ্যকাকু, বাবার আরবান ইনফ্যানট্রির বন্ধু অজিত কাকু, হাওড়ার অজিত সিং, বাগচীবাবু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বাগচী, তাঁর ছেলে গামাবাবু, অহীন চৌধুরী, ধুবড়ির আবু ছাত্তার, মোটাসোটা কাসেম মিঞা, বাপ্পু, আরও কত মানুষের স্মৃতি!

মনটা বিধুর হয়ে এল নানা কথা ভাবতে ভাবতে।

ঝন্টু বলল, কী হলো? কথা বলছ না যে, শরীর খারাপ লাগছে না কি?

নাঃ। ভাবছি।

তারপর বলল, এটা কি জায়গা?

নুয়াহাট বা নুয়াবাজার বলতে পার। ডিঙ্গডিঙ্গার আগে এই নতুন জায়গার পত্তন হয়েছে। আস্তে আস্তে মানুষে ভরে যাবে সারা পৃথিবী। গাছ থাকবে না, পাখি থাকবে না, মাঠ থাকবে না, বন থাকবে না। ভাবলেও খারাপ লাগে।

যা বলেছিস। তারপর বলল, বুঝলি, সেদিন কলকাতার বইমেলাতে দে'জ পাবলিশিং-এর স্টলের সামনে বসে অটোগ্রাফ দিচ্ছি পাঠক-পাঠিকাদের কেনা

বইতে, এমন সময়ে এক সুন্দরী ভদ্রমহিলা সঙ্গে একটি অল্পবয়সী সুন্দরী যুবতীকে নিয়ে এসে "আলোকঝারি"-র একটি কপি সই করতে দিয়ে অল্পবয়সী মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন, এ হচ্ছে ডিঙ্গডিঙ্গার মেয়ে, কলকাতার বউ।

চখা সেই বইয়ের উপরে লিখে দিল 'ডিঙ্গডিঙ্গার মেয়েকে"। তারপরে সই করে দিল। মেয়েটির নামও লিখেছিল জিজ্ঞেস করে, কিন্তু শ'য়ে শ'য়ে নাম সই করতে হয়েছিল বইমেলায় অটোগ্রাফ দেবার সময়ে, তাই নামটি মনে করতে পারল না। তবুও ঝন্টু, চানু, দীপ ইত্যাদিদেরও বলল সে-কথা।

চানু বলল, বরবাধাতে চলেন আগে। ফেরার সময়ে মরনাইতে চুইক্যা দেখা যাব'খন, ডিঙ্গডিঙ্গার সে কোন মাইয়া।

মরনাই চা-বাগানটা তো মস্ত বড় হয়ে গেছে!

স্বগতোক্তি করল চখা।

হ্যাঁ। পথের দু পাশেই ছড়িয়ে গেছে। মিশনের বাগান তো!

এই বাগানের ডিরেকটরস বাংলো বা গেস্ট হাউস নেই? এখানে এসে ক'দিন নিরিবিলিতে লেখালেখি করা যেত।

হ্যাঁ। থাকবে না কেন? তবে চা-বাগানেই যদি থাকবে ত বাগডোগরা বা নিউ কুচবিহার থেকে এত ঝক্কি করে এত দূরে আসতে যাবে কোন দুঃখে। ডুয়ার্স এবং আপার-আসামে এবং দার্জিলিং-এর পাহাড়েও তোমাকে কত লোকে আদর করে ডেকে নেবে একবার জানতে পারলে।

চখা বলল, তবু মরনাই, মরনাই-ই। মরনাই, ডিঙ্গডিঙ্গা, বরবাধা এসব নামগুলি আমাকে বড়ই নস্টালজিক করে তোলে রে। যাঁদের সঙ্গে এসব জায়গায় এসেছি, ঘুরেছি, একসময়ে শিকারও করেছি কচুগাঁও ডিভিশানে, শিকার তখন ছিলও প্রচুর এবং আইন মেনেই করেছি, সেই সব মানুষদের একজনও তো আর নেই আজ। মন বড় ভারাক্রান্ত লাগে তাঁদের কথা মনে হলে। কত হাসি, গল্প, মজা, গান!

তারপর বলল, ইসস। ভাবাই যায় না। ডিঙ্গডিঙ্গা কত বড় জায়গা হয়ে গেছে রে! আগে যখন ডিঙ্গডিঙ্গার হাটে আসতাম তখন কত ছোট্ট হাট লাগত এখানে।

এখন তো সব নামেই হাট। সপ্তাহে রোজই বাজার বসে বলতে গেলে। তবু হাটও বসে।

গুমা রেঞ্জের বরবাধার বাংলোর সামনে এসে যখন পৌঁছনো গেল, ছোট নদীটা পেরিয়েই পথ ডানদিকে মোড় নিয়েছে, ডানে বনবিভাগের বাংলো।

রেঞ্জারের। সঙ্গে আরও কয়েকটি ছোট ছোট ঘর দেখল। নতুন হয়েছে কি? আগে ছিল কি না মনে করতে পারল না। হয়তো অফিসই হবে।

চখার মনে পড়ে গেল আগল-খোলা শ্রাবণের এক দিনে এই বরবাধারই রেঞ্জারের বাংলোতে একটি দুপুর কাটিয়ে গেছিল। ঝন্টুর জ্যাঠতুতো দিদি আর তিদির স্বামী শচীন জামাইবাবু তখন রেঞ্জার ছিলেন এখানকার। খাওয়া-দাওয়া, গান। মনে আছে চখার সমবয়সী এবং ওর চেয়ে বয়সে বড় অনেক মহিলারা ছিলেন। হয়তো ইতু, বেবি, ভারতীদি, আবিদি, আরও কেউ কেউ। কেয়া আর কদমের গন্ধে ম' ম' করছিল দুপুর। বেতবন ছিল ঐ ছোট নদীটির ধারে ধারে। ঘন। সাপের আড্ডা ছিল বেতবনে। স্কুলের ছাত্র চখাকে যেতে মানা করেছিলেন জঙ্গলে একা একা শচীন জামাইবাবু। বলেছিলেন চিতা আর বড় বাঘ অনেক আছে।। সাপের তো কথাই নেই।

তারও অনেকদিন পরে এক রাত ছিল এই বাংলোতেই এসে আবু ছাত্তারের সঙ্গে। তখন সে কলেজের ছাত্র। জোড়া চিতাবাঘ মেরেছিল ওরা সপসপে চাঁদ-ভেজা শ্রাবণের চকচকে সেই উদলা,•উজলা রাতে।

কিন্তু জঙ্গল দেখে মন খারাপ হয়ে গেল চখার। কেটে সব সাফ করে দিয়েছে। বাংলোর কাছে রাস্তার ধারে কিছু জায়গাতে "ফিফটিন-টুয়েন্টি ডিপ" আছে, শালের জঙ্গল। তার ওপাশেই ফাঁকা।

চানু বলল,আরও আগে গেলে আরও ফাঁকা।

চখা বলল, আরও আগে যাবার আর ইচ্ছে নেই। না এলেই ভাল করতাম। যখন স্কুলে পড়তাম তখন দিনের বেলাতেও এই পথ দিয়ে বন্দুক হাতে হাঁটতে গা ছমছম করত।

তারপরে স্বগতোক্তিরই মতন বলল, যমদুয়ারে যাওয়ার বড়ই ইচ্ছা ছিল রে ঝন্টু। যাওয়া কি যায় না, থাকা যায় না এক রাত?

মানাস অভয়ারণ্য দেখতে গিয়ে এক শুক্লা চতুর্দশীর রাতে বড়পেটা রোডে মানাস ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অধিকর্তা সঞ্জয় দেবরায় সাহেবের বাংলোতে বসে সংকোশ নদী আর যমদুয়ারের প্রশংসা করে তাঁর ভীষণই বিরাগভাজন হয়ে গেছিল চখা। মানাস ছিল দেবরায় সাহেবের দেবভূমি। মা-বাবা, অনূঢ়া কন্যা, স্ত্রী সবই। যে-কোনো দেশই অমন একজন কনসার্ভেটর এবং ফিল্ড-ডিরেক্টরকে নিয়ে অবশ্যই চিরদিন গর্ব করতে পারে। রাজ্য হিসেবে আসাম তো অবশ্যই পারে। ভারতের নানা রাজ্যের অনেকেই টাইগার-প্রজেক্টের ফিল্ড-ডিরেকটরকে

দেখেছে চখা, প্রত্যেকেরই নাম করতে চায় না কিন্তু তাঁদের মধ্যে দু-একজন পয়লা-নম্বরী চোর। বনের রক্ষক হয়েও ভক্ষক। এই ধরনের আমলাদের গুলি করে মারা উচিত উনিশশো বাহাত্তরের পরেও যাঁরা বন্যপ্রাণী ও পাখি শিকার করেন, সর্বার্থেই অশিক্ষিত সেই সব চোরা-শিকারীদেরই সঙ্গে। কিন্তু মারছেটা কে? সর্ষের মধ্যেই যে ভূত ঢুকে গেছে। ভারতের সব বনই এখন তামিলনাড়ু আর মাইসোরের ভীরাপ্পানদের খপ্পরে। রাজ্যভেদে তাদের নাম আলাদা এই যা। প্রকৃতিই যে আমাদের মা, অন্য মা, অরণ্যই যে আমাদের শেষ আশ্রয়, প্রশ্বাস নেবার শেষ জায়গা, এক জোড়া করে বন্যপ্রাণী ও পাখিরা যে একজন মানুষ ও মানুষীর শেষের প্রহরে বাইবেলে বর্ণিত সেই DELUGE-এর পরে NUHA'S ARC-এ সঙ্গী হবে, একথা কী করে যে অর্থগৃধ্নু অদূরদৃষ্টিসম্পন্ন ন্যক্কারজনক ঘৃণ্য দেশবাসীদের এক বড় অংশই ভুলে যান, তা ভাবলেও চখার কপালের দুপাশের শিরাতে রক্ত ঝুনুক-ঝুনুক করে। মনে হয়, স্ট্রোক হয়ে যাবে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বল এবারে ঝন্টু।

চখা বলল।

তারপরে নিজেই ড্রাইভারকে বলল, ব্যাক করো পাণ্ডে, জায়গা দেখে। আর জঙ্গল দেখার সাধ নেই। ইস্‌স্‌।

চানু বলল, আপনারে লইয়া যাইতাম যমদুয়ারে কিন্তু তাগো বড় ঘাঁটি হইছে যে এখন স্যা যাগা। সংকোশ নদী পারাইলেই ত ভুটান। তাই পুলিশেও কিছু কইরবার না পারে। টেররিস্টদের স্বর্গ-রাজ্য। আপনারে মাইর‍্যা ফ্যালাইলে আমাগো মুখগুলান কি দেখান যাইব কারো কাছেই? থুথু দিবে না মানষে?

চখা বলল, আমিও তো বিদ্রোহী। তারা আমাকে মারবেই বা কেন? সব বিদ্রোহী, সব টেররিস্টদের প্রতিই আমার সমর্থন আছে। উরুগুয়ের টুপামারো সন্ত্রাসবাদীদের ম্যানিফেস্টোতে পড়েছিলাম যে, তারা বিশ্বাস করে, "If the country does not belong to everyone, it will belong to no one." যে-দেশে গণতন্ত্র কেতাবী, আইন প্রহসন, ন্যায়বিচার এখনও স্বপ্নেরই বস্তু, সে-দেশে সম্ভবত টেররিজিমই একমাত্র পথ অন্যায়ের প্রতিকার করার।

তোমরা যাই বলো আর তাই বলো, আমি আমার সমস্ত শিক্ষা, ভাবনা-চিন্তা এবং দায়িত্বজ্ঞান সত্ত্বেও এই কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি। আর আইনও তো শুধু বড়লোকেরই জন্যে। গরিবের কোন কাজে লাগে এই আইন?

চখার উত্তেজনা কমিয়ে দিয়ে কথা ঘোরাবার জন্যে দীপ বলল, চলুন, ফিরে

যাই। মরনাই চা-বাগানে যাবেন তো চখাদা?

চল, যেখানে নিয়ে যাবি যাব।

উত্তেজনা প্রশমিত করে বলল চখা।

মরনাই চা-বাগানের চা রাখে ধুবড়ির টাউন স্টোরস। খাঁটি চা।

রায়েদের টাউন স্টোরস? শচীন রায়, কানু রায়, আরও ভাইয়েরা ছিলেন না? শচীনবাবুর বাবা ছিলেন দূরদর্শী মানুষ।

দীপ বলল তুমি জানলে কেমন করে?

বলিস কিরে? তোদের জন্মের অনেকই আগে থেকে আমি ওঁদের চিনি। টাউন স্টোরস-এর শচীনবাবু আর আমার বাবার সঙ্গে ধুবড়ির নেতাধোপানির ঘাট থেকে ছইওয়ালা নৌকো করে বর্ষার দামাল ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে শালমাড়া হয়ে ফুলবাড়ির আগে প্লাবিত নদীর মধ্যেই শরবনে ভরা একটি ডোবা-চরে রাত কাটিয়ে পরদিন জিঞ্জিরাম নদীতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম একবার। চার-পাঁচ দিন নৌকোতেই ছিলাম জিঞ্জিরাম নদীতে। একদিকে গারো হিলস—অন্যদিকে গোয়ালপাড়া। রাভাদের গ্রাম ছিল। রাভাতলা। আর কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! ঐ সময়েই জিঞ্জিরাম-এর মস্ত মস্ত দহতে বিরাট বিরাট কুমীরের আখড়া বসে।

আখড়া মানে?

দীপ বলল।

কুস্তি শেখে নাকি?

হয়তো শেখে। মাগুর, ঘড়িয়াল, ক্রকোডাইল। আর কত রকমের কুমীর। ঘটওয়ালা কুমীর বলে ওখানকার একধরনের কুমীরকে। ছাত্তার অন্তত বলত। তারা নাকি এতই বড়ো যে মাথার উপরের চামড়া কুঞ্চিত হয়ে ঘটের মতন হয়ে যায়। প্রতি গ্রাম থেকেই মানুষ নেয় কুমীরেরা। মানুষখেকো কুমীর।

আমরা "রাভাতলা" নামের এক গ্রামে নেমে শুনেছিলাম আগের রাতে এক চাষার যুবতী বৌকে কুমীরে নিয়ে যাবার মর্মন্তুদ কাহিনী। মেয়েরাই বেশি যায় কুমীরের পেটে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আহা, কী সব ছায়াচ্ছন্ন সরু নদীপথ! দু পাশে বাঁশের মাচা বানানো ছিল সেই সরু, দ্রুত ধাবমান নদীর ঘাটে ঘাটে, জলে না নামলেও যাতে চলে যায়। যখন একান্তই চলে না তখনই কুমীরের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে সকলে। লম্বা লম্বা নলি-বাঁশের ছিপ হাতে করে তামা-রঙা রাভা যুবকেরা ছায়াতে দু পাশ থেকে ঝুঁকে-পড়া বনের প্রায়ান্ধকার শ্রাবণী দুপুরে বসে

মাছ ধরছিল। এখনও যেন চোখে ভাসে। আর আমাদের নৌকার দাঁড় পড়ছিল ছপ্‌ছপ্‌। ধীরে ধীরে। আর আমি বসেছিলাম নৌকোর ছইয়ের মাথার উপরে, গলাতে সান-গ্লাস আর কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে। রাতের অন্ধকার নেমে এলে ভাঙনি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়ে শুয়ে নৌকোর ছইয়ের উপরে অঝোরধারে বৃষ্টির শব্দ আর গারো পাহাড় থেকে আসা দামাল হাওয়ার দাপাদাপির আওয়াজ শুনতে শুনতে বাবার পাশে ঘুম।

আবিষ্ট গলাতে ওদের বলছিল চখা।

তখন আমি কলেজের ফার্স্ট-ইয়ারের ছাত্র। আমার বাবার গায়ের গন্ধ এখনও যেন নাকে ভাসে। গন্ধটি কটু নয়, আবার মিষ্টিও নয়। একটা নিউট্রাল গন্ধ। ODOURLESS-ই বলা চলে। কিন্তু তবু ছিল ODOUR। তার বাবার কোল-ঘেঁষে সারারাত বৃষ্টি-ঝরা শ্রাবণ-রাতে কুমীরে-ভরা সরু কিন্তু প্রচণ্ড গভীর জিঞ্জিরাম নদীর বুকে তীরের গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে-রাখা ছোট্ট ছই-নৌকোতে যেসব ছেলে রাত না কাটিয়েছে, তারা হয়তো কোনোদিনও জানবে না যে, বাবার গায়ের গন্ধও, মায়ের গায়ের গন্ধরই মতন প্রত্যেক সন্তানেরই প্রিয়।

চানু বলল, পাণ্ডেজী, মরনাই-এ ঢোকো ডানদিকে। ডিঙ্গডিঙ্গার কোন সুন্দরী মেয়ে অটোগ্রাফ নিল চখাদার কলকাতার বইমেলাতে, তার খোঁজ করা যাক একটু!

ওরা বাগানের অফিসের সামনে ঢুকে গাড়ি ঘুরিয়ে, গাড়িতেই বসল। চানু গেল খবর করতে। একটু পরে ফিরে এসে বলল, ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, ইঞ্জিনিয়র কেউ-ই নাই, এহনে লাঞ্চ আওয়ার। বাড়ি যাইবেন কি?

দুর। খাবার সময়ে মানুষকে বিরক্ত করব না।

তবে অফিস থিক্যাই খোঁজ নিয়া আসতাছি। আপনে বসেন।

ফিরে এসে চানু বলল, যা ভাবছিলাম তাই-ই। মাইয়ার নাম গোলাপ। গোলাপের মতনই সুন্দরী। ওর বাবারেও আমি চিনি। ওরা বাগানে থাকে না। ওদের বাড়ি এই ডিঙ্গডিঙ্গাতেই। ফেরার সময়ে যামুঅনে অগো বাসায়। কিন্তু স্যা ত বিয়া হইয়া চইল্যা গেছে কলকাতা!

ঝন্টু বলল, মেয়ে গেছে তো কি হয়েছে—মা-বাবা তো আছেন। তাঁদেরও সারপ্রাইজ দেওয়া হবে। ডিঙ্গডিঙ্গাতে এসেও "ডিঙ্গডিঙ্গার মেয়ের" বাড়িতে না যাওয়াটা ভাল দেখায় না। সে এবং তার শাশুড়ী যখন চখাদার ভক্ত।

মরনাই বাগান পেরিয়ে ডিঙ্গডিঙ্গাতে এসে সামনে নানারঙা গোলাপ বাগানওয়ালা সুন্দর একটি বাড়ির সামনে এসে থামাতে বলল গাড়ি চানু, পাণ্ডে

ড্রাইভারকে। তারপর ভিতরে গেল। পরক্ষণেই ভেতর থেকে একজন সুন্দরী প্রৌঢ়া মহিলা এবং তাঁর সুন্দর ছেলে বাইরে এসে আপ্যায়ন করলেন।

চখারা সকলেই গেল ভিতরে। কী যে খুশি হলেন মহিলা ও তাঁর পুত্র, তা বলার নয়! বললেন, মেয়ের বিয়ে হয়েছে অল্প ক'দিন আগে। ওর সুন্দরী শাশুড়ীই নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে বইমেলাতে গেছিলেন। আপনার অনেক লেখাতে ডিঙ্গডিঙ্গার উল্লেখ আছে, সে কারণেই উনি নিশ্চয়ই আমার মেয়েকে ডিঙ্গডিঙ্গার মেয়ে এবং কলকাতার বৌ বলে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপরে বললেন, মেয়ে আমার আসছে সাত দিন পরেই। আপনি স্বয়ং এসেছিলেন শুনলেই কী যে করবে জানি না। আপনার এই বইটিতে সই করে দিয়ে, আজকের তারিখও দিয়ে যান দয়া করে। নইলে ও হয়তো বিশ্বাসই করবে না যে আপনি এসেছিলেন!

বলে, চখার লেখা একটি বই নিয়ে এলেন ভিতর থেকে।

মিষ্টি না খাইয়ে ছাড়লেন না মহিলা। ওঁরা খ্রিস্টান সম্ভবত। মিশনের দীক্ষিত। ওঁর স্বামী নামকরা ঠিকাদার ছিলেন এই অঞ্চলের। "গোলাপের বাবা" এই তো যথেষ্ট পরিচয় নাম নাই বা মনে থাকল!

চানু বলল।

চখা গোলাপদের বাড়ি থেকে বেরোতে বেরোতে ভাবছিল, দু কলম লিখে কীই বা এমন করেছে যে, এত মানুষের এত ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা এবং স্নেহ পেল এ জীবনে।

৪

ধুবড়ির "সবুজের আসর" থেকে এক ভদ্রলোক, হীরেন পাল, নিতে এসে গেলেন সাতটার জায়গাতে পাঁচটার সময়েই। সঙ্গে ইতু, পূর্ণজ্যেঠুর মেয়ে। জীপ নিয়ে এসেছিলেন ওঁরা পথ খারাপ বলে।

ছেলেবেলাতে যখন আসত চখা, ধুবড়িতে, তখন ইতুর বয়স হবে আট-দশ বা একটু বেশি। ব্রহ্মপুত্রের পাড়ের STAND-এ হাঁটতে নিয়ে যেত ইতু চখাকে। অস্পষ্ট মনে আছে। ওর ভাল নাম রীতা। বিয়ে করেনি। ওর ছোট বোন মানাও বিয়ে করেনি। বেশ আছে নদীপারের হু হু-হাওয়া, চর-পড়া গাঢ় সবুজের আস্তরণের ঘেরের কলুষহীন ধুবড়িতে। ইতু কাজ করে স্টেট ট্রান্সপোর্ট আর অবসর সময়ে অভিনয়ও করে। বড় রাস্তাগুলোতে যদি-বা ট্রাক বাস বা গাড়ি চলাচল কিছু আছে, ছাতিয়ানতলার গলি একেবারেই নিস্তরঙ্গ।

নিতে তো ওঁরা এসেছেন কিন্তু বরবাধা থেকে ফিরে দুপুরের খাওয়া খেয়ে ওঠার পরই তামাহাট যেন ভেঙ্গে পড়েছে পিসীমার বাড়ির উঠোনে। কে যে আসেনি! দাতুর ছোট, চলে-যাওয়া ভাই বাবুর বিধবা স্ত্রী তাপসী তার ছেলেকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে এসেছে। ছেলেটি ভাল হবে। চখার মন বলল, তার মধ্যে ভালত্বর সব লক্ষণ পরিস্ফুট। বড় হবে জীবনে। আশীর্বাদ করল মনে মনে। চানু, চানুর স্ত্রী মিঠু। বিনয়, বিনয়ের সুন্দরী শিশুকন্যা, বিনয়ের বাবা। তিনি এখন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। রতু জ্যেঠুর ছোট ছেলে বাবলা এবং তার কবি-

স্ত্রী নীলিমা। কুট্টিদা, সুরেন জ্যেঠুর মেজ ছেলে।

রাঙাপিসিও এসেছিলেন এবং আরও কত চেনা ও আধচেনা মানুষ। ঝন্টুর স্ত্রী কসমিক, শালা শক্তি এবং আর তার স্ত্রী দেবী তো ছিলই মজুদ।

পিসীমা রুদ্রাক্ষর গাছটা ছেঁটে ফেলার পরই বেলুদা মারা যান। তাই নিয়ে অনেক অনুশোচনা করলেন।

ভাবছিল চখা, কত রকমের সংস্কার থাকে মানুষের!

হাঁসেরা বাড়ি ফিরে এল, সার দিয়ে, প্যাঁক-প্যাঁক করে হেলতে-দুলতে। তক্ষক ডেকে উঠল লটকা গাছে। জলপাই গাছের ডালে দিনশেষের আলো এসে পড়েছে। লালাবাবু বেলা যায়। যেতে হবে এবারে।

ধুবড়ির বইমেলার তরফের হীরেনবাবুও ভিতর-বাড়িতে এসে ঢুকলেন ইতুর সঙ্গে। বরকে আরও বেশিক্ষণ ছেড়ে রাখার পক্ষপাতী তিনি নন। গরুদের গোয়ালে ফেরার সময় হলো, বরের সংসারে জুতবার। সংসারও তো এক খোঁয়াড়। কী বর আর কী বৌ-এর!

পিসীমাকে প্রণাম করে উঠল চখা। অন্ধকার হয়ে গেছে। গদিঘরের সামনে ততক্ষণে ভিড় জমে গেছে। বাদল মিত্তিরের শালার ছেলে লেখক হয়েছে, তাকে নিয়ে এসেছে সসম্মানে ধুবড়ি থেকে মানুষে, এ যেন তামাহাটের এক বিশেষ সম্মান। পরিচিত-অপরিচিত কত মানুষই যে দাঁড়িয়ে আছেন চখাকে বিদায় দেবার জন্যে!

কে বলতে পারে! এই হয়তো তামাহাট থেকে চিরবিদায়। বহু বছর পরে এসেছে। আর কি এ-জন্মে আসা হবে? জীবন যে বড়ই ছোট! কতখানি যে ছোট, তা জীবনের বেলা পড়ে এলেই শুধু বোঝা যায়। টগবগে যৌবনে পথের শেষে পৌঁছনোর কথা এবং সেই গন্তব্যর অনুভূতি সম্বন্ধ কোনো ধারণা করাও অসম্ভব।

ঝন্টু চলল চখার সঙ্গে, নীতবর হয়ে। আসলে, চখার দেখভাল করারই জন্যে। জীপের পেছনে হীরেনবাবু, ঝন্টু এবং সেকেন্ডারী স্কুলের হেডমাস্টারমশাই। তিনি পথে নেমে যাবেন গৌরীপুরে। তারপর বাস ধরে যাবেন গুয়াহাটি। দাতু একশো বিশ জর্দা দিয়ে পান খাওয়াল চখাকে জীপ ছাড়বার আগে। শেষ দান।

এই কি গো শেষ দান?

সকলের দিকে হাত তুলে চখা জীপের সামনের বাঁদিকের সিট-এ বসল। ওর পাশে ইতু বসেছে। শিশুকালের অথবা ছেলেবেলার মতন। আশ্চর্য! তখন কত কাছাকাছি ঘেঁষাঘেষি বসা যেত সহজেই। কোনোই সংকোচ ছিল না। শিশুমাত্রই

দেবশিশু। এখন আর তেমন করে বসা যায় না। সময় বড়ই বেরসিক। সে বড়ই দূরত্ব রচনা করে দেয় একে অন্যের মধ্যে, বিশেষ করে নারী ও পুরুষের মধ্যে। আড়ষ্ঠ হয়ে বসেছে ইতু। চখাও যতখানি পারে বাঁ দিক ঘেঁষে বসেছে।

চখা বাঁ হাতটি অস্ফুটে তুলে বলল, যাই।

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠলেন, কোনো গুরুজনই হবেন, মুখ দেখতে পেল না তাঁর বললেন, যাওয়া নাই, আইস্যো। আবার আইস্যো য্যান শীগগির। আমাগো ভুইল্যা যাইও না চখা।

চখা সেই কথার পিঠে কিছু বলতে গেল। কিন্তু তার গলার কাছে কী যেন দলা পাকিয়ে উঠল। বলা হলো না কিছু। বলা গেল না।

জীপটা ছেড়ে দিল একটা ঝাঁকুনি তুলে, হেডলাইট জ্বেলে।

চখা ভাবছিল, কে জানে! আবার কোনোদিনও আসা হবে কি না। না-হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যদি হয়ও, তবে কি আর পিসীমা, রাঙাপিসি, কুট্টিদা এবং আরও অনেকে এমনই থাকবেন? তাঁরা সকলেই তো আর নিজের চেয়েও বয়সে অনেকই বড়। ফিরে যাওয়ার বেলাতে যে আগে পরে নেই কোনো। সব হিসেবপত্র শুধু আসার সন তারিখ দিয়েই হয়। তবুও সকলেই তো লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েই আছেন। কখন যে কার ডাক পড়বে নদীপারে, শোর উঠবে, "বল হরি, হরি বোল," কে বলতে পারে! দুলতে দুলতে চলে যাবে অন্যদের কাঁধে। অবুঝ, শক্ত হয়ে-যাওয়া মাথাটা একবার এপাশ, আরেকবার ওপাশ করবে। খই ছড়াতে ছড়াতে যাবে সামনে চানু, বাবলা, দীপ আর খোল কর্ত্তাল বাজিয়ে, গাইতে গাইতে যাবে আগে আগে কুমারগঞ্জের কেষ্ট, "নে মা আমায় কোলে তুলে, আমি যে তোর খারাপ ছেলে।"

৫

ধুবড়ি শহরের সার্কিট-হাউসটি ভারী সুন্দর। একেবারে ব্রহ্মপুত্রর উপরেই। নদীর পাশে বসে নদীর দৃশ্য দেখার একটা জায়গা আছে। মনোরম।

সার্কিট-হাউস অবশ্য গুয়াহাটি শহরেরও খুব ভাল। সেটিও ব্রহ্মপুত্রর একেবারে উপরে। চখা, নামেরই কারণে জলের পাখি বলেই কি না বলতে পারে না, তবে নদীমাত্ররই বড় ভক্ত সে।

এখন কাকভোর। চকা একা বসেছিল নদীর দিকে চেয়ে। এখন দেখলে ব্রহ্মপুত্রর ভয়াবহতা কিছুই বোঝা যায় না। তার ভয়াল রূপ দেখতে হয় ভাদ্র-আশ্বিনে। ভরা শ্রাবণেও।

রবীন্দ্রনাথ চমৎকার করে বলেছিলেন, নদীর সাগরে গিয়ে থামার প্রকৃত মানে। বলেছিলেন যে, থামা মানেই ফুরিয়ে যাওয়া নয়। সেই থামা মানে নিজেকে নবীকৃত করা বা ঐরকমই কিছু।

তিব্বতের চেমায়ুং-জং হিমবাহ থেকে ব্রহ্মপুত্রর জন্ম। তারপর তিব্বতের ভিতর দিয়ে সতেরোশো কিমি প্রবাহিত হয়ে এসেছে সে। তখন অবশ্য তার নাম, ব্রহ্মপুত্র নয়, সাংপো। ভারতে এসে ঢুকেছে সাংপো প্রথম অরুণাচল প্রদেশে। সেখানে তার নাম হয়েছে ডিহাং। সদিয়ার কাছে সে হঠাৎ নেমে এসেছে হিমগিরি ছেড়ে সমতল থেকে মাত্র দেড়শো ফিট মতন উচ্চতাতে। সেখানেই ডিবাং আর লুহিত এই দুটি নদীও এসে সাংপোর সঙ্গে মিলিত হয়েছে

আর তখনই তার নতুন নাম হয়েছে ব্রহ্মপুত্র।

গঙ্গা যেমন গিরিরাজের কন্যা, ব্রহ্মপুত্রও কি ব্রহ্মার পুত্র? জানে না চখা। কলকাতায় ফিরে, দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিগগেস করবে।

যে দেশে পাখিরা শুধুই পাখি, গাছেরা শুধুই গাছ সেখানে নদীরাও শুধুই নদী। তাই জানার ইচ্ছা যাঁদের আছে তাঁরাই জানেন যে, এই পৃথিবীতে কোনো বিষয়েই জানার কোনো শেষ নেই। শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে পৃথকীকরণের উপায় তাঁদের দেরাজের মধ্যে গোল করে পাকিয়ে-রাখা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট নয়, তাঁদের জিগীষারই তারতম্য।

আসামের পূর্ব ভাগ দিয়ে বিষধর সাপের চাল-এর মতন এঁকেবেঁকে একের পর এক দ্বীপের সৃষ্টি করে একদিকে পাড় ভাঙতে ভাঙতে, অন্যদিকে চর ফেলতে ফেলতে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র শত শত মাইল। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় "নদী-দ্বীপ" গজিয়ে উঠেছে ব্রহ্মপুত্রেরই বুকে। ডিব্রুগড়ের কাছে। যেখানে ব্রহ্মপুত্র প্রায় সাড়ে ষোল কিমি চওড়া। সেই দ্বীপের নাম "মাজুলি" তার আয়তনও প্রায় সাড়ে নশো বর্গ কিমি। তারও পর গুয়াহাটির কাছে এসে আরেক নতুন দ্বীপ গড়েছে সে। তার নাম "ময়ুর" দ্বীপ বা PEACOCK Island.

উত্তর-দক্ষিণ দুদিক থেকেই অনেকগুলি উপনদী এসে মিশেছে এই ব্রহ্মপুত্রে। উত্তর থেকে এসেছে যারা তাদের মধ্যে সুবনসিরি, কামেং বা জিয়া ভরলি (সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ-এর একটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম এই নদীর নামে), মানস এবং সংকোশ।

মানস ও সংকোশ হিমালয়ের বরফাবৃত অঞ্চল থেকে নেমে আসার কারণে সারা বছরই তাদের জল হিমশীতল। "যমদুয়ারে" শিকারে গিয়ে ভুটানের মহারাজা এবং চখার সঙ্গী-সাথী সাহেব-সুবোরা নদীর বালির নিচে বিয়ারের বোতল পুঁতে রেখে দিতেন রেফ্রিজারেটরের বদলে। এই মানাসের অববাহিকাতেই মানাস টাইগার প্রজেক্ট। আর সংকোশের পারে চখা চক্রবর্তীর প্রিয় যমদুয়ারের বন।

দক্ষিণ থেকে ব্রহ্মপুত্রে এসে মিশেছে বুড়িডিহিং, ধানসিঁড়ি, কোপিলি আর কালাং। আরও কিছু উপনদী আছে যাদের প্রত্যেকেরই উৎস ভুটান ও সিকিমের বরফাচ্ছাদিত নানা পর্বতে। এই সবকটি উপনদীই পশ্চিমবঙ্গ পেরিয়ে বাংলাদেশে সেঁধিয়েছে। তারা হলো তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা, কালজিনি এবং রায়ডাক।

এত সব কথা মনে এলো এলোমেলো। একা থাকলেই ওর বাবনাগুলো

কিলবিল করে। আসলে একা থাকলেও ও কখনওই একা থাকে না তো! কত পুরুষ ও নারী, কত গাছ-গাছালি পাখ-পাখালি তাকে সর্বক্ষণই ঘিরে থাকে যে, তা বলার নয়। তাদের চোখে দেখা যায় না কিন্তু চখা অনুক্ষণ তাদের অস্তিত্ব অনুভব করে। মাঝে মাঝে তার মনে হয় সেই জন্যেই যে, তার ব্যক্তিত্বটা কোনো একক ব্যক্তির নয়, সে সর্বজনীন। সর্বজনীন বললেও হয়তো সব বলা হয় না, বিশ্বজনীন বলাই হয়তো ভাল। সারা পৃথিবীর সঙ্গে তার মনে মনে ঘর করা। এই ঘর করার রকম অন্য কারোকে বলা যায় না, বোঝানোও যায় না।

আজ কাকভোরে উঠে যে নদীপারের এই বসবার জায়গাতে এসে বসেছে তার কারণ আছে।

ঝন্টু চখারই ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। এখনও ঠাণ্ডার আমেজ আছে বেশ এখানে। সকাল-সন্ধ্যেও ভারী মনোরম। শেষ রাতে নিজের পাশে কোনো উষ্ণ শরীরের তরুণী আছে ভেবে সুখস্বপ্ন দেখতে না দেখতেই ঝন্টুর সরব উপস্থিতি সেই সুগন্ধি স্বপ্নে গোবর-ছড়া দিয়ে দেয়। অসহ্য ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দে নাক ডাকে।

ঝন্টু বলে, চখা নিজেও নাকি নাক ডাকে।

হবে। কে আর কবে নিজের নাক ডাকা শুনেছে আধ-ঘুমন্ত অবস্থার ফুরুৎ-ফুরুৎ শব্দ ছাড়া?

তার পাশের ঘরে আছেন নিমাইদা। প্রাক্তন সাংবাদিক ও বর্তমানে শুধুই সাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য এবং তাঁর স্ত্রী দীপ্তি বৌদি। নিমাইদা বৌদির এখনও বহুত প্রেম আছে। আশ্লেষে শুয়ে আছেন তাঁরা।

নিমাইদার সুন্দর চেহারাটি, চখার ধারণা, মিস্টার ব্রহ্মা নিজে হাতে এবং অনেক সময় নিয়েই গড়েছিলেন, নইলে কোনো মানুষের চেহারা "নিখুতি" মিষ্টিরই মতন এমন মিষ্টি হওয়া সম্ভব ছিল না। ধবধবে ফর্সা রঙ, উজ্জ্বল ত্বক, পঁয়ষট্টি বছর বয়সেও পনেরো বছরের তরুণের মতন ছটফটে সহাস্য স্বভাব। এমনটি বড় দেখেনি চখা।

কলকাতাতে ওঁর সঙ্গে অতি সামান্যই দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে, পয়লা বৈশাখে বইপাড়াতে, কলকাতা বইমেলাতেও, কিন্তু সে পরিচয় এক, আর কলকাতার বাইরে এসে দিনরাতের আঠারো ঘণ্টা একসঙ্গে থাকা আরেক।

মিস্টার ব্রহ্মা ছোট্টখাট্ট নিমাইদাকে শুধু যত্ন করে যে গড়েছেন তাই নয়, এই ধরাধামে পাঠাবার সময়ে নিজে হাতে তাঁর চুলটি পর্যন্ত আঁচড়ে পাঠিয়েছেন। এক মাথা, "ব্রুনেট" মেমেদের মতন ঘন চুল পরিপাটি করে আঁচড়ে দিয়েছেন এমনই করে যে, জীবনে কোনোদিনও চিরুনির প্রয়োজন পড়েনি নিমাইদার।

ঝড়ে অথবা বসন্তের হাওয়াতে অথবা রণে অথবা রমণেও নিমাইদার মাথার একটি চুলও এদিক-ওদিক হয় বলে চখার মনে হয় না। অমন একখানা "CUSTOM-BUILT" চেহারা যদি ঈশ্বর চখাকে দিতেন তবে চখা চক্রবর্তী একটি শতরঞ্চি বিছিয়ে হাওড়া স্টেশানের প্লাটফর্মে বসে ভিক্ষে চাইলেও তার দিন চমৎকার গুজরান হয়ে যেত। ঈশ্বর বড়ই একচোখা। যাকে দেন, তাকে ছপ্পর ফুঁড়েই দেন, আর যাঁকে দেন না, চখা চক্রবর্তীর মতন 'কানা ছেলে পদ্মলোচন" নাম নিয়েই তাকে খুশি থাকতে হয় সারাজীবন।

পরিকল্পনামতো "সবুজের আসর" আয়োজিত গোয়ালপাড়ার এই ধুবড়ি শহরের প্রথম বইমেলার উদ্বোধন হয়ে গেছে। নিমাইদাই করেছেন। সঙ্গে পোঁ ধরেছিল চখাও। আজ অসমীয়া সাহিত্যের উপরে সেমিনার আছে বিকেলে। আগামীকাল ইংরেজি সাহিত্যের উপরে। আর তার পরদিন বাংলা সাহিত্যের উপরে। যে কারণে, নিমাইদা এবং চখাকে ঐ সংস্থার কর্মীরা এবং স্থানীয় বাঙালিরা কলকাতা থেকে অনেক খরচ করে আনিয়েছেন।

নিমাইদা আগে এদিকে আসেননি কিন্তু চখা এসেছে। তামাহাটের, গৌরীপুরের, ধুবড়ির আত্মীয়রাই তাকে বারেবারে এই অঞ্চলে নিয়ে এসেছেন। এবারে "সবুজের আসর" বইমেলার উদ্যোক্তারা আবার ফিরিয়ে আনলেন তাকে। ওঁরা আবারও না আনলে হয়তো চখার আসাই হতো না আর। তাই এই প্রত্যানয়ন তার কাছে এক গভীর অর্থবাহী। বড়ই সুখের।

খরচটা বড় কথা নয়। তার চেয়েও অনেক বেশি ভালবাসা খরচ করেছেন ওঁরা ওঁদের দুজনের উপরে। আন্তরিকতা শব্দটির তাৎপর্যই কলকাতার মানুষেরা ভুলে গেছেন হয়তো। সেখানে পরিবেশ দূষণের জন্যে নিশ্বাস নিতেও যেমন কষ্ট, নানারকম অপ্রয়োজনীয় গগননিনাদী আওয়াজে (যেমন লাল বাতি জ্বালানো ভি.আই.পি.'দের গাড়ির সাইরেন!) যেমন কথা বলা বা শোনাও কষ্ট, কারোকে একটু ভালবাসাও যেমন কষ্ট, মন এবং শরীর দুইয়ের ভালবাসাই, তেমনই আন্তরিক হওয়াটাও বোধহয় অসাধ্য। অন্তরই যেখানে নিরন্তর চৈত্রের হাওয়ার নদীচরের ঝুরো বালিরই মতন ঝুরঝুর করে ঝরে উড়ে যাচ্ছে, সেখানে আন্তরিক হয়ই বা মানুষে কেমন করে!

ধুবড়ি-গৌরীপুর-তামাহাটের সবচেয়ে বড় আনন্দ এখানে ভি. আই. পি. বা লাল আলো জ্বালানো বেশি গাড়ির ভিড় নেই। পিঁ-পিঁ-পাঁ-পাঁ আওয়াজ করে শূন্য-কুম্ভের মতন, শয়ে শয়ে নিরীহ শান্তিকামী খেটে-খাওয়া মানুষের পিলে

চমকে দিয়ে নিরন্তর "অকাম কইরবার লইগ্যা" তাঁদের যাওয়া-আসা নাই। মানুষের দাম দিনে দিনে যতই কমছে, ভেরী ইমপর্ট্যান্ট পার্সন-এর সংখ্যা ততই বাড়ছে। বাঁশবন যত বড়, শেয়ালরাজাদের সংখ্যাও তত বেশি। আগে পুলিশের গাড়ি, পেছনে পুলিশের গাড়ি, তারও আগে ভটভটিয়া ভটভট-করা সাইরেন বাজানো সার্জেন্ট। মধ্যেখানে লাল-আলো জ্বালানো গাড়ি।

চখা মনে মনে ঘেন্নাতে বলে, আরে খোকা। তোদের মারছেটা কে? নিজের জীবিকার্জনের ক্লান্তিতে সবাই এতই ক্লান্ত যে, সময় থাকলে কিছু ছারপোকা, তেলাপোকা, বা মশা-মাছি মারারই চেষ্টা করত তারা। কিন্তু তোরা "কে র‍্যা"? তোদের নিয়ে মাথাটাই বা ঘামায় কে? আর তোরা তো ভোটদাতাদের চাকর, তাদের সেবাদাস। ভাব দেখলে মনে হয় তোরাই বুঝি রাজা-রানী। হাসি পায়। তোরা কি জানিস সাধারণে কোন চোখে দেখে তোদের মতো ভি. আই. পি.দের? ভি. আই. পি. হলেও হতে পারতেন গুণীরা। তোদের কোন গুণটা আছে যে, সদাই সাধারণ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখিস? তোদের সব দলের রঙই তো সাধারণের জানা হয়ে গেছে। তবুও কোন লজ্জায়, নির্লজ্জ অকারণ উচ্চমন্যতার দুর্মর কর্বুর রোগে ভুগে তোরা দিনে-রাতে শ্যামের বাঁশি বাজাতে বাজাতে যাস অপদার্থ, আত্মসম্মানজ্ঞানহীনেরা?

চখার ইচ্ছে করে ঐসব ভি. আই. পি.দের (কোন শালা ভি. আই. পি. নয় আজকাল? হাঃ।) গাড়ির লাল বাতিগুলো খুলে নিয়ে সেই ভি.আই.পি.'দের প্রত্যেকের পেছনে লাগিয়ে দেয়। জোনাকি করে দেয় সব শালা ঘুষখোরদের। রক্তচোষাদের। তারপর দেখুক নিজের নিজের পশ্চাৎদেশের আলোতে নিজেরা নিজেদের!

"লজ্জা" শব্দটা কি দেশ থেকে উধাওই হয়ে গেল?

হঠাৎ চটকা ভাঙল চখার, কারো গলার আওয়াজে।

কতক্ষণ?

ফিঙে বলল।

চখা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ফিঙের দিকে। বলল তুমি!

অভাবনীয় মিথ্যে বলবে না, বাগডোগরাতে প্লেন থেকে নামার পর থেকেই ফিঙের কথা যে তার মনে আসেনি তা নয়। কিন্তু হৃদয় খুঁড়ে কে আর বেদনা জাগাতে চায়? শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতারই মতন তার মন বলতে চেয়েছিল, "তোমায় আমি ভোগ করেছি তোমায় বিনাই"।

গৌরীপুরে সামান্য সময় কলেজে পড়ার স্মৃতি তাকে বড় মেদুর করে

তুলেছিল। বড় বড় গাছের সারির মধ্যে দিয়ে সোজা চলে যাওয়া পথ, নদীর গন্ধ, ফিঙের সঙ্গ। যা হারিয়ে গেছে তা গেছেই। হারানো জিনিসের প্রতি ওর কোনো মোহ নেই। হারানো জিনিস মূর্খরাই ফিরে চায়। তা সে জাগতিক কোনো বস্তুই হোক কী স্মৃতি, অথবা ভালবাসাও। তবে এটা স্থিরই করেছিল যে ও এসে ফিঙের খোঁজ করবে না নিজে। গৌরীপুর থেকে গুয়াহাটি, তারপর গুয়াহাটি থেকে ধুবড়িতে যে এসে থিতু হয়েছে ফিঙে, সে খবর কলকাতাতে বসেই পেয়েছিল এক পরিচিতর চিঠিতে। গৌরীপুরের বিল্টু। তার একসময়ের জিগরি দোস্ত।

ফিঙের স্বামী এখনও থাকেন গুয়াহাটিতেই কিন্তু ফিঙে নাকি ধুবড়িতেই থাকে। সুন্দর বাড়ি করেছে নাকি অনেকখানি জমি কিনে। ফুলের বাগান। ওর স্বামীও যে এই সময়ে ধুবড়িতেই আছেন ছুটিতে তাও লিখেছিল বিল্টু। ফিঙের খবর জানতো সবাই কিন্তু গা করেনি চখা। ঐ একই কারণে। সেলাই-করা ক্ষত পুরনো হলেও সেই ক্ষতস্থানে আঘাত লাগলে ব্যথা লাগেই। এমনিতেই বেঁচে থাকতে অনেকই কষ্ট। কষ্ট আর বাড়িয়ে কি হবে?

ভাল করে তাকাল চখা ফিঙের দিকে। বিশ্বাস হচ্ছিল না ওর।

সবে সূর্য উঠছে। ফিঙের ছায়া পড়েছে মাটিতে লুটিয়ে। সাদা, নরম, প্রভাতী আলো যেন ফিঙের কালো রূপের কাছে হার মেনে ভুলুণ্ঠিত রয়েছে লজ্জাতে।

চখা দেখছিল যে, ফিঙে দাঁড়িয়ে আছে। কাছেই আছে। অথচ কত দূরে। কতগুলো বছর কেটে গেছে মাঝে। কতগুলো। অথচ ফিঙে ঠিক তেমনই আছে। গৌরীপুরের প্রমথেশ বড়ুয়া কলেজ থেকে বই-খাতা দু হাতে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে, ভীতা হরিণীর মতন দুদিকে দু বিনুনি ঝুলিয়ে যেমন করে বাড়ি ফিরত, ঠিক তেমনই। আশ্চর্য! ঠিক তেমনই। বছরগুলো নিজেরাই বুড়ি হয়ে গেছে যেন, ফিঙেকে ছুঁতে না পেরে।

চখা অস্ফুটে বলল, বসো। পাশে বসো।

পাশে থাকলে দেখা যায় না একে অন্যকে। এখানেই ঠিক আছে। তোমাকে দেখি।

আমাকে?

লজ্জিত, অপদস্থ, চখা বলল।

তারপর বলল, আমাকে কি দেখবে? আমি কি আর দেখার মতন আছি?

দেখে তো, যে দেখে, তার চোখই। যাকে দেখে, সে দ্রষ্টব্য কি না, তা সে নিজে কতটুকু জানে। নড়ো না চখাদা। তুমি তেমনই ছটফটে আছ। তোমাকে

দেখতে দাও ভাল করে।

চখার সেই আবেশের মধ্যেও হাসি পেয়ে গেল ফিঙের কথা শুনে।

হাসছ যে? আমাকে দেখে কি তোমার হাসি পাচ্ছে?

ফিঙে আহত গলাতে বলল।

না। তোমাকে দেখে নয়। একটা গল্প মনে পড়ে গেল আমাকে "ছটফটে" বলাতে।

কী গল্প?

বলেই, সেই ছেলেবেলায়, জলপাই গাছটার তলাতে মুনিষদের কেটে ফেলে রেখে যাওয়া বুনো তেঁতুলের কাটা গুঁড়ির উপরে যেমন করে ওরা বসত পাশাপাশি, তেমন করেই বসল ফিঙে।

আবার ফিঙে বলল, বলো।

একজন পেটুক ছিল। সে এক বিয়েবাড়িতে গিয়ে এমন খাওয়াই খেয়েছে যে আর হেঁটে ফিরতে পারে না বাড়িতে। দুই বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে কোনোক্রমে সে ফিরছিল বাড়ির দিকে, এমন সময়ে পাড়ার মোড়ের পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে-থাকা ছোঁড়ারা বলল, "আরে এ ভগলু, বেগাড় পইসা খনা মিলা ত ইতনাহি খা লি, যো চলনে ভি নেহি শকতা?"

কোথাকার গল্প?

ফিঙে বলল।

গিরিডির। আমার মামাবাড়ির। ছোটমামার মুখে শোনা।

তারপর?

তারপর ভগলু দু বন্ধুর কাঁধে ভর দিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "আরে ম্যায় ক্যা খায়া, খায়া তো জুগনু। উ দেখো! উ চৌপাইমে সওয়ার হো কর আ রহা হ্যায়।"

এ গল্পর মানে?

ফিঙে বলল।

মানে, আমার পাশের ঘরে নিমাইদা আছেন। তাঁকে দেখলে "ছটফটে" কাকে বলে, তা তুমি বুঝবে। প্রতি মুহূর্তে শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী ছটফট করছে। সত্যি! নিমাইদার সঙ্গে দুটি দিন না কাটালে 'প্রাণশক্তি' ব্যাপারটা যে কী, সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই হতো না।

সত্যি?

সত্যি!

সুন্দর চেহারা।

কার?

নিমাইবাবুর।

তুমি দেখলে কখন? তুমি কি বইমেলা উদ্বোধনের সময়ে এসেছিলে? কই? দেখিনি তো!

না। আসিনি। আমার বাড়ির বারান্দা থেকে শোভাযাত্রাতে দেখেছিলাম ওঁকে। উনিই যে নিমাই ভট্টাচার্য তা জানতাম না। তোমার বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে বলে এখন জানলাম।

ও।

ছটফটানি অনেক রকম হয়। আমিও ছটফটে। কিন্তু সেই ছটফটানি বাইরে থেকে দেখা যায় না।

সেটা কি রকম?

সেটা ভিতরের ছটফটানি। গভীর নদী যখন তার তলের পাহাড় ও ধারালো পাথরে নিয়ত রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হতে হতে বয়ে যায়, তখনও বাইরে থেকে দেখে মনে হয় তার কোনো কষ্ট নেই। ব্যথা নেই। শান্ত, প্রায় স্থির দেখায় তাকে। অথচ যার চোখ আছে, সে তার ভিতরের কষ্টটা দেখতে পায়।

বাবা! তুমি দেখি দার্শনিকের মতন কথা বলছ। দার্শনিকের সঙ্গে বিয়ে হলেও যে দার্শনিক হয়ে ওঠে মানুষে তা তো জানা ছিল না! শুনেছিলাম, তোমার স্বামী দার্শনিক।

হাসল, ফিঙে।

বলল, সব মেয়ের স্বামীই দার্শনিক। কিন্তু তাঁরা জানেনও না যে, তাঁদেরই নিজস্বার্থময় "দর্শনে" প্রভাবিত হয়ে প্রত্যেক স্ত্রীও একদিন দার্শনিক হয়ে যান। তবে তুমি অবশ্য নির্বোধই। চিরদিনের। তোমার চোখ নেই। মন নেই। তাই আমাকে দেখেও দেখোনি, জেনেও জানোনি। অবশ্য এখন মনে হয় যে, বুদ্ধিমান পুরুষকে ভালবাসার চেয়ে মেয়েদের পক্ষে নির্বোধ পুরুষকে ভালবাসা অনেকই নিরাপদ। যদি তোমার চোখই থাকত তবে তোমার ঐ দুটি ড্যাবা-ড্যাবা চোখের দূরদৃষ্টির সামনে দিয়ে সেই "দার্শনিক" আমাকে "ড্যাং ড্যাং" করে বিয়ে করে নিয়ে যেতে পারত না।

চখা বলল, আমাদের সময়ে ঐরকম ড্যাং ড্যাং করেই অন্যমানুষের সঙ্গে প্রেমিকাদের বিয়ে হতো। সকলেরই। যাদের ভালবেসেছি আমরা, তাদের সঙ্গে আমাদের প্রজন্মের কম মানুষেরই বিয়ে হয়েছে। আজকাল যেমন উল্টোটাই

নিয়ম। সে কারণেই হয়তো ভালবাসা সম্বন্ধে আমাদের এখনও এত রোম্যান্টিসিজম বেঁচে আছে।

ফিঙে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ।

তারপরে বলল, তাই?

তাই তো! কিন্তু এখন ভাবি, ভাগ্যিস তেমন হতো তখন। ভালবাসাটা আলাদা ব্যাপার। চিরদিনই। ভালবাসাটা যে বিয়েতে পৌঁছে ফুল-ফলন্ত হয়ে উঠবেই, এমন কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম তো নেই। বরং আমি বলব, তোমাকে একটু দেখতে পেয়েই যেরকম খুশিতে আমার মন ভরে উঠত, তেমন খুশি, তুমি আমার বিবাহিত স্ত্রী হয়ে এসে ঘর করলে হয়তো কখনওই হতে পারতাম না। এটা কোনো দোষ বা গুণের ব্যাপার নয় ফিঙে। এটা ঘটনা। এটাই সত্যি। আমরা স্বীকার করি আর নাই করি। বিবাহিত জীবন মানেই টাকা-পয়সা, ছেলে-মেয়ে-সংসার, অভ্যেস, পরশ্রীকাতরতা, নিজেদের এবং অন্যের। সেই আবর্তে পড়ে ভালবাসার লাশ-কাটা ঘরের লাশ-এরই মতন অবস্থা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই।

ওসব কথা থাক।

তুমি তো জানতে যে আমার গুয়াহাটিতেই বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পরে গৌরীপুর থেকে তো সেখানেই গেছিলাম। আমি যে ধুবড়িতে থাকি এখন, তা তুমি জানলে কী করে?

ফিঙে শুধোল।

জেনেছিলাম বলেই তো গণেশ সেনের সই-করা "সবুজের আসরের" নেমন্তন্ন পেয়েই একবাক্যে আসব বলে রাজী হয়ে গেলাম। নইলে সচরাচর আমি কোথাওই যাই না।

কেন? যাও না কেন?

প্রথমত, আমি এখনও "সাহিত্যিক" হয়ে হয়ে উঠতে পারিনি, সেইজন্যে। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয়, সাহিত্যিকের যথার্থ স্থান তাঁর লেখার টেবল-এ। তিনি নিজে অন্য জীবন যাপন করতে অবশ্যই পারেন ব্যক্তি হিসেবে। কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে সব সময়ে লুকিয়ে রাখাই বোধহয় ভাল।

কেন?

বিমল মামা, মানে বিমল মিত্র এই কথাই বলতেন। বলতেন, একজন সাহিত্যিক নায়কও নন, খেলোয়াড়ও নন। তাঁর স্থান আলোজ্বলা মঞ্চে নয়। দূরদর্শনের পর্দাতেও নয়। তাঁর সঙ্গে পাঠক-পাঠিকার যোগসূত্র থাকা উচিত

শুধুমাত্র তাঁর লেখারই মাধ্যমে। পাঠক-পাঠিকারও সাহিত্যিককে চোখে না দেখাই ভাল। সাহিত্যিকেরও উচিত পাঠক-পাঠিকার কাছে না-যাওয়া।

তাই? বিমল মিত্র তাই বলতেন বুঝি?

হ্যাঁ।

তুমি যদি জানতেই আমি এখানে আছি তাহলে আসামাত্রই যোগাযোগ করলে না কেন?

বাঃ। ভালই বলছ তো! তুমি যদি আমাকে না চিনতে চাইতে! তোমার বর, তোমার ঘর, তোমার ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে তো কিছুই জানতাম না আমি। এখনও জানি না। তামাহাট, গৌরীপুর, ধুবড়ির পাট কি আমার আজকে চুকেছে! সেসব কতদিনের কথা! আমি জানতাম যে, আমি যে আসছি, সে খবরটা তোমার কানে ঠিকই পৌঁছবে।

কী করে সে কথা জানতে?

আমি তো আর সেই সব দিনের পরিচয়হীন চখা চক্রবর্তী আজ নেই। আমার আসা-যাওয়ার আগে আগেই ফুলগন্ধর মতন খবর ওড়ে। জানতাম, আমি এলে তুমি খবর পাবেই। শুধু ধুবড়িতে আসার খবরই নয়, আমার মৃত্যু-সংবাদও পাবে কাগজে, রেডিওতে, টিভিতে। যে দুঃখ তুমি দিয়েছিলে একদিন, তার শোধ আমি এমনি করেই তুলব।

তুমি যেমন নির্বোধ ছিলে তখন, এখনও ঠিক তেমন নির্বোধই আছ। তোমার লেখা বই কোন নির্বোধেরা পড়ে যে তোমাকে বিখ্যাত করল, তা ঈশ্বরই জানেন!

হাসল চখা। কিন্তু শব্দ হলো না কোনোও।

বলল, তুমি হয়তো জানো না যে, বোধের নানারকম স্তর থাকে। বুদ্ধিমান এবং নির্বোধদেরও। আমার স্তরের নির্বোধেরাই হয়তো আমার লেখা পড়েন।

তারপরে বলল, আজ ঝগড়া করবে বলেই কি কাল সার্কিট-হাউসে ফোন করেছিলে? তুমি কি জানো যে তোমার সঙ্গে এখন এখানে আমার দেখা হওয়ার কত বাধা? সেদিনের কনসার্ভেটিভ গৌরীপুরের সেই কলেজ-ছাত্রীর সঙ্গে দেখা করাও হয়তো আজকে তোমার সঙ্গে দেখা করার চেয়ে অনেকই সহজ ছিল।

কেন?

এই জন্যে যে এখন আমার পায়ে বেড়ি। বড় ভারী সেই বেড়ি।

কিসের বেড়ি?

খ্যাতির।

খ্যাতির বেড়ি এতই ভারী?

বড় ভীষণই ভারী, ফিঙে।

তারপরই বলল, বেলা বাড়ছে। এক্ষুণি বডিগার্ডই বলো আর নীতবরই বলো, আমার কাজিন ঝন্টুবাবু আমার খোঁজে আসবে।

তামাহাটের?

হ্যাঁ। তাছাড়া, নিমাইদা আর দীপ্তি বৌদিও আসতে পারেন। তাঁরা সকালের চা খাওয়ার পরই এদিকে আসেন রোজই বেড়াতে।

হাসল ফিঙে।

বলল, এলে হবেটা কি? আমাদের দেখলেই বা কি হবে?

হয়তো হবে না কিছুই। তুমি আমার এক সময়ের প্রেমিকা না হলে হয়তো এই ভয়টাই জাগত না মনে। তাছাড়া আমার আর কী হবে! তার চেয়ে তোমার স্বামীকে বিকেলে বইমেলাতে আসতে বলো না। তাঁর সঙ্গে তোমাদের বাড়িতেই না হয় যাব ছাতিয়ানতলাতে। যে ঘর আমার হাতে পারত সেই ঘরেই দেখব তোমাকে। তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ হবে, ছেলে-মেয়ের সঙ্গেও।

তারপরে বলল, তোমার ছেলে-মেয়ে কি? ফিঙে?

আমার স্বামী বা ছেলে-মেয়ের খোঁজে তোমার দরকার কি? আমি কি কেউই নই?

আশ্চর্য তো! তুমি ঠিক সেইরকমই আছ।

কীরকম?

অবুঝ।

তুমিও হুবহু সেইরকমই আছে।

সেটা কীরকম?

বুঝদার, হুঁশিয়ার।

চখা হেসে বলল, তোমার সঙ্গে কথায় পারব না। পারিনি কোনোদিনও।

লেখাতেও পারবে না। আমি যদি কলম ধরতাম তবে তোমার মতন অলকা-পলকা লেখকেরা হাওয়ার মুখে কুটোর মতন ভেসে যেতে।

তারপর বলল, শোনো, আমি এখন যাচ্ছি। আমি আবারও আসব পরশু এখানেই। রাত আটটার সময়ে। নৌকো ঠিক করে রাখব। চাঁদের রাতে আমরা যেমন গঙ্গাধর নদীর বুকে ভেসে বেড়াতাম নৌকোতে নৌকোতে, বালুচরে চখা-চখী হতাম, মনে আছে? তেমনই আজ রাতেও ভাসব ব্রহ্মপুত্রে, খেলব। আঃ!

আরে! আজ কী করে হবে! আজ যে আমার নেমন্তন্ন রাতে। শুধু আজই কেন? যে ক' দিন আছি রোজই নেমন্তন্ন। নিমাইদা-বৌদিকেই আসলে করেছেন নেমন্তন্ন ওঁরা। সঙ্গে আমাকেও হয়তো চক্ষুলজ্জাতেই।

যেও নেমন্তন্নে, তবে কটা চুমু খেয়ে ও খাইয়ে একটু দেরি করেই যেও না হয়।

তারপরই বলল, আচ্ছা! এবারে যেতে হবে। আমি সন্ধ্যের পরে পরেই আসব কিন্তু।

পাগলামি কোরো না। হবে না আমার আসা ফিঙে। তখন তো বইমেলাতেই থাকব। আজকে অসমীয়া সাহিত্যর উপরে আলোচনা হবে। কনক শর্মা সাহেব, জেলার ডি. সি. ছিলেন সাত দিন আগেও, গৌরীপুরের অসমীয়া সাহিত্যিক শীলভদ্র সাহেব, এঁরা সবাই বক্তৃতা দেবেন। প্রদীপ আচার্য, যদিও ইংরেজির অধ্যাপক গুয়াহাটির কটন কলেজের, তবু তিনিও আজ মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন। যাব বলে তাঁদের কথাও দিয়েছি। না গেলে, অসভ্যতা হবে।

সেখানে কিছুক্ষণ থেকে চলে আসতে পারবে না? আমার ডাকে সাড়া না-দেওয়াটাই কি তোমার সভ্যতার একমাত্র নিদর্শন?

জানি না। যদি না পারি?

না পারলে, পেরো না। তবু আমি এখানে আসবই সাতটার সময়ে। ঠিক সাতটা। আটটা অবধি দেখব। রিকশা দাঁড় করিয়ে রাখব। নৌকোও। যদি না আসতে পারো তো কি আর হবে? ফিরে যাব।

চখা আন্তরিক গলাতে বলল, বলল যে, সত্যিই চেষ্টা করব আমি। সত্যি! তুমি এত বছরেও একটুও বদলাওনি। তেমনই দুর্বোধ্যই আছ।

বদলেছি। অবশ্যই বদলেছি। সেই বদলটা তোমার চোখ দেখতে পায়নি। আমরা মেয়েরা, নদীরই মতন। কত যে চর ফেলেছি, পাড় ভেঙেছি, দ্বীপ গড়েছি এ ক'বছরে, তার খোঁজ তুমি পাবে কী করে! তোমার যা নেবার তা তো তুমি স্বার্থপর নির্বোধ পুরুষ নিয়ে খুশি থেকেছ। তুমি ভেবেছিলে, আমার সর্বস্ব পেয়েছ। অথচ যে প্রাপ্তিকে তুমি সবচেয়ে দামী বলে ভেবেছিলে তার দাম আমার কাছে কানাকড়িও ছিল না। আমার সর্বস্ব যদি কেউ কোনোদিন পায়ও তবে তার সর্বনাশ হবে।

চখা বলল, বলছ, তোমার 'সর্বস্ব' পাওয়ার আর নিজেকে সর্বস্বান্ত করাতে তফাৎ বিশেষ নেই!

সাধে কি আর তোমাকে নির্বোধ বলতাম, না আজকেও বলছি?

বলেই ফিঙে বলল, যাইহোক, আশা করছি, যত অসুবিধেই থাক, ঘণ্টাখানেকের জন্যে অন্তত আসতে পারবে।

তোমার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবে না? আজ দুপুরেও যেতে পারি, যদি বলো।

না।

তবে তো সার্কিট-হাউসেই তুমি আমার ঘরে আসতে পারো। ঝন্টুকে কোনো বাহানা করে কোথাও না হয় পাঠিয়ে দেব। মানে, ঘরে একাই থাকব আমি।

না। নদীতেও তো আমি একাই থাকব। দুজন একা যোগ করলেই যে দোকা হয় তাও কি জানো না? অত কথার দরকার নেই। নদীতেই যাব। আসতে পারলে এসো, না আসতে পারলেও কিছু বলার নেই। আমার ঘর...

এই অবধি বলেই, ফিঙে চুপ করে গেল।

তারপর চলে যাওয়ার আগে বলল, আমার ঘর যে নেই এমন নয়। ঘর বলতে সাধারণে যা বোঝায়, আমার ঘরে তার সবই আছে। স্বামী আছেন, পুত্র আছে, ফ্রিজ, টি.ভি. সোফা-সেট, সমস্যা, দৈনন্দিনতা, অভ্যেসের নিগড়, সবই। সেই থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড়। আছে সবই কিন্তু আমি একাই।

চখা চুপ করে ফিঙের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আশ্চর্য! মুখের চামড়া আজও তেমনই টানটান আছে, সজীব, মসৃণ। একটি স্লিভলেস ব্লাউজ পরেছে। হালকা খয়েরি। আর খয়েরি কালো ডুরে শাড়ি। চুল উড়ছে ফুলের মতন, ভুলের মতন ফিঙের, ব্রহ্মপুত্রর উপর দিয়ে বয়ে-আসা প্রভাতী হাওয়াতে। ওর বোধহয় গরম বেশি। চখা তসরের একটি চাদর গায়ে দিয়ে বেরিয়েছিল অথচ ফিঙে স্লিভলেস-ব্লাউজ পরে রয়েছে। বগলের কাছে ছায়ার মতন একটু কালোর আভাস। সেই ছায়া তার শরীরের রহস্য যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মনের রহস্য তো আছেই!

ফিঙে বলল, আমরা সকলেই একা। আমার স্বামীও একা। তুমিও একা। আমার ঘর থাকলেও সেই ঘরে তোমাকে আদৌ মানাবে না চখাদা। তোমার মধ্যে আমি আমার আকাশকে দেখেছিলাম একদিন। আকাশ কি কখনও ঘরে আসে? চখা-চখীরা থাকে নদীতেই। চিরদিন। অথবা হ্রদে। অথবা নদীচরে। উদাত্ত আদিগন্ত আকাশের নিচে। তুমি কি ভুলে গেছ যে তুমি আমাকে চখী বলে ডাকতে?

তারপর শেষ কথা বলল, এসো। এসো। নদীটাই, নদীর চরটাই আমার বারান্দা। তোমাকে ঘরে না নিয়ে গিয়ে বারান্দাতেই খেলব তোমার সঙ্গে।

যাবার সময়ে, এমনই এক চাউনিতে চাইল ফিঙে চখার দিকে যে, ওর মনে হলো ও যেন ফিঙের গভীর ভালবাসাতে চান করে উঠল।

সত্যি! এই মেয়েরা বিধাতার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। ভাবল চখা। সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মেয়েরা জানলই না তাদের কী ছিল? তারা মস্ত বোকা বলেই পুরুষের মতন নির্গুণ, ঈশ্বরের আশীর্বাদ-অধন্য ইতর জানোয়ারদের সমান হবার জন্যে প্রাণপণ লড়াইতে সামিল হলো।

এ ভারী লজ্জার কথা।

তারপর পিছু ডাকল ফিঙেকে ও।

ফিঙে তার মরালীর মতন গ্রীবা বেঁকিয়ে, ভুরু তুলে নিচু গলাতে বলল, কি?

বলতে ভুলে গেছিলাম। ঠিক তোমারই মতন একজনের সঙ্গে আলাপ হলো গত সন্ধ্যেতে বইমেলাতে।

ফিঙের মুখে ঈর্ষা এবং বিদ্রূপ ফুটে উঠল।

বলল, আমারই মতন? হাঃ! আমার মতন এই পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউই নেই। তোমার ছোটখাট ফর্সা নিমাইদারই মতন ব্রহ্মাও একটিই মাত্র চিকন-কালো ফিঙেকে তৈরি করেছিলেন তাঁর ভাঁড়ারে যত কিছু ভাল উপাদান ছিল তার সবটুকু দিয়ে।

তারপরই বলল, উপাদান না বলে, উপচার বলাই ভাল। স্বয়ং ব্রহ্মারও পূজো-পাঠ করতে হয়েছিল আমাকে বানাতে। আমার মতন দ্বিতীয় কেউ থাকতেই পারে না।

সে-কথার জবাব না দিয়ে চখা বলল, সত্যি বলছি। হুবহু তুমি। ঠিক যেমনটি ছিলে কলেজে পড়ার সময়ে। মেয়েটির নাম জবা। কী ভাবল সে, কে জানে! অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়েছিলাম তার দিকে। কী সুন্দর যে তার চোখ দুটি! কী সুন্দর ভুরু! আর কালো তো নয়, যেন জগতের আলো। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ বহু জন্ম আগে ওকে দেখেই লিখেছিলেন ঃ

"কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি,
কালো তারে বলে অন্য লোক।
দেখেছিলাম ময়নাপাড়ার মাঠে,
কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।"

থমকে দাঁড়াল ফিঙে।

বলল, সে মেয়ে থাকে কোথায়?

এখন কলকাতাতে। বিয়ে হয়ে গেছে যে। ধুবড়িরই মেয়ে।

কোন বাড়ির মেয়ে?

গণেশ সেনের দাদার মেয়ে।

কোন গণেশ সেন?

আরে "সবুজের আসরে'র গণেশ সেন, যাঁরা বইমেলার উদ্যোক্তা।

আমি চিনি না।

চখা বলল, বিশ্বাস করবে না, অবিকল সেই গৌরীপুরী তোমারই মতন। হুবহু তুমি! সে যেন INCARNATED তুমি!

হতে পারে সে জবা। তবে বারোমেসে জবা নয় সে। কখনওই নয়। আমার নাম ফিঙে। আমি চিরকালীন। এবং আমি একমাত্র। আমার কোনো DOUBLE নেই।

তারপর বলল, রাতে এখানেই এসো চখাদা, প্লিজ। এবারে কিন্তু আমি সত্যি সত্যিই চললাম।

শোনো ফিঙে।

তোমার স্বামীর নাম কি? নামটি বলে যাও।

চখা বলল।

একমুহূর্ত চুপ করে রইল ফিঙে।

তারপরে বলল, রাতে স্বামীর নাম? আমার স্বামীর নাম, স্বামী।

বলেই, চলে গেল এবারে সত্যিই দূরে দাঁড় করিয়ে-রাখা রিকশার দিকে।

চখা ভাবছিল, এ এক আশ্চর্য দেশ। এখানে নদীর নাম নদী।

গাছের নাম গাছ।

পাখির নাম পাখি।

আর স্বামীর নামও স্বামী!

শুধুই স্বামী।

ফিঙে চলে গেলে চখার ঘরে বসেই চখা ও ঝন্টু নিমাইদা ও দীপ্তি বৌদির সঙ্গে প্রাতঃরাশ সারল।

নিমাইদাকে যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে চখা। সত্যিই জীবনীশক্তির

সংজ্ঞা যেন মানুষটি। অনুক্ষণ চৈত্র-দুপুরের চড়াই পাখিটির মতনই ছটফট করছেন। পরিবেশে, প্রতিবেশে অনবরত আনন্দর ধুলো ওড়াচ্ছেন। এমন জীবন্ত মানুষের সঙ্গ পাওয়াও ভাগ্যের। খুবই ভাগ্যবতী দীপ্তি বৌদি।

ব্রেকফাস্ট সবে শেষ হয়েছে, এমন সময়ে বন্ধ দরজার বাইরে কাদের যেন পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সবসময়েই কেউ না কেউ আসছেনই। ঝন্টু, চখার পাহারাদারীতে আছে অবশ্য। গম্ভীর গলাতে, ভারিক্কি চেহারাতে আগন্তুকদের ভালমতন ভয় পাইয়ে দিয়ে বলছে, "অটোগ্রাফ এখানে উনি দেবেন না, বিকেলে বইমেলাতে আসবেন।"

গতকাল এই যান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই অধ্যাপক প্রদীপ আচার্যকেও স্বাক্ষর-শিকারী ভেবে ও হাঁকিয়ে দিচ্ছিল। ভেতর থেকে নাম শুনতে পেয়ে চখা নিজেই দৌড়ে এসেছিল তাঁকে ভেতরে ডেকে নিতে। তারপর অনেক গল্প করেছিল। শুধু ইংরেজি সাহিত্যে অসাধারণ দখল আছে বলেই নয়, প্রদীপ যে চখা চক্রবর্তীর মতন অপাংক্তেয়, অ-আঁতেল লেখকের বাংলাতে-লেখা প্রত্যেকটি প্রণিধানযোগ্য বইও পড়ে ফেলেছেন, একথা জেনে অত্যন্তই অভিভূত হয়েছিল ও।

আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে যেমন ওড়িশা ও আসাম, বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে যতখানি উৎসাহ ও আগ্রহ, তার সিকি ভাগও বাঙালিদের মধ্যে দেখতে পায় না, তাঁদের সাহিত্য অথবা সংগীত সম্বন্ধেও। এই কূপমণ্ডুকতা এবং অকারণ উচ্চমন্যতা চখাকে আন্তরিকভাবে লজ্জিত করে। সম্মান বা শ্রদ্ধা দিলে তবেই তো তা ফেরৎ পাওয়া যায়।

ঝন্টু দরজা খুলতেই সমীর দাশগুপ্ত এবং মিসেস নিয়োগী ঢুকে এলেন।

বললেন, দেখুন, কাকে এনেছি।

কাকে?

বলেই উল্লাসে লাফিয়ে উঠল চখা, সোফা থেকে। উত্তেজিত হয়ে বলল, বিল্টু! তুই!

গৌরীপুরের বিল্টু হাসতে হাসতে বলল, তুই ত এলায় ডাঙ্গর হইছ। চখা চক্কোবত্তি যার নাম। চিনবার পারস কি আমারে?

বাজে কথা বলিস না। এখন বল, তুই আছিস কেমন? করিস কি? তোকে চিনব না? কারও পক্ষেই কী বিল্টু কলিতাকে ভোলা সম্ভব, একবার আলাপ হবার পরে?

তারপর সমীরবাবুদের দিকে চেয়ে বলল, আপনারা কি বলেন?

ঠিক, ঠিক।

সকলেই একবাক্যে বললেন।

করুম আর কি? যা কাম আমার আছিল তাই করি।

বিল্টু বলল।

কি কাজ?

নাই-কাম।

হাসল চখা। মনে পড়ে গেল তিস্তার চ্যাংমারীর চলে যখন রিক্ল্যামেশানের কাজ চলছিল তখন দুর্গাকাকুর সঙ্গে হাতির পিঠে চড়ে বনশুয়োরের তালাশে যেতে যেতে শোনা কথোপকথন। একজন চাষী, নতুন উদ্ধার-করা নতুন জমিতে কি যেন বুনছিল। দুর্গাকাকু তাকে বললেন, কি করেন হে বাহে?

সেই চাষী একবার নিস্পৃহভাবে মুখ ঘুরিয়ে দেখল।

রাজা-রাজড়ার বাহন হাতির মতন জানোয়ারের পিঠে সওয়ার-হওয়া, রাইফেল-বন্দুক হাতে গণ্যমান্য তাদের প্রতিও তার বিন্দুমাত্র মনোযোগ ছিল না। সে আরও বেশি নিস্পৃহভাবে বলল, না-করি-কোনো। অর্থাৎ কিছুই করছি না এবং করার ইচ্ছেও নেই, এমনই এক ভাব আর কি!

'নাই-কাম' করি বলে, বিল্টুও আসলে বলতে চাইছে, না-করি-কোনো।

গান-টান গাইছিস না আজকাল?

তথা শুধোল বিল্টুকে।

কামের মধ্যে হেইটাই করি একমাত্র।

তারপরই বলল, হ। ভাল কথা মনে পড়াইছস।

কি?

তার প্রতিমাদি দেখা করনের লইগ্যা ডাকছেন। আমারে কয়্যা দিছেন।

এখন প্রতিমাদি কি গৌরীপুরেই আছেন?

হ। বয়স ত হইতাছে আস্তে আস্তে।

বিয়ে করেননি?

করেছেন। প্রমথেশ বড়ুয়া কলেজের প্রফেসর পাণ্ডে সাহেবরে। এহনে তাঁর নাম হয়্যা গিছে প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডে।

নিমাইদা জিজ্ঞেস করলেন, এই প্রতিমাদি কে?

প্রতিমা বড়ুয়া। লালজী, মানে, প্রকৃতীশ বড়ুয়ার মেয়ে আর প্রমথেশ

বড়ুয়ার ভাইঝি। নাম শোনোনি ওঁর? গোয়ালপাড়িয়া গানে উনি ভারত-বিখ্যাত। পদ্মশ্রী, সংগীত-নাটক অ্যাকাডেমির অ্যাওয়ার্ড সবই পেয়েছেন। মাহুতের গান, হাতির গান, আরও কতরকমের গান গেয়ে নিম্ন আসামের এই গোয়ালপাড়া জেলাকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন। পার্বতী বড়ুয়ার নামও নিশ্চয়ই পড়েছেন কাগজে। লালজীর মৃত্যুর পরে উনিই তো এখন ডুয়ার্সের জঙ্গলের মধ্যের নানা জনপদে অত্যাচার-করা জংলী হাতির দলকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে। আগে যে দায়িত্ব, তাঁর বাবা লালজীর উপরেই অনেকদিন ন্যস্ত ছিল।

বাবাঃ! তুমি এতো জানলে কি করে?

নিমাইদা অবাক হয়ে বললেন চখাকে।

জানব না? গৌরীপুর ধুবড়ি তামাহাটে যে একসময়ে বেশ কিছুদিন কাটিয়েছি নিমাইদা। তাছাড়া, পরবর্তী জীবনেও গৌরীপুরের রাজন্য এই বড়ুয়া পরিবারের অনেকের সঙ্গেই আমার যোগাযোগ ছিল।

তারপর বিল্টুর দিকে ফিরে বলল, প্রতিমাদি কি প্যালেসেই আছেন?

মাটিয়াবাগেই আছেন এহনে।

মাটিয়াবাগটা কি ব্যাপার হে চখা? কোনো জায়গার নাম যে তা তো বুঝছি। কিন্তু হাজারিবাগের ভায়রাভাই নাকি?

হাওড়া জেলার মানুষ নিমাইদা চখা অ্যান্ড কোম্পানির আক্রমণে উদ্‌ভ্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে শুধোলেন।

মাটিয়াবাগ হচ্ছে গৌরীপুরের বড়ুয়া রাজাদের 'সামার প্যালেস'। ঐ প্যালেসেরই সামনে, ডান পাশে, প্রতাপ সিং-এর কবর আছে।

কে প্রতাপ সিং? ওদের পূর্বপুরুষ কেউ?

হেসে ফেললেন সকলেই নিমাইদার কথা শুনে।

চখা বলল, প্রতাপ সিং লালজীর বড় প্রিয় হাতি ছিল। অত বড় হাতি বড় একটা দেখা যেত না তখনকার দিনেও ভারতে।

অ্যানথ্রাক্স রোগে পরে মারা যায় প্রতাপ সিং। প্রমথেশ এবং প্রকৃতীশ দুজনেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিল সেই হাতি।

সমীরবাবু বললেন, শোনো না একখান গান চখাদারে।

বিল্টু কলিতা বলল, শুনাইলে শুধু এক খান ক্যান শুনাম্? অনেক গানই শুনাম্। তবে ঘরে বইস্যা কি আমাগো গোয়ালপাড়িয়া গান গাইতে বা শুনাইতে

ভালো পাওন পাওয়া যায়। চখা, তুইই ক?

চখা বলল, গা না। খারাপ পাওনের কি আছে?

তারপরই চখার দিকে ফিরে গলা নামিয়ে বলল, তর গৌরীপুরী চখী ত এহনে ধুবড়িতেই আছে। জানস কি তা?

অন্যরা একটু উৎসুক হয়ে চাইলেন কিন্তু অত্যুৎসাহী হওয়ার অসৌজন্য এড়ানোর জন্যে আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

চখা চোখ দিয়ে বিল্টুকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে বলল, মুখে কিছু না বলে।

মুখে বলল, এখন একটি গান তো শোনা। তারপরে সমীরবাবু এবং মিসেস নিয়োগীও শোনাবেন। যে রাতে ধুবড়িতে এসে পৌঁছলাম সার্কিট হাউসে, তামাহাট থেকে, সেই রাতেও ওঁরা এসেছিলেন। গানও গেয়েছিলেন।

নিমাইদা বললেন, আমি কিন্তু আজ গাইতে পারব না।

বিল্টু রসিকতা না বুঝেই বলল, কেন?

কারণ, আমার গলা আজ ভাল নেই।

ও।

সকলেই মেনে নিলেন।

সমীর দাশগুপ্ত আর মিসেস নিয়োগীই একমাত্র বুঝলেন রসিকতাটা, নিমাইদা নিজে, আর চখা ছাড়া।

বিল্টু কোনো ভনিতা না করেই ধরে দিল ঃ

"দেহের কপাট খুলে দেখিলে হয়
দেহের আয়না খুলে দেখিলে হয়
মনের মানুষ কোথায় পাওয়া যায়।।
যেমন আন্ধার ঘরে
সাপ সোন্দাঁইলে
সারা রাইতে মন সাপের ভয়
মনের মানুষ কোথায় পাওয়া যায়।।
যেমন শিঙি মাছে
কাঁটা দিলে মন
সর্ব অঙ্গ জ্বইলে যায়
মনের মানুষ কোথায় পাওয়া যায়।।"

বাঃ বাঃ করে তারিফ করে উঠলেন নিমাইদা।

সাধুবাদ দিলেন সকলেই।

কিন্তু চখা ভাবছিল যে, বিল্টু ঠিকই বলেছিল। এইসব গোয়ালপাড়িয়া গান ঘরে বসে গাইবারও নয়, শোনবারও নয়।

এমন সময় হীরেন পাল আর গণেশ সেনও হাতে মিষ্টি পান আর একশো বিশ বাবা জর্দার কৌটো নিয়ে ঢুকলেন। নিমাইদা মিষ্টি পান খান। চখা আর ঝন্টুও জর্দা পান খেল।

বিল্টু বলল, গুয়া পান আনেন নাই আমার লইগ্যা বুঝি?

আরে। আইন্যা দিতাছি। যামু আর আমু।

বলেই, হীরেনবাবু নদীপারের রাস্তার মোড়ের পানের দোকানে ছুটলেন।

গুয়াটা কি জিনিস?

দীপ্তি বৌদি বললেন।

ঝন্টু বলল, আরে "গুয়াহাটি" শুনেছেন আর "গুয়া" শোনেননি? গুয়া, মানে সুপুরি। আগে যখন প্লেন নামত গৌহাটির বড়ঝর এয়ারপোর্টে তখন দীর্ঘ পথ আসতে হতো গৌহাটি পৌঁছাতে। সেই পথের দুপাশেই সুপুরির সারি ছিল ঘন পথ বেয়ে। ইংরেজরা গুয়াহাটিকে বলত গহাটি। ব্যাটাদের জিভ ভারী তো! তার থেকেই বাংলাতে গৌহাটি। আসলে সুপুরির হাট ছিল ওখানে মস্ত বড়, তা থেকেই নাম গুয়াহাটি।

চখা বলল, সেই গানটা গা তো রে বিল্টু। সেই, ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে...

আরে ও সমীরদা, এট্টু চাও ত খাওয়াইবেন না কি? আমি না হয় চখা চক্কোবত্তির মতন ফ্যামাস নাই হইলাম। গান কি শুকনা গলায় হয় নাহি?

সঙ্গে সঙ্গে গণেশবাবুও বাইরে গিয়ে বাবুর্চিখানাতে চায়ের কথা বলতে গেলেন। এক দু পটের কম্মো তো নয়।

এমন সময়ে রাজা, রুবী আর ইতু এসে ঢুকল ঘরে।

চখা বলল, এসো এসো। ঠিক সময়েই এসেছ।

তারপর সকলের সঙ্গে ওদের আলাপ করাতে যেতেই সমীরবাবু বললেন, আরে মায়ের সঙ্গে মাসীর আলাপ করিয়ে আর কি হবে? ধুবড়ি গৌরীপুর তো আর আপনাদের কলকাতা নয় স্যার? ছোট জায়গা। দিল এ নয়, আয়তনে। আমরা সকলেই সকলকে চিনি।

মিসেস নিয়োগী বললেন, ইতু তো নাটকও করে নিয়মিত।

সবুজের আসরে?

তাও করে। আর আমাদের অন্য ক্লাবও আছে।

চখা বলল, বিয়ে-থা করেনি ইতু, কিছু তো নিয়ে থাকবে একটা।

নিমাইদা বললেন, নাটক জীবনে না করে মঞ্চে করছি ভাল। কী বল ইতু?

ইতু হাসল।

এবারে ধর তুই বিল্টু। শোনো তোমরা বিল্টুর গান।

চখা বলল।

সমীরবাবু বললেন রুবী কিন্তু আলিপুরদুয়ারের মেয়ে।

তাই? কালকে আলিপুরদুয়ার থেকে একজন আসবেন আমার কাছে। অ্যাডভোকেট এবং জুনিয়ার পাবলিক প্রসিকুটর তপন সেন। চেনো না কি?

চখা বলল।

তপন সেন? আমাদের তপনদা নয় তো? বলেই তার স্বামী রাজার দিকে তাকাল।

রাজা বলল, বিয়ের আগে তোমার তো কত দাদাই ছিল। তপনদাটি কে, তা আমি কি করে জানব?

রুবী লজ্জিত হয়ে বলল, এতো অসভ্য না!

সকলেই হেসে উঠলেন রাজার কথাতে।

রুবী বলল, তপনদা আমার দিদির ক্লাসফ্রেন্ড।

নিমাইদা বললেন, যাকগে আনসীন কোশ্চেন তপন সেনকে তাহলে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো। এক্সপ্লানেশান দিলে, তোমার দিদিই দেবেন।

এবার শুরু কর বিল্টু।

চখা বলল।

হ্যাঁ।

বিল্টু দুবার গলাখাঁকারি দিয়ে শুরু করল। তার আগে বলল, বগার গান শোননের আউগ্যা অন্য একটা শোন। রসের গান।

তারপরেই মিসেস নিয়োগীর দিকে ফিরে বলল, নন্দাদি, খারাপ পাইয়েন না য্যান আবার।

মিসেস নিয়োগী লজ্জিত হয়ে হেসে বললেন, আপনারে ত চিনিই আমরা হক্কলেই। খারাপ পাওনের আছেটা কি? গান তো আর আপনে বান্ধেন নাই। খারাপ পাওনের কিছুই নাই। গায়েন আপনি।

না, তা না হয়। এ গুলান আবার ফ্যামাস মানষি ত! তাই আগেভাগে কয়্যা থুলাম আর কী!

বিল্টু গান শুরু না করে চখাকে বলল, নন্দাদি কিন্তু খাব ভাল শুঁটকি মাছ রান্ধেন তা কি জানস? লইট্যা, চিংড়ি, শীতল শুঁটকি। খাওয়ান নাই তরে?

পরক্ষণেই মিসেস নিয়োগীর দিকে ফিরে বলল, ছিঃ ছিঃ নন্দাদি।

উনি বললেন, এঁদের সময় কোথায়? প্রতি রাতেই ত হাউস-ফুল। অ্যাডভান্স-বুকিং হইয়া গ্যাছে গিয়া। এক প্রহরও খালি নাই। উনাগো খাওয়াইতে পারেন ত ভাগ্যের কথা।

আমি কিন্তু ঐসব বিজাতীয় শুঁটকি-মুঁটকি খাই না। চখাও যে খায়, তা তো জানা ছিল না!

নিমাইদা বললেন।

তাই?

বিল্টু কলিতা বলল।

তারপরেই ধরে দিল গান। একেবারে তারাতে। বিল্টু যখনই গায়, তখনই তারাতে!

"ভাগিনারে, তোর স্বভাব ভাল নয়
ভাগিনা গেইল্ মাছ মারিতে
মামি গেইল্ তার খলাই ধরিতে
কাদো জলে মাছ না পায়্যা
ভাগিনা, কাদো ছিটায় মামির গায়।
হায়! হায়! ভাগিনারে!
তোর স্বভাব ভাল নয়।"

সমীরবাবু বললেন, এবার থামো বিল্টু মহারাজ। অন্তরাটা আর নাই গাইলে। যে গানটি চখাদা রিকোয়েস্ট করলেন, সেটাই বরং গাও।

ক্যান? খারাপ পাইলেন কি আপনেরা? না খারাপ গাইলাম মুই?

হে কথা কেউই কয় নাই। ভ্যারাইটির কথা হইতাছে। নানারকম গান ত আছে আমাগো, না কি?

হীরেনবাবু বললেন।

হীরেনবাবু কবিও। তাঁর একটি কবিতা সংকলন 'উত্তরণ' চখা এবং নিমাইদাকে দিয়েছেনও উনি।

"আজ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
ফান্দ বসাইছে ফান্দি ভাইয়া রে
পুটি মাছ দিয়া
পুটি মাছের লোভে বগা
পরে উধাও দিয়া রে।।

ফান্দাতে পড়িয়া বগা করে টানাটুনা
আহা রে কুমকুরা সুতা
হইল লোহার গুণারে...."

গাইল বিল্টু।

তারপর?

নিমাইদা শুধোলেন।

তারপর আর গামু না। অগো "ভ্যারাইটি" দেখাইতাছি।

সকলেই বিল্টুর ঐ কথাতে হেসে উঠলেন।

সমীরদা, তুমি এবার একখান গান শুনাও দেহি চখাদারে।

বিল্টু বলল।

সমীরবাবু বললেন, আমার গলাটা আজ ভাল নেই।

নিমাইদা বললেন, আজ অবধি কোনো গায়ক-গায়িকার গলা যে ভাল আছে এমন কথা তো শুনিনি।

সকলেই সে-কথাতেও হেসে উঠলেন।

সমীরবাবু দুবার গলা খাঁকরেই ধরে দিলেন :

"হুটুক্কারা আসিলেন বাড়ি সুট করিয়া কং
দাদা আসছে নিয়া যাবার নাইয়োর যাবার চাং।
মাদাদিনে আসছে দাদা যদি বা না যাং
গোসা হয়্যা যাবেন দাদা (কথাটা) এমন কইরা কং।
মনটা মোর একবার আগায়, পাচবারে ভাটায়
হোলোক-পোলক মন মোর যাবার না চায়।"

চখা বলল, এই গানটা নিখিলেশ পুরকাইত মশায়ের লেখা "গোয়ালপাড়িয়া ভাষা ও লোকসাহিত্য" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে দেখেছিলাম। তাই না?

তা ত দ্যাখবাই। আমাগো গৌরমোহন রায়ও একখান গ্রন্থ লিখছেন "কাষ্ঠের

দোতারা করে রাও"। তাতেও মেলাই গোয়ালপাড়িয়া গান পাবাঅনে।

নিমাইদা বললেন, "ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে" এই গানটি, শুনেছি, লিখেছিলেন জিতেন মৈত্র নামক কুচবিহারের এক ভদ্রলোক আর সুর দিয়েছিলেন আব্বাসউদ্দিন সাহেব।

তারপর বললেন, উত্তরবঙ্গীয় ভাষা আর গোয়ালপাড়িয়া ভাষা কি এক?

না, এক নয়। কিন্তু খুবই কাছাকাছি বলা যায়। গোয়ালপাড়িয়া ভাষার সঙ্গে অধুনা বাংলাদেশের রংপুর জেলার ভাষারও খুব মিল আছে।

সমীরবাবু বললেন।

তারপর বললেন, আব্বাসউদ্দিন সাহেবের গলাতে এই গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু প্রকৃত সত্য কি, তা যোগ্য জনেদের কাছ থেকে জেনে আপনাকে জানাতে পারি। কলকাতাতে লিখব নিমাইদা আপনাকে।

হ্যাঁ। একটু জানাবেন তো স্যার।

অতি-বিনয়ী নিমাই ভট্টাচার্য বললেন।

এমন সময়ে চা এসে গেল।

চখা বলল, আগে পান খেয়ে ফেলেছি। এখন আমি আর চা খাব না। তুই আরেকটা গান শোনা বিল্টু। কবে আবার দেখা হবে কে বলতে পারে।

হইলেই হয়। তুই-ই ত দেখি ডুমুরের ফুল হইছস।

গা, গা। বড় কথা বলিস তুই।

চখা ওকে দাবিয়ে দিয়ে বলল।

বিল্টু চা-টা খেয়েই গান ধরল ঃ

"অ মোর নদী রে
অ মোর গঙ্গাধর নদী।।
কোন্ বা দোষে বৈরী রে আমি
আজি ভাঙিয়া নিলু তুই সুখের বাড়ি
এলা রেয়াই পরার বাড়িত্ থাকিবে।
এহেনো মোর সোনার মাটি
ভাঙিয়া নিলু নদী কুলকিনারী
করিলু নদী পথের ভিখারী রে।।
তোর গঙ্গাধরের পাগলারে মতি
ভাঙিয়া নিলু খেতের মাটি

আরো ভাঙিলু তুই নয়া পীরিতেরে।।
ও মোর নদী রে.....।।"

ঝন্টু বলল, এগুলো কি গান? আমি নিজে গোয়ালপাড়িয়া হয়েও তো এসব গান শুনিনি কখনও।

চখা বলল, তুই তো ঐ গৌরবেই গোয়ালপাড়িয়া। ছেলেবেলাতে পড়লি কুচবিহারে, তারপরে গেলি কলকাতায়। আর তার ওপর গত তিরিশ বছর তো বিহারীই হয়ে গেছিস। লালুপ্রসাদ যাদবের চেলা।

তা যা বলেছ।

কবুল করল ঝন্টু।

চখা বলল, বিল্টু, সমীরবাবু এবং অন্য সকলকেই, খুব ইচ্ছা করে যে, এখানে এসে বেশ কিছুদিন থাকি। গোয়ালপাড়ার মানুষ, নদী, চর, পাহাড়, জঙ্গল, গান এইসব নিয়ে বড় এবং সিরিয়াস কিছু লিখি। কিন্তু সময় কি আর হবে?

বিল্টু বলল, ছিরিয়াছ লিখতে চাইলে কুনো আপত্তি নাই কিন্তু ফেরোছাস লিখিস না য্যান ভাইডি।

সকলেই হেসে উঠল ওর কথায়।

ঝন্টু বলল, বেশি সিরিয়াস হলে তো আবার আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে। দেখো, যেন তা না হয়।

অত বিদ্যাবুদ্ধিই আমার নেই। আমি লিখলে সকলে যাতে বুঝতে পারে তেমন করেই লিখব। পণ্ডিত পাঠকদের জন্যে পণ্ডিত লেখকেরা তো আছেনই! আমি সাধারণের লেখক। যাদের হাতে-পায়ে ধুলো, গায়ে ঘামের গন্ধ, আমার স্বদেশের মাটিতে যাদের শিকড় ছড়ানো।

তারপর বলল, সকলকেই উদ্দেশ্য করে, আপনারা তো এই গোয়ালপাড়িয়া গান সম্বন্ধে অনেকেই জানেন। আমাদের কিছু বলুন না, শুনি!

বিল্টু বলল, গানের কি শ্যাষ আছে নাহি? ভাওয়াইয়ারই মইধ্যে পড়ে ঐ গানখান।

ঐ "ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে" অথবা ধর,

"গৌরীপুরের শহরে হাউয়াই ছাড়িছে
মোর কামবক্তির দুখের কথা নাই কং বাপ মাওকে।
কী আবাগীর মনে কয় দেখি আইসং যায়্যারে।"

ঝন্টু বলল, "কামবক্তি" শব্দটা উর্দু কামবক্ত থেকে এসেছে কি?

অবশ্যই। ভাষা এক দারুণ মজার জিনিস। ভাষাবিদ হতে পারার মত আনন্দ আর নেই। দুসস। জীবনটা এতই ছোট যে কিছুই হওয়া হলো না জীবনে। অন্নচিন্তা চমৎকারা। তাই করেই জীবন গেল।

সমীরবাবু বললেন।

নিমাইদা বললেন, কথাটা ঠিকই বলেছেন সমীরবাবু। প্রাণীমাত্রকেই বেঁচে থাকতে হলে খাওয়ার চিন্তা করতেই হয়। বাঘ হরিণ ধরে, সাপে ব্যাঙ, আমরা রোজগার করি জীবনধারণের জন্যে। করতে হয়। কিন্তু এই সবই জীবিকা। জীবন নয়। জীবনকে যদি জীবিকার নখ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে না পারেন তাহলে সবই বৃথা। জীবিকা আর জীবনের তফাৎ বোঝে শুধুমাত্র মানুষেই। আমরা যে বিধাতার সৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। জানোয়ারদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ তো থাকবেই। মানে, থাকা উচিত অন্তত।

বলেই বলল, আরও কি কি গান আছে? বলুন না একটু আমাদের।

এবারে সমীরবাবু বললেন, চট্‌কার কথা তো বিল্টু বললই।

একটা নমুনা দেখা না বিল্টু চট্‌কার?

চখা বলল বিল্টুকে।

বিল্টু সঙ্গে সঙ্গে ধরে দিল ঃ

"ও বন্ধু রে তোমার আশায় বসিয়া আছং বটবৃক্ষের তলে
মন মোর উরাং পারাং করে—"

মনে পড়ে গেল চখার যে, তামাহাটের গঙ্গাধরের আর তামা নদীর সঙ্গমে সেদিন সূর্যাস্তবেলাতে ভওয়া আকাশের পটভূমিতে গাছতলাতে বসে ছেলেটি সেই গানটিই গাইছিল। নাকি অন্য গান?

এছাড়াও নানা গান আছে। যেমন চাঁচর, ভাসান, দেহতত্ত্বের গান, খেদা করে বা ফাঁদে বুনো হাতি ধরার পরে সেই হাতিদের শিক্ষার গান, কুশান গান।

কুশান গানের আবার চারটি ভাগ আছে। বন্দনা, সরস্বতীর আরাধনা, মূলের আরাধনা ও মূল পালা। কুশান গান আসলে রামায়ণ গান।

মিসেস নিয়োগী বললেন, কৃত্তিবাস, এ-অঞ্চলে অত্যন্ত পূজ্য কবি। কারণ অসমীয়া কবি মাধব কন্দলীর রামায়ণ প্রথমে ছাপা হয় ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে। ততদিনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ শিকড় পেয়ে গেছিল এখানে।

আর কি কি গান আছে?

ধুবড়ি জেলাতে সর্পদেবী মনসার গানও জনপ্রিয়। এদিকে নারায়ণদেব ও

উত্তরবঙ্গে জগজ্জীবন ঘোষালের পুঁথি অনুসরণে মনসার গান গাওয়া হয়ে থাকে।

হীরেনবাবু বললেন।

সমীরবাবু বললেন, আরও আছে। গরুদের দেবতা গোন্নাথের কাহিনী নিয়ে গোন্নাথের পাঁচালী। বাঁশের দেবতা মদনকামকে নিয়েও, মানে তাঁর পূজোর জন্যেও অনেক গান আছে। তাকে বলে "মদনকামের গান"। বাঘেদের দেবতা সোনারায়ের গানও আছে। বাঘের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্যে এই গানের উদ্ভব। পৌষ মাসের প্রথম দিক থেকে ফুলের সাজি হাতে নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে এই গান গাওয়া হয়।

ঝন্টু বলল, এখনও?

হায়! হায়! এখন কোথায় বাঘ?

আমার বাবা একটা চিতাবাঘ মেরেছিলেন আমাদের গদিঘরের পাশের মুরগীর খাঁচারই মধ্যে। মুরগী ধরতে ঢুকেছিল রাতে। ছোট চিতা। আর এখন তপস্যা করতে হয় বাঘ দেখতে।

মিসেস নিয়োগী বললেন, ধুবড়ি অঞ্চলে একটিমাত্র লোকগীত "নমলকাতি"র কথা জানি। কার্তিক দেবতার পূজো করা হয় এই গানে।

কার্তিক পুজো তো কলকাতার সব খারাপ পাড়াতেই হয় বলে জানি। মানে, সোনাগাছি, হাড়কাটা গলি।

নিমাইদা বললেন।

বিল্টু বলল, আইপনাগো কইলকাতার কথা ছাড়ান দ্যান দেহি। জায়গাডাই খারাপ। তাই তার নজরডাই খারাপ।

সমীরবাবু বললেন, নমলকাতি অবশ্য মেয়েদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দেবতা হিসেবে কার্তিক তো সর্বত্রই মেয়েদেরই উপাস্য। কথাই তো আছে "কার্তিকের মতন বর"। তবে একজন মাত্র পুরুষ এই গানে অংশগ্রহণ করে। সে হলো ঢাকী। কিন্তু সেও বাড়ির বাইরে থেকেই বাজায়। এই নমলকাতি পুজো শুরু হয় কার্তিক সংক্রান্তিতে। আর চলে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি পর্যন্ত। তাই এই পুজোকে অঞ্চালে কার্তিকপুজো বলা হয়ে থাকে। এ নাটকের পাঁচটি ভাগ। মানে, নাটকে পাঁচটি দৃশ্য।

কি কি? চখা জিজ্ঞেস করল।

কাতিসজ্জন, কাতিকামান, কাতিঘামান, নাচপর্ব এবং সবশেষে আগনেওয়া।

আগনেওয়াতে আবার চাষবাসের পুরো প্রক্রিয়াটাই অভিনয় করে দেখানো হয়। তবে এই নাটকে "গীদালী" মহিলাদের ভূমিকাই সবচেয়ে বড়। "নাচনী" মহিলারাও থাকেন যদিও।

গীদালী মানে?

নিমাইদা জিজ্ঞেস করলেন।

গীদালী মানে, গায়িকা।

তাই? বাঃ। গীতালী মানেও কি গায়িকা? কি ঝন্টু?

ভাল লোককেই জিজ্ঞেস করেছেন।

ঝন্টু বলল, লজ্জিত হয়ে।

তারপর ওঁদের জিজ্ঞেস করল যে, গোয়ালপাড়িয়া গান সম্বন্ধে বিশদভাবে কে বলতে পারেন?

অনেকেই পারেন। গৌরীপুরের প্রতিমা বড়ুয়া পাণ্ডে তো পারেনই। তাছাড়া আরও অনেকেই আছেন। ভূপেন হাজারিকার সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন কলকাতায়। উনি না থাকলে প্রতিমা বড়ুয়া আজ এত পরিচিতি পেতেন না। গ্রেট মানুষ আমাদের ভূপেনদা।

সমীরবাবু বললেন, ধুবড়ি বা গৌরীপুর মিউজিক কলেজ অথবা "সবুজের আসরের" সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। তাঁরাও হদিস দিতে পারেন গুণীজনদের।

ঝন্টু বলল, ধুবড়ি বইমেলার উদ্যোক্তা তো তাঁরাই?

হ্যাঁ।

ঠিকানা তো জানি না।

আমরাই তো ঠিকানা। তবু লিখে নিন।

বললেন সমীরবাবু।

বলুন।

"সবুজের আসর", নেতাজী সুভাষ রোড, ধুবড়ি, আসাম। পিনকোড ৭৮৩৩০১।

থ্যাঙ্ক উ।

বলল, ঝন্টু।

বিল্টু বলল, মুই এখনই চইল্যা যাম্যু গৌরীপুরে। তুই আইবি ত? কবে আইবি তাই ক? প্রতিমাদি কিন্তু বারংবার কয়্যা দিছে।

যাব।

কবে?

পড়শু যাম্যু কয়্যা দিস। সকালে যাম্যু।

আমার বাড়িত্ খাইতে আইব কিন্তু। মহামায়ার মন্দিরে যাবি না? আর আশারিকান্দি?

আশারিকান্দিটা কি জিনিস?

দীপ্তি বৌদি এতক্ষণ পরে কথা বললেন।

জিনিস নয় বৌদি। একটি গ্রাম। গৌরীপুরের কাছেই। দেশভাগের সময়ে পাবনা জেলা থেকে এসেছিলেন পাল পরিবার। পোড়ামাটির নানা জিনিস বানান তাঁরা। দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে পৌঁছয়।

মিসেস নিয়োগী বললেন চখাকে, বাঃ। আপনি তো আমাদের ভাষা বেশ ভালই বলেন।

আমি তো গড়িয়াহাটের মোড়ে হেলিকপটার থেকে পড়ে সাহিত্যিক হইনি মেমসাহেব। আমি বাঙাল। আমি উদ্বাস্তু। অতি সাধারণ আমি। এই মিষ্টি গন্ধ মাটি, এই একূল-ওকূল দেখা-না-যাওয়া নদী, ঘুঘু, কবুতর এবং চখা-চখীর ডাক, হাঁসেদের প্যাঁকপ্যাঁকানি, নদীর বিস্তীর্ণ উদাসী চর, দগদগে ঘা-এর মতন ভাঙা পাড়, পাট-পচানোর আর গুয়ার গন্ধ, পাটকাচার শব্দ, মাদারের আর ভেরেণ্ডার ফুলের ভাগুয়া রঙ, গরুর গাড়ির ক্যাঁচোর-কোঁচোরের রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, শব্দের মধ্যেই আমি বড় হয়ে উঠেছি। ঈশ্বর করুন যেন, যে বাংলাদেশে বড় হয়েছি, রংপুর, বরিশাল, ধুবড়ি, গৌরীপুর, তামাহাট, যেখানে আমার ছেলেবেলার অনেকখানি কেটেছে, আমি যেন চিরদিন এদেরই থাকি।

নিমাইদা বললেন, ব্রাভো!

বক্তৃতার মতন শোনাল কি?

চখা বলল, লজ্জিত গলায়।

তা একটু শোনাল বৈকি। কিন্তু খারাপ লাগল না।

স্বদেশ, স্বভূমি, স্বদেশের মানুষের প্রসঙ্গ উঠলেই আমার গলার কাছে কি যেন দলা পাকিয়ে ওঠে নিমাইদা। গলার স্বর বুজে আসে। এ এক দুরারোগ্য রোগ।

চখা বলল।

নিমাইদা বললেন, এই রোগ, তোমার যেন কোনোদিনও নিরাময় না হয়

চখা। এই প্রার্থনা করি।

আজ বইমেলাতে বাংলা সাহিত্যর অধিবেশন ছিল।

ধুবড়ির মতন ছোট শহরে, যেখানে কলকাতা বা গুয়াহাটি থেকে যেতে হলে বাস বা জলপথ ছাড়া সরাসরি পৌঁছনোর উপায় নেই, সেখানে এত মানুষে যে বাংলা এবং অসমীয়া সাহিত্য ও গ্রন্থ সম্বন্ধে উৎসাহী আছেন, এই কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়। ট্রেনে গিয়ে পৌঁছনো যে যায় না তা নয়। তবে, অনেকেই ঘুরে। সরাসরি পৌঁছনো যায় না মানে প্রধান রেলপথে হয় নিউ কুচবিহার হয়ে আসতে হয়, নয় মটরঝার অথবা গোঁসাইগাঁও বঙ্গাইগাঁও বা গোলোকগঞ্জ হয়ে। নিউ কুচবিহার থেকে দ্রুতগামী ট্রেন পাওয়া যায় কলকাতা বা গুয়াহাটির। দ্রুতগামী হলে কী হয়, দিনে গড়ে ছ থেকে আট ঘণ্টা লেট থাকে সেই সব গাড়ি। যাঁরা উড়োজাহাজে আসতে চান তাঁরা বাগডোগরা বা গুয়াহাটিতে পৌঁছে সেখান থেকে আসতে পারেন। চখার তো গাড়িতেই আটঘণ্টা লেগেছিল তামাহাটে পৌঁছতে। শুনেছে, চালক ভুল পথে আসাতেই অত সময় লেগেছিল। ঘণ্টা পাঁচেক নাকি লাগে।

আগে ধুবড়ির কাছে রূপসীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অ্যামেরিকানদের তৈরি করা এয়ারস্ট্রিপ ছিল। তা এখন জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে। ল্যানটানার জঙ্গল আগেও ছিল। চিতাবাঘের আস্তানা ছিল। সুখের কথা এই যে, এখন সেখানে একটা অভয়ারণ্য গড়ে উঠেছে। কুচবিহারে আগে বায়ুদূতের ছোট প্লেন যেত। বহুদিন হলো তাও বন্ধ আছে।

সাহিত্যিক নিমাই ভট্টাচার্য আজকের অধিবেশনে চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। তিনি আগে সাংবাদিক ছিলেন। সাংবাদিক ও রাজনীতিক এবং অবশ্যই অধ্যাপকেরাও স্বভাবতই খুব ভাল বক্তা হন। আর চখা চক্রবর্তী মোটে কথাই বলতে পারে না। সে যদি কথাই বলতে পারত ভাল, তবে লেখক না হয়ে হয়তো সুবক্তা হবার সাধনাই করতো।

"সবুজের আসর" পরিচালিত ধুবড়ি ও গৌরীপুর মিউজিক কলেজের ছেলেমেয়েরাও অত্যন্ত ভাল অনুষ্ঠান করেছিলেন।

বইমেলাতে গান-বাজনার অনুষ্ঠান থাকা আদৌ বাঞ্ছনীয় কী নয় সেই তর্কে না গিয়েও, ও বলবে যে, ওর মনে হয়েছিল যে তাতে কোনো দোষ আদৌ ঘটেনি। যে জায়গাতে কখনওই বইমেলা হয়নি আগে সেখানে বইমেলা সম্বন্ধে

আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলার জন্যে এমন অনুষ্ঠানের অবশ্যই প্রয়োজন আছে বৈকি। এই বইমেলা বাঙালি ও অহমিয়াদের মধ্যে গান গাওয়ার, গান শোনার, বই পড়ার, বই ভালবাসার ও বই নিজেরা কিনে উপহার দেওয়ার অভ্যেসকে দৃঢ়মূল যখন করবে, একদিন তা করবেই, সেদিন আর অন্য অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাও হতে পারে। তখন শুধুমাত্র সাহিত্য, ভাষা এবং সেই সব সম্পর্কিত বিষয়ের উপরেই তর্ক, সেমিনার, একক বক্তৃতা ইত্যাদির আয়োজন তাঁরা করতে পারেন।

অধিবেশনের পরে মেলাপ্রাঙ্গণেই ছিল ও। নিমাইদারাও ছিলেন। ছিলেন উদ্যোক্তারাও।

চখা যা বলেছিল ফিঙেকে, তাই সত্যি হলো। মেলাতে নিজের বক্তব্য শেষ করে, উদ্যোক্তাদের বিশেষ অনুরোধে দুখানি গানও গাইতে হয়েছিল ওকে।

অগণ্য পাঠক-পাঠিকাদের স্বাক্ষর দেওয়া ও বহুদিন আগে শেষ দেখা-হওয়া অসংখ্য পরিচিতদের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে যখন ঘড়ির দিকে তাকাবার সময় হলো তার, তখন ঘড়িতে সাড়ে আটটা বেজে গেছিল। সার্কিট-হাউসের সামনের নদীপারে আর যাওয়া হলো না। তাছাড়া, সে এখন এমনই পরিবেষ্টিত যে এই পরিবেশে এবং প্রতিবেশে এখন ফিঙের কথা ভাবার সময়ও নেই।

বেচারী ফিঙে!

সে নিশ্চয়ই এক ঘণ্টা বসে থেকে চলে গেছে। কিন্তু চখা নিরুপায়। সে যে যেতে নাও পারতে পারে সে কথা তো আগেই জানিয়ে দিয়েছিল।

৬

আজ রাঙাপিসির বড় মেয়ে বুড়ু তাকে রাতে খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছিল। নিমাইদা-বৌদিকেও করেছিল। বলেছিল, "ছ্যাপ ছ্যাপ" খাওয়াবে।

সেটা কি বস্তু? জানতে চাওয়াতে চখাকে বলেছিল "নেপালী বিরিয়ানি"। দই দিয়ে রাঁধতে হয়। দাতু নাকি ওকে শিখিয়েছে। ওর বড় জা নাকি খুব ভাল শীতল শুঁটকিও রাঁধেন। তিনিও চখার জন্যে শুঁটকি মাছ রান্না করবেন। বড়ু এও বলেছিল, "দাদা, শুনছি, তুমি কলম খুব ভালবাসো। তোমার জন্যে একখান কলম কিইন্যা থুইছি। নিমাইবাবুর জন্যেও।"

শুনে অভিভূত হয়েছিল চখা।

মানুষের অর্থের সঙ্গে মনের প্রসারতার কোনো সাযুজ্যই ছিল না কোনোদিন। অল্প বয়সে স্বামীহারা বড়ু প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা। কতই বা মাইনে পায় সে! একই মেয়ে ওর। এবারে নাকি হায়ার-সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেবে। যৌথ-পরিবারে থাকে বলে, শ্বশুরের ভিটে ছিল বলে, দিন চলে যায় সাধারণভাবে। অথচ সেই মেয়েরই মন কত বড়! যে-দাদা, তাকে দেওয়ার মতন কিছুই দেয়নি কোনোদিনও, যার সঙ্গে জীবনে দেখাই হয়েছে কয়েকবার মাত্র সেই দাদারই জন্যে কত খরচ করছে। কত যত্ন সব ভালবাসার পদ রেঁধে খাওয়াচ্ছে।

টাকার পরিমাপ তাও করা যায়, মানে উপহারের অর্থমূল্য, কিন্তু ভালবাসার পরিমাপ তো করা যায় না! কোনোদিনও নয়। ভালবাসা, সে প্রেমিকের প্রতিই হোক, কী দাদার প্রতিই, যে ভালবাসে আর যে সেই ভালবাসা পায়, তাদের

দুজনের অন্তরে যে এক গভীর সুখানুভূতির সৃষ্টি করে, তার গভীরতা মাপার মতো যন্ত্র এই রাক্ষুসে বিজ্ঞানের অত্যাচারের দিনেও আবিষ্কৃত যে হয়নি, এইটাই সান্ত্বনার কথা। ঈশ্বর করুন, সেই যন্ত্র যেন কোনদিনও আবিষ্কৃত না হয়।

গতকাল রাতে নেমন্তন্ন ছিল শিবাজীদের বাড়িতে। ধুবড়ির টাউন স্টোর্স-এর শিবাজী রায়। তার স্ত্রী গৌরী এবং খুড়তুতো ভাইদের স্ত্রীরা সকলে মিলে অনেক যত্ন করে খাইয়েছিল।

তাদের লোন অফিস লেনের বাড়িতে শিবাজীর মায়ের আদেশ ফেলতে পারেনি চখা। আরও আগের দিন নেমন্তন্ন ছিল ইতু-মানা-রাজা-রুবীদের বাড়ি। ছাতিয়ানতলাতে। দারুণ খিচুড়ি রেঁধেছিল মানা, চখারই অনুরোধে। রাজা-রুবী অন্য অনেক কিছু খাইয়েছিল। ইতু সান্নিধ্য দিয়েছিল। চশমা-পরা স্টেট-ট্রান্সপোর্টে কাজ করা, ইতুর দিকে চেয়ে চখার ফ্রকপরা যে কিশোরীটি কিশোর চখাকে নদীপারের পথ দিয়ে হাত ধরে হাঁটতে নিয়ে যেত, তার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

বইমেলার উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান রমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মশায় সংস্কৃতর অধ্যাপক ছিলেন। অত্যন্তই পণ্ডিত ব্যক্তি। চখা, বইমেলা উদ্বোধনের দিন সকালে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া মাত্রই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। তবে তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা বুঝতে পারল শুধু তখনই যখন চখা সভাতে নিমাইচরণ মিত্রর লেখা একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাইবার সময়ে উল্লেখ করেছিল যে ঐ গানটি উপনিষদের একটি শ্লোক-নির্ভর। গান গাওয়ার পরেই যখন সে রামপ্রসন্নবাবুর পাশে গিয়ে বসল মঞ্চের উপরে তখন উনি ফিসফিস করে বললেন, শ্লোকটি কি "অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা....?"

চখা অবাক হয়ে গেল তার পাণ্ডিত্যে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-এ আছে ঐ সংস্কৃত শ্লোকটি। কলকাতাতে অসংখ্যবার এই গানটা গেয়েছে ও বিভিন্ন জায়গাতে কিন্তু আজ পর্যন্ত উপনিষদের এই শ্লোকটির কথা সেখানে কেউই উল্লেখ করেননি।

কলকাতার অনেক কূপমণ্ডুকই মনে করে থাকেন, যে যত বিদ্বান, বুদ্ধিমান পণ্ডিত, সকলেই বুঝি একমাত্র কলকাতাতেই বাস করেন। পশ্চিমবঙ্গের, বিহারের, উড়িষ্যার এবং আসামের রাজধানীর কথা তো ছেড়েই দিলাম, ছোট ছোট মফস্বল শহরেও এমন এমন পণ্ডিতেরা বাস করেন, সব বিষয়েই পণ্ডিত, যাঁরা কলকাতার উচ্চমন্য এবং পণ্ডিতম্মন্যদের কানে ধরে শেখাতে পারেন। শিক্ষার প্রধান দান যে বিনয়, সেই বিনয়ই কলকাতা-ভিত্তিক সাহিত্যিক-কবি-সাংবাদিক-অধ্যাপক-গবেষকদের অধিকাংশেরই নেই।

অগ্রজ রামপ্রসন্নবাবুর মতন মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাও পরম

সৌভাগ্যের কথা।

আরও একজন অধ্যাপকের সঙ্গে এখানে এসে পরিচিত হলো ও, তাঁর নাম দেবাশিস ভট্টাচার্যি। বয়সে অবশ্য তাঁকে তরুণই বলা চলে। তিনি গৌরীপুরের প্রথমেশ লাহিড়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের পল-সায়েন্স বিভাগের মুখ্য। তাঁর পাণ্ডিত্যের গভীরতা বোঝার সুযোগ হয়নি চখার বটে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব, চেহারা ও কথাবার্তাতে মুগ্ধ হয়েছে ও।

নিমাইদা ও দীপ্তি বৌদি এখন ফিরবেন না। আসামের গভর্নর নাকি নিমাইদার বন্ধু। গুয়াহাটি যাবেন নিমাইদা। বৌদি নাকি কামাক্ষ্যা দেখেননি। তাই তাঁকে কামাক্ষ্যা দেখাবেন।

কাল সকালে চলে যেতে হবে ধুবড়ি থেকে। আবার এ জীবনে কখনও আসা হবে কিনা জানা নেই। ছ' ছটি দিন, যেন স্বপ্নের মতনই কেটে গেল। কত অসমবয়সী নারী-পুরুষের ভালবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা, প্রশংসা পেল। সেসব পাবার যোগ্যতা চখার থাক আর নাই থাক।

বড়ই আবিষ্ট হয়ে আছে।

বুড়ুদের বাড়িতে সর্ষে দেওয়া প্রকাণ্ড বড় বড় টুকরোর আড় মাছের ঝাল, প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা কাজরী মাছের চচ্চড়ী, মুরগীর মাংস, গরম ভাত দিয়ে শীতল শুটকি এবং 'ছ্যাপ ছ্যাপ' খেয়ে যখন চখা, ঝন্টু, নিমাইদা বৌদি বেরুল তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা এগারোটা হবে। ছোট শহরের পক্ষে গভীর রাত। কদিন আগেই ঈদ গেছে। শুক্লপক্ষ। চাঁদের আলো কিছুটা আছে।

বুড়ুর ভাসুর চখাদের অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়ে গেলেন, যদিও সার্কিট-হাউস থেকে ওঁদের বাড়ি অত্যন্তই কাছে।

অন্ধকারে, নদী থেকে আসা হু হু হাওয়ার মধ্যে বড় বড় কিন্তু ছাড়া-ছাড়া গাছে ছাওয়া পথ বেয়ে সার্কিট-হাউসের দিকে হেঁটে আসতে আসতে ভাবছিল ও যে, এখানেই বাকি জীবনটুকু থেকে গেলেই বেশ হতো। হাজার হাজার গাড়ি, বাস, ট্রাকের কর্ণ-বিদারী শব্দ, ডিজেল ও পেট্রলের ধোঁয়াতে অন্ধকার, লোভে আর ঈর্ষাতে আর পরশ্রীকাতরতাতে জরজর নতুন রঙের পোঁচ লাগানো বহুতল বাড়ির অসুস্থ কলকাতাতে থাকতে আর ভাল লাগে না। এখানে বাহন বলতে রাখবে সাইকেল রিকশা। তাই বা কেন? সাইকেলই তো চমৎকার। ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজিয়ে "চড়িতেছি সাইকেল দেখিতে কি পাও না?" বলতে বলতে সারা পাড়া-বেপাড়াতে চক্কর মেরে বেড়ানো যেত। একটি ছোট্ট ভাড়া বাড়ি, শহরের কিনারে, অথবা অনেক জমি নিয়ে নিজের বাড়ি, যেখানে এখনও

বাঁশঝাড় আছে, রঙ্গনের ডালে মৌটুসি পাখি কিসকিস করে, হাঁস পোষা যায়, গ্রীষ্মের দুপুরে পেঁয়াজখসিরঙা শাড়ির উড়ন্ত আঁচলের মতন শব্দ করে যেখানে বাঁশবনের গা থেকে ফিকে হলুদরঙা খোলস বাতাসে খসে খসে উড়ে পড়ে, ঝোড়ো-হাওয়াতে কটকটি ব্যাঙের মতন বাঁশবনের বুকের কষ্ট ফুটে বেরোয়, যেখানে এখনও মাদার আর ভেরেণ্ডার ফুল ফোটে, বসন্তে ও শীতে বেতবন দেখা যায়, বর্ষাতে মাকাল ফল আর মাতাল করা লালে জগৎ আলো করে ফুটে থাকে আজও ওই কলুষিত পৃথিবীতে, তেমনই কোনো কোণে যদি কাটিয়ে দিতে পারত অনামা, অচেনা, খ্যাতিহীন একজন সাধারণ অতি সাধারণ, মানুষের অসামান্য, অকৃত্রিম, অসাধারণ দুর্মূল্য মুর্শিদাবাদী বালপোষেরই মতন সর্বাঙ্গে মুড়ে, তাহলে কী ভালই না হতো! কী ভাল!

কিন্তু তা হবার নয়।

কবি শ্যামল ঘোষ এবং তাঁর এক বন্ধু চখাকে নিউ কুচবিহার অবধি নিয়ে গিয়ে ট্রেনে তুলে দেবেন—কামরূপ এক্সপ্রেসে। আগের স্টপেজ নিউ-আলিপুর দুয়ার। যেখান থেকে চখার অন্ধ ভক্ত তপন সেন, অ্যাডভোকেট, এসেছিলেন ধুবড়ির বইমেলাতে শুধুমাত্র চখার সঙ্গেই দেখা করতে। একদিন থেকেই তিনি ফিরে গেছিলেন। উঠেছিলেন, ধুবড়ির 'মহামায়া' হোটেলে।

কতরকম মনোমুগ্ধকর পাগলই থাকেন এই বিচিত্র পৃথিবীতে!

আর কালকে যে স্টেশন থেকে সে ট্রেনে উঠবে, সেই নিউ কুচবিহারের কাছেই কুচবিহার শহর। শেলী যেখানে থাকে। চখা সেই শহরে ঢুকবে না ইচ্ছে করেই।

কৈশোরের স্বপ্ন প্রজাপতিরই মতন সুন্দর। সত্যিই তো শেলী এক স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়! কোনো স্বপ্নের গায়েই আঙুল ছোঁয়াতে নেই। কাঁচপোকার গায়ের রঙেরই মতন সেই সব স্বপ্ন মসৃণ, উজ্জ্বল। সেই সব স্বপ্নকে তার স্মৃতিতে ঠিক তেমন করেই বাঁচিয়ে রাখতে চায় চখা। যেদিন তার চোখ চিতার আগুনে গলে যাবে সেদিন সেই সুন্দর স্বপ্নও গলে যাবে, নিঃশেষে। বাকি থাকবে না কিছুমাত্রই।

ঝন্টু শুয়ে পড়েছে।

নিমাইদা ও বৌদিও ঘরে গেলেন।

চখা দরজা ভেজিয়ে রেখে বাইরে এল। নদীপারে।

আজ শুক্লা ষষ্ঠী। চাঁদ এখন সবে উঠছে। ফালি চাঁদ। আদিগন্ত সেই আশ্চর্য অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে কারো আদরের অস্ফুট আলতো চুমুর ছোঁয়াতে জেগে ওঠারই মতন নদীচর যেন জেগে উঠছে। খুবই আস্তে আস্তে। জঙ্গলের মধ্যে

অন্ধকারে অস্পষ্ট বাঘকে যেমন ঘোলাটে-সাদাটে দেখায়, ব্রহ্মপুত্রের জল ও বিস্তীর্ণ চরকেও তেমনই দেখাচ্ছিল। তার রূপ আস্তে আস্তে আরও ধবল কোমল হচ্ছে। ক্রমশ।

হাওয়া বইছে জোরে। চুল উড়ছে চখার। পায়জামা-পাঞ্জাবি উড়ছে পতপত শব্দ করে। ধুবড়ি শহর এখন ঘুমিয়ে আছে। ঘুমিয়ে আছে গঙ্গাধর আর গঙ্গাধরের কোলে গৌরীপুর, কুমারগঞ্জ আর তামাহাট।

নদীর দিকে চেয়ে কেমন গা-ছমছম করে উঠল চখার।

এই অবস্থা, মোহময় এবং রহস্যময় রাতে কত দূর থেকে বয়ে-আসা এবং কতদূরে বয়ে-যাওয়া ব্রহ্মপুত্র নদী, নদীর বিস্তীর্ণ দুধলি চর, যেন কত কি বলছিল চখাকে, ফিসফিস করে।

কে? ফিঙে?

কী বললে?

তুমি এসেছিলে?

মিথ্যে কথা।

সত্যি!

সত্যি?

তুমি খুব খারাপ।

কে যেন ফিসফিস করে বলল।

ফিঙেই কি?

হয়তো ফিঙেই।

হয়তো।

কি?

আমি খারাপ। মার্জনা করে দিও। একটা সময়ে আমার চোখে তুমিও খুব খারাপ ছিলে। আজ, তোমার চোখে আমি।

আবার অপার নিস্তব্ধতা।

এই রাতে, কারোকেই, কিছুকেই দেখা যায় না। নড়ে-চড়েও না কিছু। সব নদীই সব নারীরই মতন রহস্যময়। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চখার দু চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

বেচারী ফিঙে। বেচারী চখা!

আকাশে অগণ্য তারারা মিটমিট করছে। কারা যেন তার অলক্ষ্যে চেয়ে আছেন নদীর দিক থেকে তার দিকে। নাকি নক্ষত্রলোক থেকে? পিসেমশাই, পূর্ণ জ্যেঠু, কড়িদা, বাপ্পু, বড়দাদা, বৈদ্যকাকু, মানিকদা, ভানুদা-বৌদি, ভারতীদি।

শচীন জামাইবাবু যেন বলছেন, তুমি এসেছিলে! এঁরা তোমাকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন বলে বড়ই খুশি হয়েছি আমরা। ভাল থেকো। ভাল থেকো।

চেক-চেক লুঙি পরা আবু ছাত্তার আর কাসেম মিঞা আর তামাহাটের কাছে বাগডোরা গ্রামের টাট্টু ঘোড়াতে চেপে তামাহাটে হাটবারে হাট করতে আসা মুনসের সর্দারও যেন একইসঙ্গে বলে উঠলেন, আইছেন এদ্দিক পরে তা হইলে। আমাগো তো ভুইল্যাই গেছিলেন গিয়া। সালাম! সালাম!

কথা না বলে চখা বলল, আইলেকুম আসসালাম।

কাসেম মিঞার গলাতে একটি কালো আর হলুদ চেক-চেক মাফলার নদীর হাওয়াতে উড়ছে। শীত-গ্রীষ্ম সর্ব ঋতুতে যে মাফলার ছিল তার সঙ্গী, সেই মাফলার। মুনসের সর্দারের মাথায় সেই খয়েরি রঙা ফেজ টুপি। হাওয়াতে সেই টুপির লেজ নড়ছে।

একটু পরেই পেছন থেকে কে যেন ডাকল, কী করছ এখানে?

মুখ ফিরিয়ে চখা দেখল, ঝন্টু। চখার বডিগার্ড। এবং নীতবর।

বলল,অনেক রাত হলো। চলো শোবে। কাল সকালে তো বহু মানুষে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এবং বিদায় দিতে আসবেন।

চখা অস্ফুটে বলল, হুঁ।

তারপর বলল, চল যাই।

সার্কিট-হাউসের দিকে ফিরে আসতে আসতে চখা ভাবছিল, যেন দ্বিরাগমনে আসারই মতন সে এঁদের নিমন্ত্রণে, এত মানুষের চাহিদাতে তার প্রিয় এবং পুরনো ধুবড়ি-গৌরীপুর-তামাহাটে ফিরে এসেছিল বহুদিন পরে।

ফিরে আসাটা বড়ই আনন্দের। এতো মানুষের হৃদয়ের উত্তাপের কাছে থাকা বড়ই সুখের। কিন্তু সেই উষ্ণতা থেকে শীতার্ত পৃথিবীতে একা একা ফিরে-যাওয়াটা সুখের নয়। আদৌ নয়।

চখা জানে যে, কাল সকালে অনেকে মিলে তাকে ধুবড়ি সার্কিট-হাউসের হাতা থেকে যখন নিউ-কুচবিহার স্টেশনের দিকে রওয়ানা করিয়ে দেবেন গাড়িতে, তখন ওর গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠবে একটা। অনামা সেই বোধ।

তার নীতবরও এবারে তার সঙ্গে যাবে না ফেরার সময়ে।

ঝন্টু বলবে, আচ্ছা চখাদা! ভালমতো যেও তাহলে।

বিচ্ছিরি কলকাতার দিকে রওয়ানা দেবে প্রত্যানীত, নদীপারের এই শান্তির রাজ্য ছেড়ে।

একা একা।

ফিঙে তার ঘর এবং স্বামী-পুত্রকে ছেড়ে কাল সকালে যদি আসতে পারত, ভাবে চখা, তবে লোকভয় ত্যাগ করে ওকে সঙ্গে যেতে বলত নিউ কুচবিহার স্টেশন অবধি। সঙ্গে অবশ্য শ্যামলেরাও থাকত। থাকলে থাকত।

মুখে মেয়েরা অনেক কিছুই বলে। ওসব কথারই কথা। ফিঙে সেই রাতেও আদৌ আসেনি। জানে চখা। যে বোধ ফিঙের মনে একটুও বেঁচে নেই, সেই বোধ আছে যে, এমনই ভাব সেদিন সকালে দেখিয়ে গেল।

মেয়েরা যখনই নোঙর ফেলে, তখনই টেনে-টুনে খুব ভাল করে দেখে নেয়, হঠাৎ ঝড়ে বা জোয়ারে সে নোঙর যেন হেঁটে না যায়। বুঝদার হুঁশিয়ার তারাই। মূর্খ পুরুষেরা কোনোদিনও নয়।

আজ চখা বিখ্যাত হয়েছে বলে কি আপসোস হচ্ছে ফিঙের?

কে জানে!

নদীদের বোঝে, এমন ক্ষমতা কি চখার মতন সামান্য পাখির আছে?

একদিন যাকে পাগলের মতন ভালবেসেছিল এবং মিথ্যে বলবে না, সেই ভালবাসা হয়তো ফেরতও পেয়েছিল, তার পাশে, বহুবছর পরে দু'ঘণ্টার পথ ঘন হয়ে গাড়িতে বসে যাওয়াও তো কম সুখের নয়!

কিন্তু আসবে না ফিঙে। ও জানে যে আসবে না। "একা" চখার "দোকা" হওয়া হবে না, স্বল্পক্ষণের জন্যেও।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার কথা আবারও মনে পড়বে চখার পথে যেতে যেতে।

"তোমাকে আমি ভোগ করেছি তোমায় বিনাই।"

দ্রুত ছুটে যাবে গাড়ি। হু হু করে হাওয়া আছড়ে পড়বে ওর গায়ে মাথায়। নির্মল হাওয়া। দূর থেকে দূরতর হতে থাকবে সেই দেশ,

যেখানে পাখির নাম পাখি,
নদীর নাম নদী,
গাছের নাম গাছ
এবং স্বামীর নাম স্বামী।

["ফিঙে" চরিত্রটি সম্পূর্ণই কাল্পনিক।

যদি ঐ নামে ধুবড়ি বা গৌরীপুর শহরে কোনো মহিলা থেকে থাকেন তবে তিনি নিজগুণে লেখককে মার্জনা করবেন।

সেই অঘটনের মিল, নিতান্তই দুর্ঘটনা-প্রসূত বলেই জানতে হবে।]